অপর দেখা

একটি আত্মকাহিনি

পরিমল ভট্টাচার্য

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"নিছক আত্মকাহিনি নয়, অসামান্য ভাষায় এক গভীর জীবনদর্শন!"

আনন্দবাজার পত্রিকা

কিছু লিখছিস-টিখছিস নাকি? অপুকে জিজ্ঞেস করেছিল বন্ধু পুলু। একটা আশ্চর্য উপন্যাস! অপু বলল—একটি ছেলে, গ্রামের ছেলে... দরিদ্র, কিন্তু সেনসিটিভ... বাপ পুরুত, মারা গেল... ছেলেটি শহরে এল... সে পুরুতগিরি করবে না, পড়বে... অ্যামবিশাস...
সব শুনে-টুনে পুলু বলল—এতে উপন্যাস কোথায় রে, এ তো আত্মজীবনী!

হ্যাঁ, এ হল অপুর আত্মজীবনী। এক অর্থে, এ হল বাঙালির আত্মজীবনী... সেই উনিশ শতক থেকে।
কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নয়; এর পরতে পরতে রয়েছে ভিন্ন, এমনকি প্রতিস্পর্ধী স্বর, যাতে কান পেতে লেখক বুনে তুলেছেন এক বহুস্বর আখ্যান, বহু বিচিত্র নারী পুরুষ ও শিশুর মর্মকথা দিয়ে গড়া এক দেশকালের সঙ্গে সংলাপ। শিমলিপালের অরণ্য থেকে মধ্য কলকাতার গলি, অযোধ্যা পাহাড় থেকে নদীয়ার সীমান্ত, দামোদরের বুক থেকে সুন্দরবনের শেষ বসতি... লাভাস্তর খুঁড়ে আনা হারানো ফ্রেস্কোর মতো অনুপুঙ্খ দৃশ্যাবলীর ভেতর দিয়ে উন্মোচিত হয়েছে এক নবীন প্লাবনভূমির ইতিকথা।

এক আত্মকাহিনি, যার কেন্দ্রে রয়েছে যে আমি, যে-লেখে-সে-আমির নির্মাণ পরিমল ধারাবাহিকভাবে করে চলেছেন স্মৃতিকথা ভ্রমণবৃত্তান্ত রিপোর্টাজ ইত্যাদির আঙ্গিক থেকে উপাদান জড়ো করে।
অপুর দেশ তাতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করল।

ISBN 978-93-80732-39-8

9 789380 732398

অবভাস

Buy Online : www.ababhashbooks.com

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপুর দেশ

একটি আত্মকাহিনি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবভাস প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

ডোডোপাখিদের গান
পরিবেশ মানুষ 'সভ্যতা' এবং...

অপুর দেশ
একটি আত্মকাহিনি

শাংগ্রিলার খোঁজে
হিমালয়ে গুপ্তচারণার তিনশতক

ড্যাঞ্চিনামা
একটি স্মৃতির প্রত্নসন্ধান

দার্জিলিং
স্মৃতি সমাজ ইতিহাস

A Face of Bengal
Looking through the Prism of Basic Education

অনুষঙ্গ/অনুবাদ
যন্ত্রণার উত্তরাধিকার
শিল্পে স্মৃতিতে হিংসার ভাষ্য থেকে নির্বাচিত

তারকোভস্কির ঘরবাড়ি

বার্গম্যান, আপনি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Apur Desh: Ekti Atmakahini
by Parimal Bhattacharya

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৬
দ্বিতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৯
© লেখক
প্রচ্ছদের ছবি পল ক্লি অঙ্কিত
অ্যাঞ্জেলস নোভস
প্রচ্ছদ : হোয়াইট পেপার
ISBN 978-93-80732-39-8

AMARBOI.COM

মূল্য : ৩০০.০০

প্রকাশক পার্থ চক্রবর্তী, অবভাস, কে বি রায় গার্ডেন, গড়িয়া স্টেশন রোড
কলকাতা-৮৪, ফোন : ৯৪৩৩২৩৪৩৪৬ ই-মেল : ababhash@gmail.com
ওয়েব সাইট www.ababhashbooks.com
বর্ণস্থাপক সুদীপ দাস বরাহনগর, কলকাতা-৩৬
মুদ্রক ডি. অ্যান্ড পি. গ্রাফিক্স প্রা. লি. গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-১৩২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বাবা, আজীবন মাস্টারমশাই
দীনেশ ভট্টাচার্যের স্মৃতির উদ্দেশে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচি

প্রথম অধ্যায় ৯
ইঁদুরকল— আম আঁটির ভেঁপু— নীল রঙের টেম্পো— মোমের সলতে

দ্বিতীয় অধ্যায় ৩৩
বাগালিয়া বাঁশি— খোলামকুচির রান্নাবাটি— শুকনো পাতার দেশ
বারমুডার জাহাজ— কাঠের কপিকল

তৃতীয় অধ্যায় ৮৫
ম্যাটিনি শোয়ের বেল— নোনা জল, আঁশটে বাতাস
গরাণ খুঁটির ডোরা— মউলের মুখোশ— শ্লেটরঙের ছায়া

চতুর্থ অধ্যায় ১১৯
হেয়ার সাহেবের পালকি— দারুবিগ্রহ— খাঁচাকল
কচুপাতার ছাতা— কাঁটাতার— খড়ের বাছুর— কথা-বলা আয়না
ফানুসগ্রাম— সূচের চোখ— টেরাকোটার মুখ

পঞ্চম অধ্যায় ১৮৪
বাঘমার্কা ডবলডেকার— ফাইবারের দুর্গা— খেলনা রেলের স্টেশন
কারেন্ট নুন— কাগজের এরোপ্লেন— তালডোঙা
গ্রহান্তরের জীব— সন্ন্যাসী কাঁকড়া

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম অধ্যায়

ইঁদুরকল

২৩/৯ শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের তিনতলা বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে এক দুরূহ ধাঁধার মতো। মোটা মোটা শিকড়ে দেয়াল জড়িয়ে ফাটিয়ে আকাশে মাথা তুলেছে যে বট, সেই গাছটা বাড়িটাকে আঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছে নাকি বাড়িটাই গাছটাকে, দেখে কে বলতে পারে। কর্পোরেশন থেকে সেঁটে দেওয়া বিপজ্জনক বাড়ির টিনের নোটিশ চটা উঠে নোনাধরা ইটের সঙ্গে মিশে গিয়েছে কবে। দোতলার বারান্দায় মেলে-দেওয়া শাড়ি জামা ঝোলে, পাখির খাঁচা দোলে, উঁকি দেয় তুলসী মানিপ্ল্যান্ট। বাড়িটার মুখ জুড়ে বলিরেখার মতো বটের ঝুরি আর তারের গোছা। গলি থেকে তিন ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে রোয়াকের ডানহাতি ঘরে— যা এককালে ছিল বৈঠকখানা, অথবা কোনো উকিল কিংবা ডাক্তারের চেম্বার— সিলিং অব্দি ঠাসা বইয়ের পাঁজা আর তালাবন্ধ আলমারির ফাঁকে ছোট্ট টেবিলে কনুইয়ের ভাঁজে থুতনি রেখে সারাদিন ঝিমোন এক বৃদ্ধ, পরনে ফতুয়া আর ধুতি। শুকনো চেহারাটা সেকালের পাঁজির বিজ্ঞাপনে আঁকা পাচক বা সালসার মডেলের মতো।

কলেজ স্কোয়ার থেকে বড়োজোর পঞ্চাশ পা, কিন্তু এই গলির ভেতর শহরের ব্যস্ত কোলাহল পৌঁছয় না। সূর্যের আলো দুপাশে উঁচু বাড়ির ফাঁক দিয়ে এসে ঢোকে ঠিক মধ্যাহ্নে। বিকেলের আগেই একতলার ঘরগুলোয় ছায়া জমে ওঠে। তবু দরজায় এসে দাঁড়ালে আলোর সূক্ষ্ম তারতম্যে বৃদ্ধ চোখ খোলেন। চশমাটা চোখে গলিয়ে চিনে উঠতে কয়েক মুহূর্ত লাগে।

স-বাবুকে খুঁজছেন? উনি তো এখনও... আচ্ছা দাঁড়ান দেখি।

বুকপকেট থেকে মোবাইল বের করে টেপেন।

নট রিচেবল বলছে। আসার তো সময় হয়েছে, হয়তো মেট্রোয় আছে। আপনি ভেতরে এসে বসুন না?

ঘরের যা অবস্থা, তাতে দুজন মানুষেও ঠাসাঠাসি মনে হবে। বাইরে দিন ফুরিয়ে আসছে, মাথার ওপর এক চিলতে আকাশে গোলাপি রং ধরেছে।

থাক, আমি বরং বাইরেই একটু...

গলির বাঁকে সরে এসে সিগারেট ধরাই। কাঙ্ক্ষিত মানুষটি না থাকায় ভেতরে এক বিচিত্র স্বস্তি অনুভব করি। কথাটা কীভাবে পাড়ব? এখানে আসব মনস্থির করার পর থেকে ভাবনাটা কুরে খাচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কীভাবে বলা যায়? একটি বই, তার প্রচ্ছদ ছাপা হয়ে গিয়েছে, সামনের বইমেলায় প্রকাশিত হবে এই মর্মে বিজ্ঞাপন বেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু বইটা হবে না। লেখা আর এগোচ্ছে না। ঝুলে যাচ্ছে, তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। কিছু দাঁড়াচ্ছে না, দাঁড়াবে না। এভাবে কি বলা যায়? আর্থিক ক্ষতির দিকটা শুধু নয়, একটা পারস্পরিক আস্থা আর নির্ভরতাও জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে। তার ভিত্তিতে শুধুমাত্র একটি ভাবনা শুনেই তড়িঘড়ি নাম ঠিক করে প্রচ্ছদ ছাপানো হয়ে গিয়েছে। আসলে প্রকাশিতব্য চার পাঁচটি বইয়ের প্রচ্ছদ কালার অফসেটে একসঙ্গে ছাপলে বেশ কিছুটা আর্থিক সাশ্রয় হয়, যেমন হয় একলপ্তে অনেকটা কাগজ কিনে রাখলে। বাংলা ছোটো প্রকাশনার দিন-আনি-দিন-খাই দশায় এগুলো হল টিকে থাকার মন্ত্রগুপ্তি। এর বিকল্প পাঠ্যবই, কিংবা লেখকদের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে বই ছাপানো। কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ায় অনেক প্রকাশকই সেই পথ ধরেছে। যে দু-তিনজন এখনও সেই পথে নামেনি, পথেও বসেনি, তাদের একজনের সঙ্গে এই আস্থার সম্পর্ক একদিনে গড়ে ওঠেনি আমার। এভাবে এর আগেও লেখা শুরুর আগে প্রচ্ছদ ছাপানো হয়েছে, দুটি সিনেমা সংক্রান্ত বইয়ের ক্ষেত্রে দামি আর্ট পেপারে অনেকগুলো ছবি ছাপা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে তৈরি পাণ্ডুলিপি, যাকে বলে প্রেসকপি, জমা দেবার ব্যাপারে কোনো সমস্যা হয়নি। এক্ষেত্রেও সেটা হবার কোনো কারণ ছিল না।

সত্যি বলতে কি, এই লেখাটা ভেতরে জমে ছিল অনেককাল। তিলতিল করে যাকে বলে রাই কুড়িয়ে বেল হয়ে উঠেছে, অন্য লেখার মধ্যে কখনো উঁকিঝুঁকি মেরেছে, এমনকি মেঘের ছায়ার মতো এসে পড়েছে এর কিছু কিছু মোটিফ। সেগুলি কাগজে গেঁথে তুলতে গিয়ে যে এই কঠিন সঙ্কটের মুখোমুখি হব, সেটা বুঝতে পারিনি। উষর লেখার টেবিলে আধখেঁচড়া পাণ্ডুলিপিটা চেয়ে থাকে কাকতাড়ুয়ার মতো। শুকনো খড়ে হাওয়া বয়, শোঁ শোঁ শব্দ হয়।

এই দিশাহারা অবস্থাটা ঠিক কীভাবে বোঝাই? যদি বলি, ধরা যাক এক গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠছি আমি, একটা আচ্ছন্নতার ভেতর সারা জীবনে যত অসংখ্য ঘরে জেগে উঠেছি, তাদের স্মৃতিগুলো চোখের ওপর পরতের পর পরত বিছিয়ে যাচ্ছে, যেন অনেকগুলো দৃশ্যের সমাপতন হচ্ছে। শোবার ঘরের নকশাটা হয়ে উঠেছে অদ্ভুত অচেনা, বাড়িটাও, নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজে পাচ্ছি না, বাথরুমের দরজা হাতড়ে চলেছি। কিংবা... নাহ্!

একবার মনে হয় একটা চিরকুট লিখে দিয়ে চলে যাই— বইটা হবে না, সরি! তারপর প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে ওঠার পর না হয় মুখোমুখি হওয়া যাবে।

ঘরে যে বৃদ্ধ মানুষটি বসে আছেন, তিনি একসঙ্গে সাতটি প্রকাশনার দপ্তর সামলাচ্ছেন। একেকটি দপ্তর প্রকৃতপ্রস্তাবে একেকটি আলমারি। ওঁর কাজ হল অর্ডারমাফিক দোকানে দোকানে কিংবা ডিস্ট্রিবিউটারের ঘরে বই পৌঁছে দেওয়া, চালান লেখা, হিসেব রাখা। প্রকাশনার অন্যান্য কাজকর্ম, লেখকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ইত্যাদি বাইরেই হয়। এর আগে যে ক-বার এসেছি, স্নান কাল ঠিক করেই এসেছি, কিংবা এখান থেকে চলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়েছি কফি হাউসে নয়তো গলির মুখে ফেবারিট কেবিনে। এভাবে না বলে-কয়ে এসে পড়িনি কখনো।

এরকম দ'য়েও কখনো পড়িনি।

ফোন করতে গিয়ে দেখি মোবাইলে সিগন্যাল নেই। গলিটা এত সরু আর দুপাশে বাড়িগুলো এত উঁচু যে সিগন্যাল তো দূর, দিনের আলোই ঢোকে না ঠিকমতো। একটা ভ্যাপসা বাতাস ঝুলে আছে মলিন মশারির মতো। গলির বাঁকে নর্দমার ঝাঁঝরির ওপর স্তূপাকার বাসি ভাত, তরকারির খোসা, আমের আঁটি, পলিপ্যাকে মোড়া চিংড়ির খোলশ ঠোঁটে ছিঁড়ে ছিটিয়েছে কাক। সেখানে এসে জুটেছে দুটো ঘেয়ো কুকুর। ডানদিকে মোটা থামওয়ালা বাড়ির দোতলার বারান্দায় মেলা শাড়ি একতলার জানলায় ঝুলে পড়েছে পর্দার মতো। কয়েক ঘর ভাড়াটের বাস। খোলা দরজা দিয়ে দেখা যায় ছাতলা-ধরা উঠোন, কলতলা, এক পৃথুলা নারী উবু হয়ে বসে বাসন মাজতে মাজতে কোনো পড়শি কিংবা সিরিয়ালের গল্প শোনাচ্ছে কাউকে। ইজের-পরা কচিকাঁচার দল ছুটোছুটি করছে উঠোনময়। গলির ধারে নীচু ঘরের ছিটের পর্দার ফাঁক দিয়ে ভেতরটা যেটুকু দেখা যায় পরিপাটি সাজানো, এক কোনে টুলের ওপর পরপর রাখা টিনের বাক্স সুটকেস কুরুশের কাজ করা ঢাকা দেওয়া, পেস্তাসবুজ দেওয়ালে জাপানি নিসর্গের ছবিওয়ালা ক্যালেন্ডার, কুলুঙ্গিতে খানকতক বই। ঘরে সূর্যের আলো ঢোকে না, টিউবলাইট জ্বলে রাতদিন। সেই আলোয় খাটে উপুড় হয়ে বইয়ের কাগজ পড়ছে এক শ্যান্ডো গেঞ্জি-পরা যুবক। লাগোয়া সরু বারান্দায় রান্না করছে এক সদ্য তরুণী। ঘন তারের জাল দিয়ে তার মুখটা শুধু দেখা যায়। চড়ছে খুন্তির শব্দ, পরোটা ভাজার গন্ধ। শেষবিকেলের আলো জড়ানো বাষ্পের পর্দার ওপাশে চিকচিক করে পানপাতার মতো মুখ, নাকের দুপাশে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে।

এই এতসব খুঁটিনাটি তখন দেখেছিলাম কি? নাকি পরে দানা বেঁধে উঠেছিল? সেই অভিজ্ঞতার স্মৃতি আর কল্পনার জট ছাড়ানো অসম্ভব, যেমন অসম্ভব ২৩/৯ নং বাড়িটায় শিকড় ও ইঁট আলাদা করা। কিন্তু যে জিনিসটা তখনই আমায় টানছিল, সেটা হল পাশাপাশি দুটি আয়তাকার দৃশ্যখণ্ড, দুটি প্রাণী, মাঝখানে একফালি পলেস্তারা খসা দেয়াল। কেউ কারোর দিকে তাকাচ্ছে না, একজন কাগজ পড়ছে, আরেকজন রান্না করতে করতে সিরিয়াল কিংবা পড়শির কেচ্ছা শোনার ভান করছে, অথচ এক অদৃশ্য সংযোগের সুতোয় যেন বাঁধা রয়েছে দুজনে। গলিতে দাঁড়িয়ে আমি তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকি, কেউ দেখলে কী ভাববে মনে থাকেনা, আঙুলে সিগারেট পোড়ে, মাথার মধ্যে অস্ফুট কুয়াশায় দৃশ্যটা ফুটে ওঠে জলছাপের মতো। একসময় যুবকটি হাত বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিতেই তরুণী একবারও না ফিরে বলে ওঠে—

এখন আর ধরিও না লক্ষ্মীটি, গরম গরম ভেজে দিচ্ছি খেয়ে নাও আগে।

যুবকটি মুখ ফেরায়, এক আশ্চর্য কোমল অভিব্যক্তি ফোটে ওর মুখে। আমার বুকের ভেতরটা ছাঁৎ করে ওঠে। এই মুখ আমার চেনা! বহুকালের, চিরকালের চেনা!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই চিনে ফেলাটা ঘটে গিয়েছিল এক লহমায়, যদিও সেদিন বাড়িতে ফিরে বইটা তাক থেকে পেড়ে পাতা উলটে নিশ্চিত হলাম।

'তার বাসা শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের মধ্যে, গোলদীঘির কাছে। তের টাকা ভাড়াতে নীচু একতলা ঘর, ছোটো রান্নাঘর। সামান্য বেতনে দু'জায়গায় সংসার চালানো অসম্ভব বলিয়া আজ বছরখানেক হইল সে অপর্ণাকে কলিকাতায় আনিয়া বাসা করিয়াছে।'

*

পরদিন যেন নিশিডাকের টানে আবার গেলাম। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। কিন্তু গলির ভেতর সেই বাড়িটা, সেই তরুণ দম্পতির জালঘেরা একফালি বারান্দা আর ঘর অনেক খুঁজেও চিনতে পারলাম না। আগের দিন অন্যমনস্কভাবে পায়চারি করতে করতে যেদিকটায় চলে এসেছিলাম বলে আন্দাজ হল, সেখানে ঠিক ওইরকম একটা বাড়ি আছে বটে, মোটা থামওয়ালা বারান্দা থেকে শাড়ি ঝুলছে, কিন্তু একতলার পুরোটা জুড়ে বই বাঁধাইয়ের কারখানা। নীচু ছায়াচ্ছন্ন ঘরে মেঝেয় বসে বই বাঁধাই করছে একসার মানুষ। তাদের পরনে লুঙ্গি আর গেঞ্জি, মুখগুলো ছায়াচ্ছন্ন, জলচৌকির ওপর ঝুঁকে পড়ে ফর্মা ভাঁজ করে চলেছে একমনে। এতগুলো লোক, অথচ এত চুপচাপ যে বাইরে থেকে কিছু টের পাওয়া যায় না। দরজার বাইরে স্টোভে তুঁতে মেশানো ময়দার আঠা জাল দেওয়ার বিকট গন্ধ উঠেছে। ঠেলাগাড়িতে ছাপা কাগজের স্তূপ চাপিয়ে হাঁকার দিতে দিতে টেনে আনছে দুই ঘর্মাক্ত কলেবর মুটে।

এই শহরের পেটের ভেতর যে শহরটা থমকে আছে শতাধিক বছর, তার মানুষ পেশা কাজের ধরণ রাস্তার ধার থেকে হঠে গিয়ে গুঁজে এসেছে এই গলিতে। জীর্ণ বাড়িগুলো সেকালের মুৎসুদ্দি সমৃদ্ধির চুঁইয়ে আসা বিত্তের ছাপ গায়ে নিয়ে, সুচারু রেলিঙের নকশা, রঙিন শার্সি, বার্মাসেগুন আর কার্নিশের কারুকাজ নিয়ে, দাঁড়িয়ে আছে ইতিহাসের শুকনো খোলার মতো। ভেতরে শিলীভূত অসূর্যম্পশ্যা জীবন। দুপাল্লা সদর দরজা পেরিয়ে সুড়ঙ্গের মতো পথ গিয়েছে সেখানে, দেয়ালে ঝুলছে অসংখ্য মিটারবক্স, ভাঙা চিঠির বাক্সে নাম-ঠিকানা ঝাপসা হয়েছে। সূর্য ডুবে যাবার সময় মরুভূমির সরীসৃপ যেমন গর্তের মুখে উঠে আসে, তেমনই এইসব বাড়ির বাসিন্দারা দরজার মুখে বেরিয়ে আসে ঠিক এই প্রহরে, ওপর দিকে মুখ তুলে এক চিলতে আকাশের গায়ে দিনের আলো মরে আসা দেখে। তেমন এক বৃদ্ধ, পরনে মলিন গেঞ্জি আর গেরুয়া লুঙ্গি, চোখে পুরু কাচের চশমা, লোহার শিক-আঁটা হাফ দরজায় কনুইয়ে ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর হাতে ইঁদুরকল, ভেতরে একটি নেংটি ইঁদুর, জ্যান্ত, আধখানা মারী বিস্কুট। গলির ভেতর আমাকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করেন—

আপনি কি কাউকে খুঁজছেন ?

তারপর আরেকদিন। গলির ভেতর তস্য গলিতে আদ্যিকালের একটি প্রেস, পায়ে চাপা ট্রেডল মেশিন। ঝুলকালিমাখা দেয়ালে কবেকার ক্যালেন্ডার, ছাপা কালির গন্ধ। কড়িকাঠ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে ঝুলছে নগ্ন বাল্ব, তার আলোয় এক বিশীর্ণ কম্পোজিটার কাঠের খোপ থেকে একটি একটি করে টাইপ তুলে পেতলের ট্রেতে গেঁথে চলেছে। ছাপাই যন্ত্রে মটমট করে শব্দ হচ্ছে কঙ্কালের হাড়গোড়ের মতো। পায়ে চাপ দিয়ে মেশিনের চোয়ালের ভেতর কাগজ ভরে দিচ্ছে যে, সে নেহাতই এক বালক। তার মাথাভর্তি কোঁকড়ানো চুল, ডাগর চোখের নীচে রাত-জাগা ক্লান্তি। মাঝে মাঝে গেঞ্জির হাতায় ঘর্মাক্ত মুখ মুছে নেবার সময় ঘাড়ের কাছে একটি পৈতে উঁকি দিচ্ছে।

আমি চিনতে পারলাম!

শিয়ালদহ নর্থ স্টেশনে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের শেষে ব্রিটিশ আমলের লালরঙা বাড়িটার পাশ দিয়ে সাপের মতো এঁকেবেঁকে ঢুকছে একটি ট্রেন— কয়লার ইঞ্জিনে টানা, কামরাগুলো কাঠের। ট্রেনটা স্টেশনে এসে ঢুকতেই শুরু হয়ে যায় ধাক্কাধাক্কি ভিড় কুলিদের কলরব। থার্ড ক্লাস কামরার দরজায় এসে দাঁড়ায় এক সদ্য কিশোর, বিহ্বল, এক হাতে বাক্স-বিছানা আরেক হাতে ধরা একটি গ্লোব। প্ল্যাটফর্মে পা দিতেই জনতার স্রোত তাকে কাগজের নৌকোর মতো উজিয়ে নিয়ে স্টেশন চত্বর ছাড়িয়ে বাইরের রাজপথে এনে ফেলল।

ছেলেটির বুক পকেটে একটি খামের গায়ে ঠিকানা লেখা আছে। রাস্তার নামফলক চিনে মধ্য কলকাতার এক প্রাচীন পাড়ায় এসে ঢুকল সে। রোয়াকে আড্ডা দিচ্ছে বৃদ্ধের দল, টিউবওয়েলে চান করছে একদল বস্তির ছেলেমেয়ে, শিশুর কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। একটা লজঝড়ে মোটরগাড়ি প্যাঁক প্যাঁক করে হর্ন দিতে দিতে চলে গেল। একটা খুব পুরোনো ক্ষয়াটে থামওয়ালা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল কিশোর। দরজার মুখে টিনের আব্রু, একপাশে ডাঁই করা কাঠের ক্রেট, ওপরে ঝুলছে বিবর্ণ সাইনবোর্ড; তাতে লেখা—

ROYAL PRESS

এই যে তুমি, ফিরে এসেছ! হাতের বিশ্বগোলক দেখে পথ চিনে এই কলকাতা শহরে এসেছ। কতকাল ধরে তোমায় খুঁজে চলেছি আমি, তোমায় বয়ে চলেছি। কতদিন, কত অপরাহ্ণে তোমায় চকিতে দেখেছি আমি এইখানে, সেকালের এই হ্যারিসন রোডের মুখে: ক্লান্ত ঘরফিরতি মানুষের স্রোতের উজানে দাঁড়িয়ে আছে এক দিকভ্রান্ত কিশোর। কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না তার দিকে, ধাক্কা দিয়ে চলে যাচ্ছে। সকলের ট্রেন ধরার তাড়া, কেউ কেউ বাজার সেরে নিচ্ছে। ফুটপাথে ফ্লাইওভারের নীচে গ্রাম্য বউ-ঝিরা বসেছে ডুমুর পাতালকোঁড় ঢেঁকিশাক শাপলা ডুমুরের পসরা নিয়ে, মাঝেরগ্রাম বাহারু আড়বেলে ঠাকুরনগর নিশ্চিন্দিপুর থেকে এসেছে তারাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আম আঁটির ভেঁপু

তোমার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় অক্ষরপরিচয় হবারও আগে। খেলনার বাক্সে একটি ছেঁড়াখোঁড়া বই ছিল, তার পাতায় কাঠখোদাই শৈলীর ছবিতে তোমায় প্রথম দেখি। তখন তুমি আমারই বয়সি। বইয়ের পাতাগুলো ছিল ডেঁয়ো পিঁপড়ের সারির মতো অক্ষরে ঠাসা, বোবা, কিন্তু ছবিগুলো কথা বলত। দুই ভাইবোনের গল্প, তাদের ছবিতে কালো জমাট ছায়াগুলো আমাদের সিঁড়ির নীচে খাটের তলায় জমে-থাকা অঢেল অন্ধকার দিয়ে তৈরি। তার ভেতরে ফুটে থাকত ঘোলাটে শার্সি দিয়ে আসা ভোরের মতো একটা আলো। তাদের মাটির কুঁড়ের পেছনে ঝুপসি গাছ, চুলের সিঁথির মতো চলে গিয়েছে পথ, তার ধারে তালগাছের সারি যেন কাগজের খেলনা পাখা, রথের মেলায় যেমন পাওয়া যেত, চলেছে গরুর গাড়ি, গুলঞ্চলতার ঝোপে দপদপে বিশালাক্ষী ঠিক যেন নতুন-বিয়ে-হয়ে-আসা রাঙাকাকিমার মতো। ক্রমশ কাঠখোদাইয়ের ফাঁক গলে আলোটা বাড়তে লাগল, অক্ষরগুলো পড়তে শিখলাম।

আরও মোটা একটা বইতে তোমার দীর্ঘ জীবনকাহিনি প্রথম পড়ি সম্ভবত বাল্যের গোড়ায়। সিনেমাটা দেখেছিলাম বোধহয় তার কিছু আগে। টুকরো টুকরো চলচ্ছবি জুড়ে বুনে উঠতে থাকা গল্প বোঝার মতো বয়স তখনও হয়নি। সিনেমা দেখতে যেতাম মা-কাকিমাদের কোলে বসে, পাড়ার হল-এ দুপুরের শোয়ে, ভুরভুরে জর্দার গন্ধের দেশে। অঝোরে বৃষ্টির ভেতর একটি মেয়ে মাথার চুল দুলিয়ে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে ভিজে চলেছে, ঠিক যেন একটা পেত্নী। তারপর সে সত্যিই মরে পেত্নী হয়ে গেল, আর তার ভাইটা একটা খুব বড়ো ছাতা নিয়ে একা একা চলেছে গ্রামের পথে। আর কিছু মনে নেই।

অক্ষরের অপু, ছায়াছবির অপু, দুই চিত্রণের মাঝে ফাটল দিয়ে পিছলে আসা ভিন্ন এক অপু। কিংবা শৈশবের আলোআঁধারি জমিয়ে কাঠখোদাই অপু। এইসব অপুগুলো জুড়ে জুড়ে একটাই অপু ভর করেছে আমার ওপর, তাকে বয়ে নিয়ে চলেছি বেতাল কাঁধে বিক্রমের মতো। তারপর কবে যেন সেই আলিঙ্গনের ফাঁস ছাড়িয়ে বেরিয়েও এসেছি, যেভাবে খোলস ছাড়ে সাপ। বেরিয়ে এসেছি, পথ চলেছি। তোমার সঙ্গে আমার দূরত্ব যত বেড়েছে, ততই বিচিত্র স্পষ্টতায় ফুটে উঠেছ তুমি অপু।

*

এই যে তুমি, ফিরে এসেছ। শ্রীগোপাল মল্লিক লেন থেকে বেরিয়ে এসে দেখ— এই সেই গোলদিঘি, যার বেঞ্চিতে বসে কত অলস বিকেলে তুমি জীবনের অবিরল স্রোত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখেছ। সামনে কলেজ স্ট্রিট, বিখ্যাত ইমারতগুলোর নব্যধ্রুপদী স্থাপত্যছায়া পড়েছে জলে। একটা হেলে-পড়া অশ্বত্থগাছ, যার পাতাগুলো নির্জন দুপুরবেলায় ফিসফাস করত বীচিকাটা জলের সঙ্গে। কান পাতলে হয়তো বা শোনা যেত ইয়ং বেঙ্গলদের তার্কিক কণ্ঠস্বর। এখন আর কিছু শোনা যায় না। সেই গাছটা নেই, সেই সৌধের ছায়া পড়ে না জলে, ভাঙা হয়ে গিয়েছে সেনেট হল। এখন রেলিং বরাবর সারি দিয়ে গুমটি দোকান, বাঁধানো চত্বরে ধর্না জমায়েত, মনীষীদের মূর্তির মাথায় কাক। তবে বাইরে ফুটপাতের ছবিটা বিশেষ বদলায়নি, দেখ— দোকানগুলোয় ঠাসা টেক্সট বই মেড-ইজি ডিকশনারি কেরিয়ার গাইড চাকরির প্রবেশিকা প্রশ্নমালা... শিক্ষা, যা যুগে যুগে বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠার সোপান। তার টানে কোন্ সুদূর মফস্সল থেকে এসেছে কিশোর, দেখ, ট্রেনে চেপে শিয়ালদহ, তারপর হ্যারিসন রোড ধরে পায়ে হেঁটে, চোখে তার দুর্দম পিপাসা। তাকে দেখে দোকানদারেরা হাঁকছে— এই যে এদিকে, কী বই চাই? কী বই, ভাই? ইস্কুলের বই, কলেজের বই, কিংবা পথখরচা টিফিনখরচা বাঁচিয়ে প্রেসিডেন্সির দেয়ালে সাজানো রকমারি বিষয়ের পুরোনো বই ঘাঁটা, দরদাম করা। মনে হয় কিছুই যেন বদলায়নি এই এতগুলো বছরে। সেই পুরোনো বইয়ের গন্ধ, সেই উৎসর্গপত্রে লেখা কবেকার উপহারলিপি, সেই চশমার আড়ালে জ্বলজ্বলে চোখ, চিবুকে হালকা দাড়ি, হলুদ পাতায় ঝাপসা হয়ে আসা নাম, দেয়ালে পোস্টারে মুঠিবদ্ধ হাত, দীপ্ত অক্ষরের অঙ্গীকার। হেয়ার স্কুলের রেলিঙের গায়ে ফুটপাথে বাঁকা ক্ষয়াটে রক্তপলাশ গাছটায় এখনও ফুল আসে খোঁপা, জানো, ফাল্গুনের দুপুরে পাতার আড়ালে একটা কোকিলের ডাক ছাপিয়ে যায় স্লোগানের ধ্বনি। এখনও বিকেলের মধুরং আলো ফোটে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোটা থামে, নীচে ফুটপাথে টেবিল পেতে সিলেবাস আর প্রশ্নমালা নিয়ে বসা সেই লোকটা এখনও ঠোঙায় করে মুড়ি-বাতাসা খায়। হলুদ গোলাপি মলাটের চটি বইগুলো তুলে নিয়ে দেখ, সেই জ্যালজেলে নিউজপ্রিন্ট, সেই ১৯২১ সালের বিএ অনার্সের প্রশ্ন, সেই ওয়ার্ডসওয়ার্থ ডিকুইন্সি কোলরিজ কীটস, সেই কবেকার স্কাইলার্ক নাইটিঙ্গেলের স্বর, কবেকার কাক আর কোকিলের শরীরের ধুল।

তোমাকে একটি কবিতা শোনাবো, অপু— ম্যাথু আর্নল্ডের স্কলার জিপসি। রিপন কলেজে আইএ ক্লাসে ইংরেজির প্রফেসর সিসিডি যেটা পড়াতেন, ছাপাখানায় রাত-জাগা ক্লান্তিতে জুড়ে আসত তোমার চোখ। সেসব কবেকার কথা। কবিতাটা লেখা হয়েছিল তারও অনেককাল আগে, রাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে। তারও ঢের আগের এক কিংবদন্তি— অক্সফোর্ডের এক উচ্চাশী যুবকের গল্প, এক ছাত্র, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য দোরে দোরে চাকরির উমেদারি করে ব্যর্থ হয়েছিল সেও।

গল্পটা চেনা লাগছে কি? সেই বেকারত্বের দিনগুলো, সেই সামান্য কটা টিউশনি, মেসে ঠাকুরের মুখঝামটা, বিহারি দারোয়ানবৌয়ের উনুনে ফোটানো আলুসিদ্ধ-ভাত কিংবা ছাতুমাখা? অক্সফোর্ডের সেই যুবক কিন্তু একদিন চলে গিয়েছিল জিপসিদের সঙ্গে, ওদের গুপ্তবিদ্যা আয়ত্ত করার বাসনায়। তারপর বেশ কিছুকাল কেটে গিয়েছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিন গ্রাম ছাড়িয়ে বনের পথে দুই পুরোনো সহপাঠীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল সেই যুবকের। বিদ্যা অধিগত হয়নি, এক অতীন্দ্রিয় ক্ষণের জন্য প্রতীক্ষা করছে সে— এটুকুই শুধু বলেছিল সেদিন, তারপর মিলিয়ে যায় বনের ছায়ায়। তার পরনে ছিল জিপসিদের মতো পোশাক।

তারপর অনেক কাল কেটে গিয়েছে। এক অস্থির সময়ের ভেতর কালাতিপাত করছেন কবি। চারিদিকে গোধূলিসন্ধির নৃত্য, ছায়ারা ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছে। পুরোনো বিশ্বাসের পৃথিবীটা শুকিয়ে মরে গিয়েছে, আর সেই মৃত পৃথিবীর গর্ভে এক নতুন পৃথিবী ভূমিষ্ঠ হবার জন্য ছটফট করছে। পুরোনো একটি বইয়ে সেই স্কলার জিপসির কথা পড়েছেন কবি। স্থানীয় লোকমুখে শোনা, রহস্যময় মানুষটিকে আজও দেখা যায়, প্রবাদপ্রতিম। সরল গ্রাম্য মানুষেরা কেউ কেউ তাকে দেখেছে— পরনে সেই আদ্যিকেলে জিপসিদের জোব্বা আর টুপি, ধোঁয়াকীর্ণ সরাইখানার কোনে বসে আছে বিষণ্ন, নির্বাক। কিন্তু হাসিঠাট্টা মাতাল প্রলাপের মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে তাকে আর দেখতে পায় না কেউ, কখন যে চলে গিয়েছে। কিংবা সাঁঝের খেয়ার যাত্রীরা দেখেছে কখনো— নৌকোর গলুইয়ে একা বসে, কোলের ওপর একরাশ বুনো ফুল। আকাশে চাঁদ উঠেছে। রুপোলী জলে আনমনে আঙুল ডুবিয়ে দিয়েছে সে, নৌকোর পাড়ি জলতৃক ছিঁড়ছে ছপটির মতো। কিন্তু ওপারের ঘাটে নেমে পিছন ফিরে তাকালে দেখা যায় না আর, জলে জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকিতে মিলিয়ে গিয়েছে বুঝি। কখনো আবার অঘ্রাণের রোদে পাকা ফসলে যখন ঝিকিয়ে ওঠে কাস্তের ফলা, ঘাসের ওপর হাওয়া বিলি কাটে, নদীপাড়ে চটক পাখির ওড়াউড়ি, কাটুনি শ্রমিকেরা তাকে বসে থাকতে দেখেছে জলের ধারে— গভীর চিন্তায় মগ্ন, দূরে চেয়ে আছে। কিন্তু দুপুরবেলায় দল বেঁধে নাইতে আসার সময় দেখা যায় না আর। ছায়ার মতো মিলিয়ে গিয়েছে। কিংবা গ্রীষ্মের সাঁঝে দূরের গ্রাম থেকে যে মেয়েরা নাচতে আসে ওকবীথিতে, একদিন তারা...

এভাবেই কাতর কবি খুঁজে চলেছেন তাকে, স্কলার জিপসিকে।

এভাবে আমিও তোমায় খুঁজে চলেছি, অপু— বাংলার মাঠেঘাটে গ্রামে নদীপাড়ে পাঠশালায়, যেখানে সমবেত নামতাপাঠের ধ্বনি দূর থেকে শোনা যায় মৌচাকের মতো, কুয়োর লাটাখাম্বায় দড়ির গোঙানি মিশে যায় অলস ছাগলের ডাকে, ইস্কুল ছুটির ঘণ্টা ছড়িয়ে যায় নদীর ওপারে। তোমায় খুঁজছি আমি কতকাল। তোমার সবুজ মন, তোমার পিপাসা, আর আমাদের এই জীর্ণ বন্ধ্যা সময়। ছায়া ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছে, ভালো করে দেখা যায় না কিছু। গভীর অবসাদের ভেতর আমাদের মুখগুলো কেমন শুকিয়ে কুঁকড়ে আসে, ক্রিমি বাসা বাঁধে চোখের মণিতে, নষ্ট ফলের মতো ত্বক, ঝুঁকে-পড়া পিঠে কুঁজ গলগণ্ড...

আর তুমি কেবলই পালিয়ে চলো আমাদের এই সময় থেকে, আমাদের জ্বরো ছোঁয়াচ থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীল রঙের টেম্পো

স্কুলে নতুন ক্লাস শুরু হলে দেখা যায় বেশ কিছু পুরোনো মুখ নেই, হারিয়ে গিয়েছে। এভাবে হারিয়ে যেতে যেতে প্রতি দশ জনের মধ্যে তিনজন স্কুলের গণ্ডি পার হয়, বাকিরা খসে যায়।

কোথায় হারিয়ে যায় ওরা? কোথায় পালায়?

সেই রহস্য অনুসন্ধানে আমরা চলেছি শেখপাড়ায়। গ্রামটা হাওড়া জেলায়, দুশো ঘর মুসলমানের বাস। তার আগে রাত্রিবাস করেছি যে গ্রামে তার নাম খেজুরদহ, তফশিলি সম্প্রদায়ের গ্রাম। দুই গ্রামের মাঝে আদিগন্ত মাঠ, তার ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে চলেছি। আমার সঙ্গী বছর তিরিশের আনন্দ রায় মাধবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের শিক্ষক। ভূমিপুত্র সে, স্কুল সার্ভিস কমিশন হবার আগে নিয়োগ হওয়া শেষ প্রজন্ম। কিছুকাল আগে আনন্দ বিএড করেছে কলকাতার ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ থেকে। সেখানে অধ্যাপনা করে আমার এক বন্ধু, সে-ই যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়। আমি তখন রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এইভাবে যোগাযোগের সূত্র ধরে একটা জাল বুনে চলেছি এক অলীক সত্যের কাইমিরা ধরবার আশায়।

মাঠের বেশিরভাগ জমিই আচোট, বর্ষায় একবার চাষ হয়। কাটা খড়ের নাড়াগুলো শুকিয়ে ধুলো হয়ে এসেছে। মাঘ সকালের পাংশু সূর্যালোকে টনটন করছে মাটি। মিহি কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে আছে দূরে গাছগাছালির মাঝে আঁট-বাঁধা শেখপাড়া গ্রামটা। আমাদের গন্তব্য অস্পষ্ট, আক্ষরিক অর্থে।

লক্ষ্য যদিও স্পষ্ট। ওই গ্রামে থাকে রফিকুল ইসলাম নামে এক কিশোর, আনন্দর স্কুলে দশম শ্রেণির ছাত্র। আর কয়েক মাস পরে মাধ্যমিক পরীক্ষা, কিন্তু অঘ্রানের শুরু থেকে রফিকুল স্কুলে আসছে না। কেন আসছে না, তার হদিশ নিতে এই যাত্রা। রফিকুল শেখপাড়ার একমাত্র বালক যার এবছর মাধ্যমিকে বসার কথা। ওই গ্রামে খুব কম ছেলেমেয়েই এতটা দূর অব্দি আসতে পারে, আনন্দ জানিয়েছে। শেখপাড়ায় কোনো হাইস্কুল নেই।

ন্যাড়া ডাঙাজমির মাঝখানে মাথা তুলেছে তালবীথি, নীচে ঘন ঝোপঝাড় হয়ে আছে। জায়গাটা ভাগাড়, আশেপাশের গ্রামের যত মরা জীবজন্তু ফেলা হয়। কাছাকাছি আসতে বাতাসে একটা চিমসে গন্ধ ভেসে আসে। তালের বালদোয় হাওয়ার শব্দ শোনা যায়, অদ্ভুত বিশুষ্ক নির্জন একটা শব্দ। একটি বটের বুক ফাটিয়ে উঠেছে তালগাছ। নাকি তালগাছকেই বেড় দিয়ে উঠেছে বট?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের ছেলেবেলায় তালগাছের মাথায় শকুন বসে থাকত, আনন্দ বলে। ভাগাড়ে মরা গরুমোষ পড়েছে খবর পেলে আমরা এখানে চলে আসতাম। ডোমেরা চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার পর ডানা ঝাপটে নেমে আসত শকুনগুলো। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে হাড় কখানা পড়ে থাকত। আমরা দূরে বসে সেই দৃশ্য দেখতাম। আজকাল আর শকুন দেখা যায় না।

ভ্যারেন্ডা আকন্দ আশশ্যাওড়ার ঝোপ চিরে বেঁকে গিয়েছে পথ, খানিকটা যাবার পর খেতের আল ধরে চলা। খটখটে ফুটিফাটা হয়ে আছে জমি। সেখানে তিনটি বালক খড় জড়ো করে আগুন জ্বেলেছে। ওরাও কি শকুনের কেরামতি দেখার জন্য অপেক্ষা করছে? স্কুলছুট? কাছে গিয়ে দেখি মাঠ থেকে আলু জোগাড় করেছে, পাটকাঠি দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেগুলো পোড়াচ্ছে।

মাঠ ছেড়ে একটা পায়ে-চলা মেঠো পথ, দুপাশে রাংচিতের বেড়া দেওয়া, গ্রামের ভেতর ঢুকেছে। সেই পথ ধরে কয়েক পা যেতে একটা বিচিত্র শব্দ কানে ভেসে আসে।

শুনতে পাচ্ছেন? আনন্দ দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করে।

হঠাৎ মনে হয় যেন এক বনের ধারে এসে পড়েছি। ঝাঁকে ঝাঁকে ঝিঁঝিঁপোকা ডাকছে আর তার ফাঁকগুলো ভরে তুলছে অনেকগুলো কাঠঠোকরার ঠক ঠক ঠক ঠক শব্দ। ঝিঁঝিঁপোকাদের তান হাওয়ার ওঠানামার সঙ্গে বাড়ছে আর কমছে।

পা চালিয়ে গ্রামের মধ্যে কিছুদূর যেতে বিভ্রমটা আলগা হয়ে খুলে এল। যে ধ্বনিটাকে কাঠঠোকরার ঠক ঠক বলে ভাবছিলাম, সেটা কাপড়ের ওপর নকশা-কাটা কাঠের ব্লক ছাপাইয়ের শব্দ। আর ঝিঁঝিঁর তান প্রকৃতপ্রস্তাবে অনেকগুলো সেলাই মেশিন, পায়ের ছন্দে একটানা ঘর্ঘর ঘর্ঘর শব্দ উঠছে আর নামছে। পথের দুপাশে দর্মার পার্টিশান দেওয়া মেটে উঠোনে দাওয়ায় একদল কর্মব্যস্ত গ্রাম্য মেয়ে। সেলাই এমব্রয়ডারি ব্লকছাপাই আর জরির কাজ হচ্ছে, উলুবেড়িয়া হয়ে যোগান চলে যাবে শহরের বাজারে দোকানে। কলকাতার অনেক নামীদামি বুটিকের কুর্তা সালোয়ারসুট ইত্যাদি নাকি তৈরি হয় এখানে, আনন্দ জানায়।

মৌচাকের মতো ভনভন করে গোটা পাড়া, দর্মা টালির ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে আসে বিভিন্ন যন্ত্রের ধ্বনি, এফএম রেডিয়ো। কোনো কোনো বাড়ির উঠোনে বাঁশে ঝোলানো কলাপাতার আব্রু শুকিয়ে ছিঁড়ে গিয়েছে। তার ফাঁক দিয়ে চকিতে দেখা যায় ঘন কাঁঠালছায়ায় বসে একদল মেয়ে কোলের ওপর নানারঙের উজ্জ্বল কাপড়ে ঝুঁকে সুতোর ফোঁড় তুলছে। কাপড়ে প্রতিফলিত রঙিন আভায় ছায়ামূর্তিগুলো অদ্ভুত রহস্যময়। স্পষ্ট দেখা না গেলেও একসঙ্গে অনেক মেয়ে যে এইসব ঘরোয়া কর্মশালায় রয়েছে, তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়।

আনন্দ ব্যাখ্যা করে: আশেপাশের তিন-চারটে গ্রামের মেয়েরা কাজ করে এখানে। হাওড়ার মহাজনেরা কাপড় সুতো ডিজাইন সব পাঠিয়ে দেয়, শুধু লেবারটা নেয়। আগে এই কাজগুলো উলুবেড়িয়ার আশেপাশে হতো। ওখানে মজুরি চড়ে যাওয়ায় ক্রমশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেতরের দিকে কাজ আসছে। গ্রামসড়ক যোজনার পাকা রাস্তা হবার পর মিনি ট্রাক ভ্যান সরাসরি গ্রামে ঢুকে পড়ছে। পুজো-পরবের আগে সারারাত হ্যাজাক জ্বেলে কাজ হয়।

এখানে বিদ্যুৎ আসেনি। নমশূদ্রদের গ্রাম খেজুরদহেও না। কিন্তু শেখপাড়ার ভেতর যত ঢুকতে থাকি, ক্রমশই অভাবের খিন্ন ছবিটা চোখে ধরা পড়ে। ঘরগুলোর বেশ জীর্ণ দশা— চালের খড় পচে গিয়েছে, বর্ষায় বৃষ্টিতে ক্ষয়া মাটির দেয়াল। কাঁচা রাস্তার ধার দিয়ে চলে গিয়েছে কালো নর্দমা, এঁদো ডোবার কালো জলে সাঁতার দিচ্ছে গুটিকয় পাতি হাঁস, বাসন মাজছে এক রমণী। পথে উঠোনে রোদ পোয়াচ্ছে অথর্ব বুড়োবুড়ি, পেট-ফোলা নগ্ন শিশু। ছোটো একটুখানি জায়গার মধ্যে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে অনেক মানুষের বাস, সেটা আশেপাশে উচ্চবর্ণ হিন্দুদের গ্রামের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই মালুম হয়; ভিটের লাগোয়া বাগান নেই, শিশুদের খেলার জায়গা রাস্তার ওপরেই। গ্রামের একপ্রান্তে একটা ঝুপসি বাঁশঝাড় আছে কেবল, তার ছায়ায় কবরস্থান। মাজারটা মাঠের ধারে। গ্রামের মাঝখানে অবশ্য একটি মসজিদ আছে— একতলা সবুজ রঙের ঘর, তার ছাতে লাউডস্পিকার ব্যাটারি-চালিত। তিন দিক থেকে রাস্তা এসে মিলেছে এখানে। একটি মুদির দোকান, তার মাটির দেয়ালে ঝুলছে হলুদ পাবলিক টেলিফোন, পাশে স্লেটে খড়ি দিয়ে লেখা— লোকাল কল ১ টাকা। একদল জুঙ্গি-পরা বিভিন্ন বয়সের পুরুষ চাটাই পেতে তাস খেলছে।

সাদা দাড়িওয়ালা এক বৃদ্ধ থেলো হুঁকোয় টান দিতে দিতে খেলা দেখছেন, তাঁর কাছে আনন্দ রফিকুল ইসলামের বাড়িটা কোনদিকে জানতে চায়।

বাপের নাম কী? বৃদ্ধ শ্লেষ্মা জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করেন।

আনন্দ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে, মাধবপুর হাইস্কুলে পড়ে, এবার মাধ্যমিক দেবে।

উচিয়ার আলির ছেলের কথা বলছে। হাতের তাস থেকে চোখ না সরিয়ে এক খেলোয়াড় বলে ওঠে।

ইটবাঁধানো রাস্তা থেকে একটা পায়ে-চলা পথ ঢুকে গিয়েছে ঘন আমবাগানের ভেতর। বহুকালের পুরোনো বাগান, মোটা মোটা গাছের ডালে অর্কিড ঝুলে আছে। বাগানের শেষে রফিকুলদের খোলার ঘর, ছড়ানো উঠোন। সেখানে মাটিতে গর্তকরা উনুনে আয়তাকার টিনের পাত্রে গুড় জ্বাল দিচ্ছে একজন লোক, খালি-গা। এক নারী ও একটি ছোটো মেয়ে উবু হয়ে বসে খেজুর গুঁড়ির টুকরো গুঁজে দিচ্ছে জ্বলন্ত খোঁদলের ভেতর। আগুনের শিখা অসংখ্য গর্ত দিয়ে লক লক করছে। কয়েক হাত দূরে এক বালক মাটির সরু নাগরি সরা পরপর সাজিয়ে রাখছে শীতলপাটির ওপর।

ইস্কুলে আসছিস না কেন রে রফিকুল? আনন্দ ছেলেটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে।

আনন্দকে এভাবে দেখে থতমত খেয়ে যায় রফিকুল, এদিক ওদিক তাকায়, কোথায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লুকোবে ভেবে পায় না শেষকালে বাধ্য প্রাণীর মতো ত্রস্ত পায়ে আমাদের সামনে এসে মাথা নীচু করে দাঁড়ায়। পাতলা চেহারা, একমাথা কোঁকড়া চুল, চোখদুটো অদ্ভুত স্বচ্ছ।

অ-অসুখ করেছিল মাস্টারমশাই, রফিকুল বলে।

একমাসের ওপর অসুখ? তোকে দেখে তো মনে হচ্ছে না?

না, মানে... রফিকুল মাথা চুলকোয়।

আমি বলছি!

গুড় জ্বাল দেওয়া ছেড়ে তড়িঘড়ি উঠে আসেন খালি-গা মানুষটি। রফিকুলের বাবা।

গুড় করছি তো এ বছর, দিঘির পাড়ে বিশ্বেসদের ষোলখানা গাছ জমা নিইছি। একা হাতে সব পেরে উঠিনে বাবু, তাই রফিকুল কদিন এট্টু জোগাড় দিচ্ছে।

বয়সে যুবক, কিন্তু কঠিন শ্রম আঁচড় কেটেছে উচিয়ার আলির মুখে। চোখদুটো রফিকুলের মতোই স্বচ্ছ।

আপনি আনন্দস্যার না? উচিয়ার হাসেন। রফিকুল বলেছে আপনার কথা।

কথোপকথনের মাঝে উনুনের পাশ থেকে নারী ঝটিতি ঘরে ঢুকে একটি নকশি পাটের জাজিম এনে পেতে দেন উঁচু দাওয়ায়। ইতিমধ্যে নিজেকেও ঢেকে নিয়েছেন একচালা ঘোমটায়। উচিয়ার আলি আমাদের আপ্যায়ন করে বসান সেখানে।

নিজে নিরক্ষর হলেও শিক্ষার গুরুত্বটা বোঝেন উচিয়ার। আর কয়েক মাস পরেই মাধ্যমিক। এসময় রফিকুলকে দিনের পর দিন ইস্কুল কামাই করানোটা যে গর্হিত কাজ, সেটাও জানেন। শেখপাড়ায় ওর বয়সি প্রায় কেউই লেখাপড়া করে না, ফলে পাকাপাকিভাবে স্কুলছুট হয়ে পড়ার ঝুঁকিটা প্রবল।

কিন্তু কী করব বলেন তো মাস্টারমশাই? নিজের জমিজিরেত কিছু নেই, পরের জমিতে জন খাটি। বছরভর কাজ থাকে না তো, তাই এটা-সেটা করি। এই সময় গুড়টা করতে পারলে তবু যা হোক কিছু হয়। গুড়ের কাজে লেবার লাগে, কিন্তু লেবার কিনব পয়সা কই? রফিকুলের ইস্কুলটা কামাই হয়। আর কটা দিন ক্ষমাঘেন্না করে দেন, সংক্রান্তিটা যাক। রসে টান ধরতে শুরু হয়ে গিয়েছে।

উচিয়ার আলির কাতর কণ্ঠ, খপ করে আনন্দর হাত দুটো চেপে ধরেন।

আরে, না না! অপ্রস্তুত আনন্দ হাত ছাড়িয়ে নেয়। আমি কিন্তু স্কুলের তরফ থেকে আসিনি। ওর ছুটির ব্যাপারটা আমি হেডমাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলব না হয়। কিন্তু আর কদিন বাদেই টেস্ট পরীক্ষা। এখন না গেলে প্র্যাক্টিকাল ক্লাসগুলো যে ফাঁকি পড়ে যাচ্ছে? সেটা কী করে ম্যানেজ দেবে? নাকি এখানেই পড়াশোনার ইতি? এই গ্রামে ওর বয়সি ছেলেরা যা করে ও তাই করবে?

এই প্রশ্নের উত্তর উচিয়ার আলির জানা নেই। দাওয়ার নীচে মাটিতে বসে থাকেন তিনি, হাঁটুর ওপর দুটো হাত রাখা, অসহায়তার ছবি। কিছুটা দূরে গুড় জ্বাল দেয় রফিকুল, চোখ সামনে নিবদ্ধ, কান সজাগ। লম্বা কাঠের হাতা নৌকোর বৈঠার মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধীরে ধীরে ঠেলতে থাকে ফুটন্ত সোনালি তরলে, মিঠে বাষ্পের আড়ালে ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যেতে থাকে মুখটা। এই প্রশ্নের উত্তর জানা নেই তারও।

প্রশ্ন করা শিক্ষকের কাজ। ক্লাসে প্রশ্ন করা, নবীন মনে কৌতূহল উস্কে তোলা, তারপর নিজেই উত্তরটা দিয়ে দেওয়া। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর আনন্দ নিজেই জানে কি?

কে জানে। ধরণ দেখে মনে হয় এই প্রশ্নটা এর আগেও সে অন্যত্র করেছে।

রফিকুলের ক্ষেত্রে উপলক্ষটা শীতের গুড়। কিন্তু সেটা দীপাবলির আগে আতসবাজি, ডালের বড়ি, প্রতিমা তৈরি অথবা বর্ষায় মাঠে ধান রোয়ার কাজ হতে পারে। স্কুল কামাইয়ের দিনগুলো সপ্তাহ থেকে গড়িয়ে যায় মাসে, ক্লাসের হাজিরা খাতায় p চিহ্নগুলো ক্রমশ a হয়, তারপর ছেদহীন লাল কালির রেখা— হৃৎপিণ্ডের শেষ ধুকপুকুনির ইসিজি রিপোর্টের মতো। একটি মুমূর্ষু ব্যবস্থার সুরতহাল, যেখানে প্রাথমিকে ভর্তি হওয়া প্রতি দশজনের মধ্যে সাত জন স্কুলের গণ্ডি পেরোবার আগেই খসে যায়। সেই সাতজনের মধ্যে পাঁচজন ভূমিহীন নিরক্ষর পরিবারের, সমাজের অনগ্রসর বর্গের।

উচিয়ার আলিদের মতো। উচিয়াররা ভূমিহীন। এবং নিরক্ষর। এবং মুসলমান। এই তকমাগুলি পরস্পরে সম্পর্কিত শুধু নয়, পরস্পরে ক্রিয়াশীল।

উত্তর পাইনি। তার বদলে পেলাম টাটকা পাটালি গুড়, কলাপাতায় মোড়া। কোনো ওজর-আপত্তি খাটেনি। দাম দিতে চাইলে উচিয়ার জিভ কেটে কানের লতিতে আঙুল ছুঁইয়ে বলেছেন— আল্লার দোয়ায় আপনাদের মতো মানুষ আজ পা রাখলেন আমাদের ঘরে। গরিব মুসলমান বলে কি...

এরপর আর কথা চলে না। রফিকুলের মা দেয়ালের ওপাশ থেকে বলেছেন—

আনন্দস্যারের কথা রফিকুল খুব বলে। বলে মা, স্যার একটিবার মুখ দেখেই ঠিক কীকরে যেন টের পেয়ে যায়। ছোটোদের হয়ে গেলেই আমাদের ডেকে নেয়।

কথাটা ঠিক বুঝতে পারিনি, কিন্তু তীব্র অস্বস্তিতে আনন্দর মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল দেখেছিলাম। আমরাও বেরিয়ে এসেছিলাম।

*

শেখপাড়া ছাড়িয়ে বেরোলাম যখন, ততক্ষণে শীতের কৃপণ বিকেল ফুরিয়ে আসছে। সূর্যটা ফিকে গোলাপি হয়ে পশ্চিমে হেলে পড়েছে। গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠের ওপর ঝুলে আছে পুরু ধোঁয়াশার সর, দূরে শীর্ণ দামোদর। এখানে নদীর জল তুলে কিছু শীতের সবজি চাষ হয়। মরা আলোয় খেতের বাঁধাকপি ইস্পাত-নীল হয়ে আছে, তার মাঝে হেলে দাঁড়িয়ে আছে একটি হাতকাটা সহাস্য কাকতাড়ুয়া। আমরা গ্রামসড়ক যোজনার নতুন পিচরাস্তায় উঠে আসি।

উঁচু বাঁধের মতো রাস্তা মাঠের বুক কেটে চলে গিয়ে ফুরিয়ে গিয়েছে নদীর ধারে। উলুবেড়িয়ার বাসরাস্তা থেকে একটা ট্রেকার সার্ভিস চালু হয়েছে, তবে অনিয়মিত—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনন্দ জানায়— নদীতে খেয়া পারাপার বাড়লে হয়তো নিয়মিত হবে। সেই আশায় মাঠের মাটি উঁচু করে দোকানঘরের জন্য ইতিমধ্যেই দাগিয়ে রেখেছে স্থানীয় লোকজন। রাস্তাটা যেখানে কাস্তের মতো বাঁক নিয়েছে, গোটা দুই পানবিড়ি আর চায়ের গুমটিও গজিয়ে উঠেছে। একদল গ্রাম্য নারী সেখানে জটলা করছে। বেশিরভাগ মাঝবয়সি, পরনে মলিন আটপৌরে শাড়ি, খালি পা। দেখে মনে হয় যেন ঘরকন্নার কাজ ছেড়ে উঠে এসে জড়ো হয়েছে, দূরে ঠায় তাকিয়ে কোনোকিছুর জন্য অপেক্ষা করছে।

এই দৃশ্য দেখে, কেন জানি না, বুকের মধ্যে একটা অস্পষ্ট আশঙ্কা দুলে ওঠে। আনন্দরও ভ্রূ কুঞ্চিত হয়।

কাছাকাছি আসতে দেখা গেল ওরা নিজেদের মধ্যে নীচু স্বরে গল্পগাছা করছে। আর দেখা গেল রাস্তার অন্য পারে চায়ের দোকানের মাচায় বসে দাঁড়িয়ে একদল ছেলে। তাদের পরনে ধোপদুরস্ত পোশাক, সকলেরই হাতে ব্যাগ, বয়স পনেরো থেকে পঁচিশের মধ্যে। ওরাও অপেক্ষা করছে, খানিকটা যেন অন্যমনস্কভাবে, কাছেই সমবেত নারীকুলের থেকে একটা উদাসীন দূরত্বে। মাঝে মাঝে দুয়েকজন উঠে কালভার্টের কাছে গিয়ে নিরীক্ষণ করে দূর দিগন্তে, যেখানে রাস্তাটা কালো রেশমি ফিতের মতো পাক খুলে ঘনায়মান অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে। ঘন ঘন ঘড়ি দেখে, মুখে দুশ্চিন্তা ফোটে।

জানা গেল ওরা এই গ্রামেরই ছেলে, গয়নার কাজ করতে চলেছে মুম্বাইয়ের জাভেরি বাজারে। এখানে অপেক্ষা করছে বাসরাস্তার ট্রেকারের জন্য। বাসে উলুবেড়িয়া হয়ে হাওড়া, সেখান থেকে রাতের ট্রেন। রাস্তার ওধারে ওদেরই মা-মাসি-বোন-দিদিরা এসেছে বিদায় জানাতে। দলে সর্দার গোছের ছোকরাটি ছাড়া আর কেউই এর আগে গ্রাম ছেড়ে এত দূরে কোথাও যায় নি। সর্দার ছোকরার হাতে লাল মোবাইল, পায়ে নকল নাইকি, রাস্তার পাশে বাবলা গাছে হেলান দিয়ে একটি পায়ে ভর রেখে দাঁড়িয়ে কথা বলছে দুটি মেয়ের সঙ্গে। দলে সবচেয়ে ছোটোটির বয়স তেরোর বেশি হবে না। সে একলা বসে আছে কালভার্টের ওপর, জটলা থেকে তফাতে, মুখটা দিগন্তের দিকে ফেরানো। জিজ্ঞেস করে জানা যায়, কসাইখানায় কাজ করে ওর কাকা, ও সেখানে চলেছে কাজের আশায়।

সন্ধ্যা হয়ে আসে, কিন্তু ট্রেকার আসে না। সেলাইয়ের মাল ডেলিভারি দিয়ে ফিরছিল একটি ছোটো নীল রঙের টেম্পো, ছেলের দল সেটির সঙ্গে রফা করে। টেম্পোর পিছনে ব্যাগপত্র নিয়ে গাদাগাদি করে উঠে পড়তে থাকে সবাই। মেয়েদের দলটাও রাস্তার ধার থেকে উঠে এসে পিছনদিকে ঘিরে দাঁড়ায়।

ছেলেরা কেউই অন্তত বছর ঘোরার আগে ঘরে ফিরতে পারবে না। কিন্তু কোনো তরফেই কোনো আবেগের প্রদর্শন নেই, সতর্কবাণী নেই, চোখের জল নেই। নীচু স্বরে দুটি চারটি কথা, নীরব চাহনি। সবচেয়ে ছোটো ছেলেটি, যে সারাক্ষণ কালভার্টে পিঠ ফিরিয়ে বসেছিল, এখন সে টেম্পোর রেলিং আঁকড়ে পলকহীন চেয়ে থাকে এক রোগামতো নারীর দিকে। জটলাটা থেকে কয়েক হাত তফাতে দাঁড়িয়ে আছে সেই নারী,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঊর্ধ্বাঙ্গে পোশাক নেই, শাড়ির আঁচল কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে মাথায় ঢাকা। ক্ষীণ গোধূলির আলোয় তার মুখ দেখা যায় না, শুধু গাড়ি চলতে শুরু হবার মুহূর্তে অস্ফুট ঠোঁট নড়ে ওঠে—

ভালো করি খাবা!

ইঞ্জিনের কর্কশ ধ্বনির ভেতর এই তিনটি শব্দ শুধু শোনা যায়।

টেম্পোটা যতক্ষণ পর্যন্ত দেখা যায়, নারীদের জটলাটা দাঁড়িয়েই থাকে। তারপর রাস্তা ছেড়ে ফসল-কাটা মাঠে নেমে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে যায় ওরা, হারিয়ে যায় ধোঁয়াশার চাঁদোয়ার নীচে।

আমরাও নদীর দিকে হাঁটা দিই। ক্ষীণ নীলচে আলোয় ছেয়ে আছে চরাচর। একটু পরেই চাঁদ উঠবে, আজ পূর্ণিমা। হুগলি আর দামোদরের সঙ্গম থেকে সেই চন্দ্রোদয়ের দৃশ্য দেখাবে বলে আনন্দ নিয়ে চলেছে আমায়। একটা সরু মেঠো পথ কিছুটা এগিয়ে দামোদর নদের পাড় ধরে চলেছে। নামেই নদ, শীতসন্ধ্যার অন্ধকারে প্রায় হারিয়েই গিয়েছে। দুপাড়ে ছায়াচ্ছন্ন গাছপালা দেখে একটা খাতের আন্দাজ পাওয়া যায়, একটা নদীর হাড়গোড়, ঘন কচুরিপানার দামে কবরস্থ। স্থানে স্থানে কালো বদ্ধ জল আকাশের শেষ আলো শুষে চিকচিক করছে। স্থানীয় মানুষেরা বলে দামোদরের খাল।

ছোটোবেলা থেকে শুনে আসছি খাল। তবুও জানেন তো, এটাই কিন্তু মূল ধারা। আনন্দ বলে।

ছোটোনাগপুরের মালভূমির ওপর দিয়ে প্রবল বিক্রমে ধেয়ে আসা নদীটা বাংলার সমতলে ঢুকে নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে। সুতো খুলে আসার মতো বহুধা হয়েছে। বর্ধমানের কিছু আগে তার একটি ধারা কানা দামোদর, অন্য আরেকটি উলুবেড়িয়ার কাছে হুগলি নদীতে এসে মিশেছে। তার আগে অসংখ্য বাঁধ আর কলকারখানার বর্জ্য দূষণ তার গলা টিপে ধরেছে। নদীটা মজে গিয়েছে, মানুষের চেতনা থেকেও হারিয়ে গিয়েছে। একটা নদী লোকমুখে হয়ে গিয়েছে একটি খাল। তার পাড়ে প্রাচীন টেরাকোটার নবরত্ন শিবের মন্দির। ঝোপজঙ্গলে ঢাকা, পুজো হয় না। ভাঙা ঘাট হারিয়ে গিয়েছে পানার দামে, পাশে ঝুরি-নামানো বটগাছ।

ছেলেবেলা থেকে দেখছি জায়গাটা একই রকম আছে, আনন্দ বলে।

এককালে এই মন্দিরের নাকি খুব জাঁক ছিল। দূরদূরান্ত থেকে নৌকো এসে ভিড়ত, শিবরাত্রিতে মেলা বসতো। সেই হারানো অতীত পোড়ামাটির প্যানেলে খোদাই হয়ে আছে: ময়ূরপঙ্খী বজরা বাজনাদার ভক্ত কীর্তনের দল পুরু লাইকেনে ঢাকা। অন্ধকারে বাদুড়ের ডানার শব্দে তার আভাস ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায়। কিছুটা দূরে জেলেপাড়া। উঁচু পাড় ধরে কয়েকঘর মাটির কুঁড়ে। টিমটিমে লম্ফর আলোয় দেখা যায় উঠোনে উলটোনো ডিঙি, বাঁশের আড়ায় জাল শুকোচ্ছে। আরও কিছুটা গেলে বেশ বড়ো একটা মাঠ, লকগেট, দামোদর মিশেছে হুগলিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঠের দিক থেকে লাউডস্পিকারের গান ভেসে আসে। অন্ধকারে একদল মানুষ, একটি ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে।

পিকনিক পার্টি, আনন্দ বলে। পঞ্চায়েত থেকে স্পট বানিয়ে দিয়েছে, সারা শীতকাল লোকজন আসে।

ট্রাকের হেডলাইট জ্বেলে মালপত্র গুটিয়ে তোলা হচ্ছে। দুটো অতিকায় সাউন্ডবাক্স থেকে ধক ধক শব্দে গান বাজছে চারদিক কাঁপিয়ে। মাঠের মাঝখানে তিন-চারটি ছায়ামূর্তি নেচে চলেছে রোবটের মতো। চারদিকে এঁটো থার্মোকলের প্লেট ছড়ানো। দুটি ছোটো ছেলেমেয়ে আর একপাল কুকুর। নাচিয়েদের মধ্যে একজন উবু বসে বমি করতে শুরু করে দেয়। আমরা মাঠের পথ এড়িয়ে পাড় ধরে গঙ্গার কাছে এসে বসি।

জোয়ার চলেছে গঙ্গায়। দূরে নৌকোয় আলোর বিন্দু দেখে তার চওড়া বিস্তারের একটা আভাস পাওয়া যায়। ওপারে ফলতা, উত্তরে উলুবেড়িয়া। বোধহয় লোডশেডিং চলেছে, অন্ধকারে নিশ্ছিদ্র গাছপালার শীর্ষরেখা থেকে আকাশ তফাৎ করা যায় না। শিরশিরে হাওয়া দিচ্ছে, কিন্তু জলের কাছে উষ্ণ ভাপ আসে। আমরা পুবদিকে মুখ করে শুকনো ঘাসে বসি, চাঁদ ওঠার জন্য অপেক্ষা করি। ট্রাকটা চলে যেতে মৃদু জলের শব্দ শোনা যায়। সামনে একটা ছইতোলা নৌকো বাঁধা, ভেতরে কেউ নেই। ছোটো ছোটো ঢেউয়ের ধাক্কায় নৌকোটা দুলছে। মনে হয় যেন আমরা অনুপ্রবেশকারী, এক আত্মমগ্ন জগতে ঢুকে পড়েছি।

রফিকুলের মা তখন কী বলছিল, ওর মুখ দেখে টের পেয়ে যাবার ব্যাপারটা? আমি জিজ্ঞেস করি।

ও কিছু না।

আনন্দ চুপ করে থাকে, একটি মাটির ঢেলা তুলে জলে ছুঁড়ে দেয়। কোনো শব্দ হয় না।

উঁচু ক্লাসের ছেলেরা অনেক সময় বাড়িতে কিছু না খেয়েই ইস্কুলে চলে আসে, সঙ্গে টিফিনও আনে না। এদিকে মিড-ডে-মিল তো কেবল প্রাইমারি সেকশানের জন্য। আমরা তাই দু-চারটে এক্সট্রা পাত ধরে রাখি, ছোটোদের খাওয়া হয়ে গেলে আলাদা করে ডেকে নিই। তবে ওদের আত্মসম্মানবোধ খুব টনটনে। বাড়িতে খেয়ে এসেছে কী না জিজ্ঞেস করলে ঘাড় নেড়ে বলবে, হ্যাঁ। তাই মুখ দেখে বুঝে নিতে হয়।

পুব আকাশে অন্ধকার চাঁদ ওঠার পূর্বমুহূর্তে মনে হয় যেন আরও ঘন হয়ে উঠেছে, একটা কালো জমাট দেয়াল বুঝি উঠে গিয়েছে। আনন্দ প্রসঙ্গ বদলে বলে—

জানেন তো, জোব চার্নক কলকাতা পত্তনের আগে এই উলুবেড়িয়াতেই প্রথম এসে উঠেছিল। ঘাঁটি বানানোর জন্য এই জায়গাটা ছিল আদর্শ। হুগলি এত চওড়া, পাশেই দামোদর। কিন্তু বাদ সাধল মশা। একটা রাত মশার কামড় খেয়ে কাটিয়ে সোজা পালিয়ে গিয়ে উঠল কলকাতায়।

আনন্দর কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা ফোটে, এমন ভাবে বলে যেন এই সেদিনের ঘটনা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবুন তো একবার, যদি শেষপর্যন্ত এখানেই থেকে যেত ? তাহলে এই জায়গাটার চেহারা এখন কেমন হতো ?

চারিদিক অন্ধকার, চাঁদ উঠতে এখনও কিছু দেরি আছে। তিনশো বছর আগে চার্নক যেমন দেখেছিলেন, চারপাশটা এখন তার থেকে খুব কিছু আলাদা হয়তো নয়। সেই পাতলা কুয়াশা জড়ানো আকাশ, সেই আঁধার বটপাকুড়ের সারি। উত্তর দক্ষিণে বিছিয়ে রয়েছে চওড়া জলপথ। কতকাল ধরে এই পথ দিয়ে দূর দূর দেশের বণিকেরা এসেছে। আমরা যেখানে বসে আছি তার থেকে মাত্র কয়েক হাত দূর দিয়ে গিয়েছে কত শত জাহাজের মিছিল, কয়েক শতাব্দী ধরে। এই পথ দিয়ে বহুদূর থেকে এশিয়ার এই অঞ্চলে সম্পূর্ণ নতুন এক জগত এসেছে তার আলো আর অন্ধকার নিয়ে, ধর্ম আর প্রযুক্তি নিয়ে, ভাষা আর সম্পদের আগ্রাসী খিদে নিয়ে।

জোব চার্নক উলুবেড়িয়ায় থেকে গেলে এখানকার চেহারাটা কেমন হতো আজ সেটা কল্পনা করা কঠিন। ততটাই কঠিন কলকাতাটা এখন কেমন হতো তার একটা ধারণা পাওয়া। তবে এসবের চেয়ে ঢের কঠিন এক আত্মাভিমানী বালকের মুখ দেখে সে অভুক্ত কী না অনুমান করা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোমের সলতে

একটা আশ্চর্য উপন্যাস! একটি ছেলে...

ছেলেটি সদ্যযুবক, মধ্যরাতের কলকাতায় বন্ধুর সঙ্গে রেললাইন ধরে হাঁটছে। স্টার থিয়েটারে সধবার একাদশী দেখে ফিরছে তারা, রেস্টুরেন্টে খেয়েছে। সচ্ছল বন্ধুর সুবাদে অনেকদিন পরে ভালো খাওয়া জুটেছে ছেলেটির। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, মনে ফুর্তি। একটা লেখার পরিকল্পনা বন্ধুকে শোনাচ্ছে সে—

একটা আশ্চর্য উপন্যাস! একটি ছেলে, গ্রামের ছেলে... দরিদ্র, কিন্তু সেনসিটিভ... বাপ পুরুত, মারা গেল... ছেলেটি শহরে এল... সে পুরুতগিরি করবে না, পড়বে... অ্যামবিশাস... পড়ল... শিক্ষার ভেতর দিয়ে, স্ট্রাগলের ভেতর দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার কুসংস্কার গোঁড়ামি সমস্ত কেটে যাচ্ছে... বুদ্ধি দিয়ে ছাড়া সে কোনো কিছু মানতে চাইছে না... কিন্তু তার কল্পনাশক্তি আছে... তার অনুভূতি আছে... ছোটো ছোটো জিনিস তাকে মুভ করছে... তাকে আনন্দ দিচ্ছে... হয়তো তার ভেতরে মহৎ একটা কিছু করার ক্ষমতা আছে... সম্ভাবনা আছে...

এটি অপুর লেখা উপন্যাস, যার পাণ্ডুলিপির পাতাগুলো একদিন সে ছড়িয়ে দেবে মধ্যপ্রদেশের অরণ্যপাহাড়ে। এটি অপুর আত্মকাহিনিও। এটি ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে মধ্যবিত্ত বাঙালির আত্মকাহিনি। একটি আশ্চর্য উপন্যাস, যা লেখা শুরু হয়েছিল অপুর গল্প শুরু হবার একশো বছরেরও বেশি আগে, এই বাংলার মাটিতে।

হুগলি নদী দিয়ে পালতোলা জাহাজে এসেছিল যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিকেরা, পলাশী যুদ্ধের পর তাদের হাতে মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে। এই বিশাল ভূখণ্ড, এত মানুষ, বিচিত্র তাদের আচার ভাষা। শাসনকার্য চালাবার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ল এক শিক্ষিত আমলা শ্রেণির, যা গড়ে নিতে হবে এই মানুষগুলের মধ্যে থেকেই। তাদের প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে।

দিতে হবে সেই শিক্ষা, যা সৃষ্টি করবে এক শ্রেণির মানুষ, যারা গুটিকয় শ্বেতাঙ্গ শাসক আর কোটি কোটি শাসিতের মধ্যে হবে তর্জমাকার ; চামড়ার রঙে, চামড়ার নীচে প্রবাহিত রক্তে ভারতীয়, কিন্তু রুচিতে চেতনায় ইংরেজ। এবং সেই শিক্ষার বাহন অবশ্যই হতে হবে ইংরেজি।

জমি তৈরি হয়েই ছিল। ১৮২৩ সালে স্বজাতির উন্নতির জন্য রাজা রামমোহন রায় লর্ড আর্মহার্স্টকে লিখছেন ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার অপরিহার্যতার কথা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঁকছেন এক মুক্ত আলোকপ্রাপ্ত শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা, যাতে থাকবে অঙ্ক ভৌতদর্শন রসায়ন শল্যবিদ্যা... এককথায় পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান, ইউরোপে যার দ্রুত প্রসার ঘটছে সেইসময়। তার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই প্রকাশিত হল মেকলের শিক্ষানীতি। এদিকে এর পাশাপাশি গড়ে উঠেছে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, শ্রীরামপুরে ছাপাখানা, মিশনারিদের ইস্কুল। তারপর হিন্দু কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হল। তার আগেই অবশ্য ডেভিড হেয়ার আর ডাফ সাহেবের পাল্কির পিছু পিছু শুরু হয়ে গিয়েছে ক্ষুধার্ত বালকদের দৌড়— মি পুয়োর বয়! হ্যাভ পিটি! মি টেক ইয়োর স্কুল!

এক বিচিত্র ক্ষুধা, ততোধিক বিচিত্র এক দৌড়, যা চলবে আগামী দু-দুটো শতাব্দী ধরে।

ইংরেজি শিক্ষা মানে সরকারি চাকরি, মানে নতুন ব্যবস্থায় সমৃদ্ধি ক্ষমতা প্রতিপত্তি। বৈষয়িক দিকটা ছিলই, কিন্তু তার পাশাপাশি এক নতুন বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞান, বিশেষত দর্শন আর সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে প্রস্ফুটিত হল এক নতুন মন। এক নতুন ধরণের জেগে ওঠা, এক নতুন রাস্তায় পথ হাঁটা, যা চলবে আগামী বেশ কিছুকাল ধরে।

যা চলেছে এক সদ্য যুবকের মধ্যরাতের শহরে রেললাইন ধরে, শিক্ষার ভেতর দিয়ে যার কুসংস্কার গোঁড়ামি কেটে যাচ্ছে, বুদ্ধি দিয়ে ছাড়া সে কোনোকিছুই মানতে চাইছে না, তার কল্পনাশক্তি প্রস্ফুটিত হচ্ছে গিবন মমসেনের লেখা রোমের ইতিহাস, উইলিয়াম র‍্যামজের গ্যাসেস অব দ্য অ্যাটমসফিয়ার, এক্সটিঙ্কট অ্যানিম্যালাস— ই রে ল্যাঙ্কাস্টারের লেখা, পলগ্রেভের গোল্ডেন ট্রেজারি, প্রক্টরের ওয়ার্ল্ড অ্যারাউন্ড আস, তুরগেনিভ, নীটশে, এমারসন, অলিভার লজের পাইঅনীয়ারস অব সায়েন্স... বিশাল লাইব্রেরির ছাদ পর্যন্ত উঁচু বড়ো বড়ো আলমারি বইয়ে ভরা, নক্ষত্রজগৎ থেকে শুরু করে জীবজগৎ, উদ্ভিদজগৎ, আণুবীক্ষণিক প্রাণীকুল.... এক আনকোরা নতুন জগৎ, এক অপূর্ব হাসি-অশ্রু মাখানো কল্পলোক!

তার আগে সে পড়তে এসেছে কলকাতা শহরে। গরিব ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে, পিতৃহীন হবার পর গ্রামে বংশানুক্রমিক পৌরোহিত্যের পেশায় যেতে বাধ্য হয়েছিল বালক বয়সে। নামাবলী গায়ে জড়িয়ে নারায়ণ শিলা হাতে বাড়ি বাড়ি পূজাপাঠ করা আর নৈবিদ্যের সিধে বগলে ঘরে ফেরার নিত্যপাঁচালি। কিন্তু সেই বিখ্যাত খিদে, যা গত শতাব্দীর বালকদের ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে এক পাদ্রী আর এক ঘড়িবেচা সাহেবের পাল্কির পিছু পিছু, যথারীতি ভর করল তার ওপর। একদিন মায়ের কাছে চুপিচুপি আবদার করে বসল, সে ইস্কুলে যেতে চায়।

কিন্তু ইস্কুলে যেতে গেলে পয়সা লাগে যে? মা বলেছিলেন।

অবোধ বালক প্রশ্ন করেছিল মাকে— তোমার পয়সা নেই মা? পয়সা নেই তোমার?

এরপরেই আমরা অপুকে দেখতে পাব ক্লাসে প্রথম সারিতে। স্কুল ইন্সপেক্টারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনে কবিতা আবৃত্তি করে তাঁকে মুগ্ধ করে দেবে সে, হেডমাস্টারমশাইয়েরও নেকনজরে আসবে। বিদ্যার্জনের পথ সুগম সুনিশ্চিত হয়ে উঠবে তার জন্য।

তুমি ছিলে গরিব ঘরের সন্তান, কিন্তু ব্রাহ্মণ। পড়তি অবস্থা, কিন্তু সমাজে উচ্চশ্রেণি। এবং শিক্ষিত পরিবার। পিতা হরিহর রায়ের পেশা ছিল যজন, যাজন আর পালা রচনা। মায়ের প্রতি তোমার সেই প্রশ্নের একটা সমাধান হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত। কিন্তু শেখপাড়া গ্রামের রফিকুল ইসলামকে যে প্রশ্নটা করেছিল ওর মাস্টারমশাই, তার উত্তর মেলে না।

এখানেই পড়াশোনার ইতি? জিজ্ঞেস করেছিল আনন্দ। গ্রামে ওর বয়সি ছেলেরা যা করে তাই করবে?

উত্তরটা জানতে পারিনি। ক্লাসে রফিকুল কোন সারিতে বসতো সেটাও জেনে ওঠা হয়নি। উচিয়ার আলি ছিল ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক। এবং নিরক্ষর। বাবার পাশে বসে বর্ণপরিচয় শেখার সুযোগ হয়নি রফিকুলের।

কিন্তু রফিকুল যদি ইস্কুলের পড়া শেষ করতে পারে? উচ্চশিক্ষার জন্য যদি সেও কলকাতা শহরে আসে তোমার মতো?

AMARBOI.COM

এসো, কল্পনা করি এক আশ্চর্য উপন্যাস। একটি ছেলে...

গরিব মুসলমান পরিবারের ছেলে। তার নাম হতে পারে শামীম কিংবা আবু। কিন্তু এক মুসলমান তরুণের পক্ষে এই কলকাতা শহরে মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই জোগাড় করা খুব শক্ত কাজ। তাই ধরে নেওয়া যাক বিধবা মায়ের সঙ্গে এই শহরেই থাকে আবু, তিলজলার একটি বস্তিতে। ছেলেবেলা থেকেই পড়াশোনায় অত্যন্ত মেধাবী, উচ্চমাধ্যমিকে ভালো ফল করার পর সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ার জন্য একটি বৃত্তি পেয়ে গেল সে।

আমাদের আবু বি এ অনার্স পড়ে, বিষয় ইংরেজি। সেই কবে দৌড় শুরু হয়েছিল হেয়ার সাহেবের পাল্কির পিছু পিছু, দেড়শো বছর পরে আজও সেই ভাষা উন্নতির সোপানের দরজায় অনিবার্য চাবিকাঠি। অনেকগুলো দরজা খুলতে হবে যে আবুকে, অনেকগুলো ধাপ উঠতে হবে। শহরের একটি অভিজাত কলেজে ঢোকার পর সিঁড়িটা কত ওপরে উঠে গিয়েছে, আর কতটা খাড়া, তার একটা আন্দাজ পায় সে। সহপাঠীরা অনেকে বিত্তবান পরিবারের, দামি গাড়ি চালিয়ে কলেজে আসে তারা। আবু বাসভাড়া বাঁচিয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়া-আসা করে পার্ক স্ট্রিট থেকে তিলজলা, যেন দুটো পৃথিবী, পথে চাচার হোটেল আর কয়েকটা টিউশানি। এই কলকাতা শহরের মধ্যে যে অনেকগুলো কলকাতা আছে সেটা জানতে পারে সে। ক্রমশ তার দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়, লক্ষ্য সূচিমুখ। কলেজের পড়া শেষ করে টিউশনির জমানো টাকায় কম্পিউটারের একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডিপ্লোমা করে আবু। এবং চাকরিও জুটিয়ে নেয়, একটি মাল্টিমিডিয়া ইন্সটিটিউটে শিক্ষকতা। ইংরেজি আর কম্পিউটার— গোলকায়িত বিশ্বের দুটি মুখ্য ভাষা তার করায়ত্ত এখন।

ইতিমধ্যে এসেছে নতুন শতাব্দী, দেশে মুক্ত অর্থনীতির সুপবন বইছে, সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন কাজের ক্ষেত্র। কলকাতা শহরটা ব্যাঙ্গালোর বা হায়দরাবাদ না হয়ে উঠতে পারলেও ক্রমশ জায়গা করে নিচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তির মানচিত্রে। সেক্টার ফাইভ হয়েছে। নতুন কর্মসম্ভাবনার সূর্যোদয় হচ্ছে। সেই প্রথম আলো মুখে মেখে যুবক আবু, স্মার্ট সুদর্শন আবু, ইন্সটিটিউটে জনপ্রিয় শিক্ষক হয়ে উঠল অচিরেই।

মনে পড়ে অপু, কলকাতায় আসার পর তোমার জীবনে এসেছিল এক নারী ? হ্যাঁ, লীলার কথা বলছি। ওর সঙ্গে তোমার আগে থেকেই যদিও পরিচয়, কিন্তু তখন সে বালিকা। আবুর জীবনেও এল এক লীলা, ধনীর দুলালী সেও। জ্ঞান হওয়া থেকে চারপাশে মানুষদের বিনা আয়াসে সবকিছু অধিকার করতে দেখে এসেছে এই মেয়ে। প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই, অধ্যবসায় আর একাগ্রতা মানুষের মধ্যে যে সূক্ষ্ম আত্মমর্যাদার বোধ আনে, যা অপু কিংবা আবুদের তারুণ্যকে দীপ্যমান করে তোলে, তার প্রতি চিরকাল আকৃষ্ট হয়েছে লীলারা। এবারেও তাই হল।

আবুকে দেখলে লীলার মনে হয় যেন ভিড়ের রাজপথে একটি গোপন মোমবাতির শিখা আগলে পথ হাঁটছে সে, কী নিবিষ্ট তার নির্জন। তার তরুণ মুখে লেগেছে সেই আলোর রেশ, স্নিগ্ধ অপরূপ এক আলো। চিবুকে আঙুল ছুঁইয়ে তুলে নিতে ইচ্ছে হয়, ঠোঁটে ঠোঁট ছুঁইয়ে পান করতে ইচ্ছে হয় এই আলো।

ধরা যাক আমাদের এই লীলা ব্যবসায়ী পরিবারের মেয়ে, সল্টলেকে তাদের প্রাসাদোপম বাড়ি। আবু ও লীলার পরস্পরে আকর্ষণ ও প্রেম প্রস্ফুটিত হল এযুগের নতুন কাব্যভাষায়— মাল্টিমিডিয়া আর গ্রাফিক ডিজাইন। ফটোশপে কল্পনারা সাঁতার দেয়, রঙিন বিচ্ছুরণ ঘটে পিক্সেলে। কিন্তু বাস্তব বড়ো কঠিন। সল্টলেক থেকে তিলজলা যতদূর, তার থেকে যোজন দূর এক হিন্দু মাড়োয়ারি পরিবারের থেকে এক বস্তিবাসী মুসলমান পরিবারের।

গোপনে বিয়ে করে ওরা। লীলার পরিবার পুলিশের দ্বারস্থ হয়। কিন্তু দুজনেই সাবালক, তাই আইনের পথে পুলিশের কিছুই করার থাকে না। কিন্তু সর্বত্রই যেমন হয়— পুলিশ প্রথমে হয় ধনী ও ক্ষমতাবানের রক্ষক, তারপরে আইনের। শহরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর পরিবারে এই বিপর্যয়ে আসরে নামেন নগরপাল স্বয়ং, আবুদের লালবাজারে ডেকে পাঠিয়ে হুমকি আর প্রলোভন চলতে থাকে।

চেনা ছক: এক অসম্ভব প্রেমকাহিনি, এক বিকৃতমনা শহর, লোলচর্ম লাস্যময়ী, নিজেকে যে ক্ষমতার পায়ে অহরহ বিকোয়, এক নিষ্ঠুর রাষ্ট্রব্যবস্থা যা ব্যক্তিস্বাধীনতার বাসায় হানা দিয়ে শিকার করে চলে নিত্যদিন...

তিলজলা থেকে লীলাকে পিত্রালয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। একা আবু, ছুটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলেছে দুঃস্বপ্নের নগরীতে, পায়ের নীচে ধারালো ছুরির মতো ট্রামের লাইন, মাথার ওপর চাপ চাপ অন্ধকার। দুপাশে পুঞ্জীভূত ঘরবাড়ি, দরজা বন্ধ, করাঘাত করলে ফাঁপা আওয়াজ হয়। কেউ আছেন? ভেতরে কেউ আছেন? অন্ধকার ঝুলবারান্দায় শ্বাপদের চোখ জ্বলে, অ্যাশফল্টে রবারের ঘষটানির শব্দ শোনা যায়। কাচ-বসানো পাঁচিলে হাঁটে কালো বেড়াল, হলুদ ফোঁটার মতো চোখ জ্বলে। দুঃস্বপ্নের ভেতর পোড়ে আবু, সম্পূর্ণ একা, লীলাকে ফোন করলে যন্ত্র জানায় সে মোবাইল পরিষেবার বাইরে আছে।

কোথায় আছে? কত দূরে?

প্রত্যন্ত রাজস্থানে ওদের গ্রামদেশের কথা বলেছিল লীলা। সেখানে নাকি চারদিকে ধু-ধু বালিয়াড়ি, তাতে সমুদ্রের মতো নানান রং ফোটে দিনের বিভিন্ন প্রহরে। ওকে কি সেখানে নির্বাসনে পাঠিয়েছে? আবুর কামনা তপ্ত বালিঝড় হয়ে ওড়ে সারারাত, বিছানা ভারি হয়ে ওঠে। এবং একদিন রহস্যজনকভাবে রেললাইনের পাশে পাওয়া যায় ওকে।

একটা আশ্চর্য উপন্যাস, যার বর্ণন শুরু হয়েছিল রেললাইন ধরে পথ চলতে চলতে, রেললাইনের পাশে পড়ে থাকে রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত।

মৃত্যুর আগে লীলাকে ফোনে ধরার চেষ্টা করেছিল আবু, পায়নি। তারপর যখন সে শুয়ে আছে লাইনের পাশে ছড়ানো খোয়ার বিছানায়— রক্তাক্ত, অর্ধচেতন— তার মনে পড়ে গিয়েছিল বহুকাল আগে লীলার উপহার দেওয়া একটি বই, সাগরের কথা। সমুদ্রের ভেতর বড়ো বড়ো পাহাড় আগ্নেয়গিরির কথা লেখা ছিল তাতে, আর জীবন্ত প্রবাল যা দেখতে অবিকল গাছপালার মতো। সমুদ্রের গর্ভে সেই হারানো মহাদেশে সাঁতার দিচ্ছিল আবু। তারপর তলিয়ে গেল।

কাহিনিটা এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারত, এখানেই শেষ হয়ে যায় সাধারণত। কিন্তু হল না। শহরটাকে যতখানি নির্দয় ভাবা গিয়েছিল, দেখা গেল ঠিক ততটা নয়। যে কলেজের প্রাক্তনী আবু, সেই সেন্ট জেভিয়ার্সের সামনে ফুটপাথে ওর ছবি রেখে শুরু হল অভূতপূর্ব মোমবাতির প্রহরা, পলকা নীরব কিন্তু অদ্ভুত সোচ্চার আলোর প্রহরা। স্বাক্ষর করল কয়েক হাজার মানুষ। এক নষ্ট সমাজব্যবস্থার প্রতি মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠল রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে, তার নিয়ন্তাদের বিরুদ্ধে। আর তারপর...

সে এক ভিন্ন গল্প।

*

রফিকুলের মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়া হয়নি, একটা আশ্চর্য উপন্যাসের নায়ক হয়ে ওঠা হয়নি। শিক্ষার সোপান থেকে অকালে খসে যায় সে, যা প্রত্যাশিতই ছিল। শেখপাড়ায় ওর বয়সি ছেলেদের মতো হয়তো ভিনরাজ্যে কাজ করতে চলে গিয়েছে সে। গ্রামসড়ক যোজনার যে রাস্তা নতুন কাজের জোয়ার আনে, সেই রাস্তাই আবার গ্রাম খালি করে সমর্থ পুরুষদের নিয়ে যায় ভাঁটায় ফিরতি স্রোতের মতো। সেই রাস্তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে গ্রামের মেয়েরাও পাচার হয়ে যায়। রফিকুলের বোনের কথা জানা হয়ে ওঠেনি আমার।

এতকাল পরে আমার স্মৃতিতে রফিকুলের মুখের সঙ্গে মিশে গিয়েছে সেই বালকের মুখ, ওরই বয়সি, মাঘ সন্ধ্যার নীলাভ আলোয় দেখা। মা-মাসিদের জটলা থেকে মুখ ফিরিয়ে কালভার্টের ওপর একলা বসেছিল সে। তারপর টেম্পোয় উঠে ওর অদ্ভুত স্বচ্ছ চোখদুটো নিবদ্ধ রেখেছিল এক নারীর মুখে, ঘোমটায় ঢাকা, আঁচলের কোনা মুঠো করে ঠোঁটের ওপর চেপে ধরা। সেটা আক্র নাকি উদ্গত আবেগ চাপার জন্য ঠিক বুঝতে পারিনি। নারীমূর্তি দাঁড়িয়েই ছিল, যতক্ষণ অব্দি দেখা যায়, যতক্ষণ না টেম্পোটা দিগন্তে লাল আলোর বিন্দু হয়ে মিলিয়ে যায়।

আমি কল্পনা করি ধু-ধু মাঠের ওপর পড়ে থাকা একটি আনকোরা পথ, অসংগঠিত শ্রমের দুই পৃথিবীর মাঝে বিছিয়ে রয়েছে। তার ওপর দিয়ে যাওয়া আসা করে একটি নীল রঙের টেম্পো— কাজ আনে, কাজের মানুষ নিয়ে যায়। আমি রফিকুলকে দেখি এক অজানা শহরে, একটি ছায়াচ্ছন্ন খুপরির ভেতর, সদ্যমৃত পশুর রক্ত মল মূত্রে ভেজা মেঝেয় দাঁড়িয়ে সারাদিন একটার পর একটা ধড় থেকে উষ্ণ দপদপে নাড়িভুঁড়ি টেনে বের করে চলেছে। এতদিনে হয়তো তার চোখদুটো সেই অপূর্ব স্বচ্ছতা হারিয়েছে, কঠিন চোয়ালে কালো দাড়ির রেখা উঠেছে। এতদিনে একটি-দুটি নতুন ভাষা শিখেছে সে, বেঁচে থাকার নতুন কায়দাও। তবু এখনও প্রতি রাতে এক অন্তহীন শহরে ঘুমোতে যাবার আগে ওর মনে ভেসে ওঠে ঘোমটায় ঢাকা এক নারীর মুখ, বিশীর্ণ ছাইরঙা, টেম্পোটা ছেড়ে যাবার সময় যে বলে উঠেছিল—

ভালো করি খাবা!

আর কিছু নয়। আর কিছু বলার মতো ছিল না।

আমি শেখপাড়ায় যাবার কিছুকাল পরে বিশ্ব জুড়ে আর্থিক মন্দা শুরু হল। তার ঢেউ এসে পড়ল আমাদের দেশেও। ধাক্কাটা লাগল বিশেষত রপ্তানিযোগ্য ছোটো শিল্পে, তার সঙ্গে যুক্ত অসংগঠিত শ্রমের বাজারে। ভিনরাজ্য থেকে কাজ হারিয়ে ফিরে আসতে লাগল সেইসব ছেলেরা। এদিকে কাজ নেই গ্রামেও। তখন রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পালা চলেছে। একটি চিঠিতে আনন্দ আমায় জানিয়েছিল ওর এলাকার কথা।

আশেপাশের গ্রামগুলোয় এখন ঝাঁকে ঝাঁকে বেকার ছেলে, সব মহারাষ্ট্রে গুজরাটে গয়না কিংবা পোশাকের কারখানায় কাজ করত।

কিন্তু এখানে কাজ কই? কে কাজ দেবে? আনন্দ লিখেছিল। চাষের কাজে লাভ নেই আর। যারা নিজেদের অল্প জমিতে নিজেরা শ্রম দিয়ে চাষ করে, তাদের মাসকয়েকের গ্রাসাচ্ছাদনের একটা ব্যবস্থা হয় বড়োজোর। যাদের বেশি জমি আছে তারা লেবার কিনে, সার-জল-ওষুধ কিনে ক্ষতির বোঝা টানতে চাইছে না। জমিতে আমের বাগান কিংবা দেশলাই কোম্পানির কাছে দাদন নিয়ে কদমগাছ লাগিয়ে দিচ্ছে। এদিকে একশো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিনের কাজ, পঞ্চায়েতের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের টাকা রাজনৈতিক আনুগত্যনির্ভর। মাঝখান থেকে গ্রামে একদল কর্মহীন বিক্ষুব্ধ ছেলেছোকরা এসে পড়ায় ক্ষমতার বিন্যাস বদলে গেল, দীর্ঘদিনের ঘুণ-ধরা কাঠামোটা ভেঙে পড়াল আচমকাই।

ইতিমধ্যে নানারকম পরিবর্তন হচ্ছে। শেখপাড়ায় একটি পুরোনো পোড়ো মাদ্রাসা সংস্কার হয়েছে সম্প্রতি, সেখানে এখন অনেক ছেলেমেয়ে পড়তে যায়। দুবেলা খাওয়া পায়, ভাতাও পায় শুনেছি। আমাদের ইস্কুলে খুব কমই আসে আজকাল। এদিকে দামোদরের পাড়ে সেই ভাঙা শিবমন্দিরটি সংস্কার হয়েছে। সেই প্রাচীন টেরাকোটার প্যানেলগুলো ঢেকে দিয়ে সেরামিকের টালি বসেছে, তাতে রঙিন দেবদেবীর ছবি। এছাড়া স্টেনলেস স্টিলের রেলিং, চারদিকে বড়ো বড়ো আলো। শিবরাত্রির দিন খুব ধুমধাম করে পুজো হল। ও হ্যাঁ, আমাদের খেজুরদহ গ্রামে বিদ্যুৎ এসেছে এতকাল পরে। শেখপাড়াতেও এসেছে। মসজিদে নামাজ আর বিশেষ বিশেষ দিনে মৌলবিদের রেকর্ড-করা ভাষণ সম্প্রচার হয়, বহুদূর থেকে শোনা যায়। এখন রোজ ভোরবেলা আমাদের ঘুম ভাঙে শিবমন্দির থেকে লাউডস্পিকারে ভজন আর গায়ত্রীমন্ত্রে। এছাড়া বিভিন্ন তিথিতে অষ্টপ্রহর হরিনাম তো আছেই। আমাদের বাড়ির উঠোনে পাতকুয়োটায় একটা পাম্প বসিয়েছি, ছাতে জলের ট্যাঙ্ক। এখন বাথরুমে কল খুললেই জল, শোবার ঘরে পাখা। এখন গরমকালে এলেও আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। কবে আসবেন আবার?

খেজুরদহ আর শেখপাড়ার মাঝে সেই তেপান্তরের মাঠটার কথা কিছু লেখেনি আনন্দ, ভাগাড়ের সেই পোড়ো জমিটার কথাও লেখেনি। সেখানে হাওয়া দিলে উঁচু তালগাছের পাতায় শকুনের ডানা ঝাপটানোর মতো শব্দ শোনা যায় কি না লেখেনি সে কথা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাগালিয়া বাঁশি

স্বামী হারিয়ে, সংসারের স্বপ্ন কাশীর গঙ্গায় জলাঞ্জলি দিয়ে দেশগাঁয়ে ফিরছে এক নারী। সারারাত ছুটন্ত ট্রেনের জানলায় মাথা রেখে বসে আছে সে, তার শুকনো মুখের ওপর দিয়ে দ্রুত সরে যাচ্ছে অস্পষ্ট আলোছায়া। রাত্রির ধু-ধু প্রান্তর ভেঙে ছুটছে ট্রেন, পাহাড় জঙ্গল টিলা পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে গাঙ্গেয় সমভূমির দিকে। ভোরের আগে ফিকে আলোয় জানলার বাইরে ফুটে উঠল বাংলার গ্রাম। ক্রমশ রুক্ষ ঢেউখেলানো টাঁড়ভূমি যেন জাদুবলে গলিয়ে ভেসে উঠল পুকুর নারকোলবীথি কলাবাগান খড়ের চাল— কী মায়া জড়ানো এই সুজলাং সুফলাং মাতৃভূমি! বেজে উঠল ভীমরাজ আর তারসানাইয়ের চেনা সুর। সব হারিয়ে সেই নারী ফিরে পেল অনির্বচনীয়কে। তার মুখে ফুটল দিনের প্রথম আলোর উদ্ভাস।

সেই দৃশ্য তুমি দেখনি। মায়ের কোলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছিলে তুমি অবোধ বালক। ছুটন্ত ট্রেনের জানলার বাইরে প্রকৃতির এই রূপবদল আর মায়ের মুখে সেই উদ্ভাস দেখতে পাওনি, কিন্তু কীভাবে যেন সঞ্চারিত হয়েছিল ঘুমন্ত মাথায় আঙুলের স্নেহস্পর্শে। এরপর ইস্কুলে যেতে শুরু করবে তুমি। প্রতিদিন দু ক্রোশ পায়ে হেঁটে আসা যাওয়ার পথে বাংলার মাঠঘাট গাছপালার সঙ্গে আজন্মের মিতালি হবে তোমার। কত যে মানুষের দেখা মিলবে পথে।

মনে আছে সেই সাঁওতাল যুবককে? শিকারি ছিল সে; একমাথা ঝাঁকড়া চুল, গলায় হিংলাজের মালা, কাঁধে সত্যিকারের তির-ধনুক। ভাঙা ভাঙা বাংলাও বলতে পারত, বেশ কিছুকাল নাকি বর্ধমানে ছিল। ওরা কিন্তু এসেছিল পশ্চিম থেকে, সেই জঙ্গল টিলা টাঁড়ভূমির দেশ থেকে, এই বাংলায়। আবহমানকাল ধরেই ওরা আসে, নস্টালজিয়া নয়, পেটের টানে, ধান রোয়া আর কাটার শ্রমিক হিসেবে।

তার অনেককাল পরের কথা। তখন তুমি যুবক। সদ্য স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে— উদ্ভ্রান্ত, কর্মহীন। একদিন বিকেলবেলায় হাওড়া স্টেশনে গিয়ে একটি ট্রেনে চেপে বসলে কোনোরকম গন্তব্য ছাড়াই। চারটে বিশ মিনিটের গয়া প্যাসেঞ্জার, ভাড়া সাড়ে চার টাকা, কাউন্টারে টিকিট দিল এক ফিরিঙ্গি মেয়ে। সেই কবে ছেলেবেলায় মায়ের সঙ্গে কাশী থেকে ফেরার সময় ট্রেনে চড়েছিলে, তারপর আর হয়নি। মনে বিচিত্র উত্তেজনা। পশ্চিমগামী ট্রেনের দুধারে দৃশ্য কীভাবে বদলে যায়, কীভাবে গঙ্গা অজয় দামোদরের পলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেবিত আদিগন্ত সমভূমি ছেড়ে, সবুজ ধানের খেত নিবিড় আমকাঁঠালের ছায়াঘেরা গ্রাম ছেড়ে, পুকুর মন্দির নদী কলাবাগান সুপুরির সারি ছেড়ে ক্রমশ জেগে ওঠে ঢেউখেলানো কাঁকরে মাঠ, টিলা টাঁড় পলাশ মহুয়ার দেশ, প্রাচীন গণ্ডোয়ানাভূমি— প্রকৃতির এই রূপবদল দেখবে বলে জানলার ধারে বসেছিলে তুমি। এক অদ্ভুত মাদক সুদূরের টান অনুভব করেছিলে। ট্রেন বর্ধমান ছাড়ার পর অন্ধকার নেমে আসায় সে যাত্রায় আর দেখা হয়নি। কিন্তু এই টান তোমাকে ফের ঘরছাড়া করবে।

যদি সেদিন সূর্য ডুবে না যেত, তাহলে তুমি দেখতে পথ যত পশ্চিমে এগোয়, ততই সবুজ আর্দ্র সমতল ক্রমশ মরে আসে ছুটন্ত ক্যানভাসে, ফুটে উঠতে থাকে এক বিশুষ্ক রিক্ততার ভিন্নতর রূপ। নীলচে পাহাড়ের রেখা এগিয়ে আসে যেন দিগন্তব্যাপী ঘুরন্ত কুমোরের চাকে, ফুটে ওঠে লক্ষ কোটি বছরের জল আর হাওয়ার ক্ষয়, পাথরের গায়ে আকরিক ঔজ্জ্বল্য, তাম্রাভ ঝোপঝাড়, পর্ণমোচির বন। ছোটো ছোটো সেতু পার হবার সময় পাহাড়ি নালাগুলো বেজে ওঠে ঝুমঝুম ঝমঝম শব্দে, অনেক নীচে দেখা যায় পাথরের খাঁজে জল ছেঁচে মাছ ধরছে কালো কালো ছেলেমেয়ের দল, দূরে মাঠে মহুয়া গাছের ছায়ায় বসে আছে রাখালেরা, মহিষ চরছে।

এই পথ ধরেই চাষের মরশুমে দলে দলে মানুষ আসে আমাদের নদী আর ধানের দেশে, তির-ধনুক হাতে সেই সাঁওতাল যুবক যেমন এসেছিল। ওরা আসে ন্যাকড়াকানি জড়ানো কাস্তে নিয়ে, ট্রেন বাস বোঝাই করে। বর্ষায় ধান রোয়া, হেমন্তে ধান কাটা। মাঠের ধারে খড়ের ছাউনি বানিয়ে থেকে যায়, কিংবা চলে যায় আরও দূর পশ্চিমে, গম ডাল আর তৈলবীজের দেশে। কত যে প্রজন্ম ধরে চলেছে এই আসা, টিলা টাঁড় শালপিয়ালের দেশের মানুষদের ঘরছাড়া করেছে এই পথ।

সে এক ভিন্ন গোত্রের টান। তাতে তোমার নতুন দেশ দেখার মাদকতা নেই, তোমার মায়ের দেশে ফেরার মায়াবী উদ্ভাসও নেই।

*

জঙ্গলের মধ্যে L আকারের বাড়ি। দুটি ঘর, একটি রান্নাঘর। জানলা-দরোজা নেই, মেঝেও হয়নি। নির্মীয়মাণ বাড়িটার একপাশে বালি ডাঁই করা রয়েছে কতকাল। জানা গেল, প্রায় তিন বছর। বালির ওপর ছেয়ে এসেছে বুনো লতা। ইস্কুলবাড়ি।

মিস্তিরিরা কাজ করতে এসেছিল বাইরে থেকে। তাদের একজন ম্যালেরিয়ায় মারা যায়, বাকিরা ভয়ে কাজ শেষ না করেই পালিয়ে যায়। সেইথেকে এভাবে পড়ে আছে তিনটে বছর। ইতিমধ্যে দেশে একটি নতুন আইন হয়েছে— রাইট টু এডুকেশান অ্যাক্ট। আমাদেরই যা আসতে দেরি হয়ে গেল। ছুটি হয়ে গিয়েছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে পড়ন্ত দিনের আলোয় ইস্কুলবাড়িটাকে কেমন পোড়ো আর ভুতুড়ে দেখায়। দিনের বেলা ছেলেমেয়েরা যখন থাকে, তখন কেমন থাকে এই জায়গাটা ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অঙ্গনওয়াড়ির বাচ্চারাও কিন্তু এখানে আসে, ভৃগু জানাল।

অঙ্গনওয়াড়ির খাবার এখানে রান্না হয় নাকি? আমি জিজ্ঞেস করি।

আরে না না। ভৃগু হেসে মাথা নাড়ে। ইস্কুল তো, তাই আসে। দাদা দিদিদের পেছন পেছন চলে আসে। এখানে কোনো অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার নেই।

রান্নাঘরে পোড়া ছাই দেখে অনুমান হয় শেষ আগুন জ্বলেছিল বেশ কয়েকদিন আগে। মিড-ডে মিলের চাল আসছে না ব্লক অফিস থেকে। ঘরের ছাত ঢালাইয়ের পর শাটারিং-এর তক্তাগুলো সরানো হয়নি, সেগুলো এতদিনে প্রায় খুলে ঝুলছে। মেঝেয় খোঁড়া ধুলোবালি, অনেকটা পশুর খোঁয়াড়ের মতো। খুব ছোটো বাচ্চারা এখানে থাকে। ওদের দাদা দিদিরা বসে পাশের ঘরে। ব্ল্যাকবোর্ড নেই, এক কোণে একটি দড়ির চৌপাই আছে কেবল।

ওখানে মাস্টারমশাই বসেন, মানে যেদিন আসেন আর কি। ভৃগু বলে।

সরকার দুজন শিক্ষক দিয়েছে এখানে, দুজনেই মোটরবাইকে চেপে আসে ভদ্রক থেকে। বিরসা যোগ করে।

এখান থেকে ভদ্রকের দূরত্ব প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার।

পলেস্তারাহীন ইটের দেয়ালে আলো খোলে না। ঘরগুলো প্রায়ান্ধকার। চোখ সয়ে এলে দেখা যায়, দেয়ালে মাটি দিয়ে আঁকা গুহাচিত্রলিপি। একপাশে পরিপাটি সাজানো বুনো পাতা, যজ্ঞিডুমুর, খোলামকুচি ; রান্নাবাটি খেলা হয়েছিল।

বাচ্চাদের ইস্কুলে পাঠাবার জন্য গ্রামবাসীদের কী বলে উৎসাহিত কর? বিরসাকে জিজ্ঞেস করি।

বিরসা বিরোলি এই প্রোজেক্টের ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট, ভৃগু রথ কোঅর্ডিনেটর। বিরসা কিছু বলার আগে ভৃগুই ওর হয়ে উত্তরটা দিয়ে দেয়।

বিশেষ কিছু করতে হয় না, বাচ্চারা এমনিই চলে আসে। ইস্কুল হয়েছে তো, তাই আসে। এমনকি কুচোকাঁচাগুলো, যাদের অঙ্গনওয়াড়ি যাবার কথা, তারাও আসে।

ভৃগুর মুখ দেখা যায় না। পেছনে ন্যাড়া জানলার ফ্রেমে হেমন্তের বিকেল। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় রাঙা হয়ে আছে গাছের বাকল, সবুজ ঘাস, একঝাঁক ছাতারে পাখির সোচ্চার মিটিং বসেছে। দূর থেকে ভেসে আসছে ছাগলের ডাক। ঘরের ভেতর ছায়াচ্ছন্ন। ব্ল্যাকবোর্ড নেই, শিক্ষাসহায়ক খেলনা নেই, পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, মিড-ডে মিল অনিয়মিত। শিক্ষক রোজ আসেন না, এলেও অচেনা ভাষায় কথা বলেন। তবু ওরা আসে, প্রত্যেকদিন, নিয়ম করে। এই বিচিত্র সত্য চাক্ষুষ করাবার জন্য ভৃগু আমাদের জঙ্গলের ভেতর এই ইস্কুলে নিয়ে এসেছে। কিন্তু পথে দেরি হল। পড়ুয়ারা নিজেরাই স্কুল ছুটি করে গ্রামে ফিরে গিয়েছে।

প্রদীপ এতক্ষণ কথা বলেননি। কম আলোয় মন দিয়ে দেয়ালের আঁকিবুকি আর বনের ফুল পাতা খোলামকুচি সাজিয়ে খেলার ছবি তুলছিলেন। আমার মতোই তিনিও বহিরাগত, ভুবনেশ্বর থেকে এসেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার কি মনে হচ্ছে জানেন? প্রদীপ হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন। আমার মনে হচ্ছে আমরা ভুল দিক থেকে পুরো বিষয়টা দেখার চেষ্টা করছি। কী কী পদক্ষেপ করলে বাচ্চারা ইস্কুলে আসবে সেই চর্চা ছেড়ে আমাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা রহস্য অনুসন্ধান কর উচিত।

বিরসা, ভৃগু ও আমি ফিরে তাকাই। চশমাটা কপাল থেকে নামিয়ে ক্যামেরা খাপে ভরতে ভরতে প্রদীপ গম্ভীর মুখে বলেন—

এরা আদৌ কেন ইস্কুলে আসে? কীসের টানে? সেইটা আগে খুঁজে বের করা দরকার।

আচমকা থাপ্পড়ের মতো এসে পড়া প্রশ্ন! রসিকতা করছে, নাকি এক অভিনব উপলব্ধির কথা বলছে? কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আমরা প্রদীপের কথাগুলোর তল পাবার চেষ্টা করি। না পেয়ে হাসতে শুরু করি, তিনজনেই। প্রথমে আস্তে, তারপর ক্রমশ উচ্চগ্রামে। আমাদের অট্টহাসি শূন্য ঘরে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে। প্রদীপ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে চেয়ে থাকেন কয়েক সেকেন্ড, তারপর হাসিতে যোগ দেন তিনিও।

কিছু হাসি আছে যা মনের ভার লাঘব করে না, একটা অস্বস্তি জমিয়ে তোলে কেবল। বাইরে খোলা আকাশ আর অকৃপণ প্রকৃতির মাঝে বেরিয়ে এসেও সেটা থেকে যায়।

AMARBOI.COM

*

অনেককাল পরে একদিন যতীন নায়কের কাছ থেকে বার্তা পেলাম ই-মেলে। একটি প্রস্তাব: আমি কি দিনকয়েকের জন্য শিমলিপালের জঙ্গলে একটি প্রত্যন্ত আদিবাসী অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে রাজি আছি? কোন সময়ে যাব, কতদিন থাকব সেসব আমি ঠিক করব, বাদবাকি ব্যবস্থাপনা ওঁদের। যতীনের সঙ্গে আমার পরিচয় নিয়মগিরিতে যাবার আগে। সেসময় ওঁর সাহায্য না পেলে পশ্চিম ওড়িশার ওই দুর্গম এলাকায় যাওয়া একপ্রকার অসম্ভব ছিল। তখনই চিনেছি মানুষটিকে। যতীনও চিনেছেন আমায়। এমন একটি প্রস্তাব আমার পক্ষে প্রত্যাখ্যান করা যে কঠিন, সেটা বুঝেছেন। খুবই অনুন্নত অঞ্চল, তবে অপূর্ব নিসর্গশোভা— চিঠির শেষে লিখেছেন— আমি নিশ্চিত তোমার একটা দারুণ অভিজ্ঞতা হবে।

টোপটি লোভনীয়, সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে সুতোও ছিল।

তার কিছুকাল আগে লাগু হয়েছে শিক্ষায় অধিকার আইন, সারা দেশে ছয় থেকে চোদ্দ বছর বয়সি সকলকে বাধ্যতামূলকভাবে ইস্কুলে আনার ভার রাষ্ট্র তুলে নিয়েছে নিজের কাঁধে। এই কর্মযজ্ঞে ওড়িশা সরকারের সহযোগী হিসেবে কাজ করছে ভুবনেশ্বরের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা শিক্ষাসন্ধান, যার কর্ণধার যতীন নায়ক স্বয়ং। আদিবাসী অঞ্চলে স্কুলগুলোয় স্থানীয় জনজাতির ভাষা শিক্ষক নিয়োগ, অভিভাবকদের নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সচেতনতা শিবির, স্কুল পরিচালনা কমিটি তৈরি ইত্যাদি কাজকর্ম নিয়ে শিক্ষাসন্ধানের একটি প্রকল্প চলেছে ময়ূরভঞ্জের তিনটি পঞ্চায়েত এলাকায়, যার আর্থিক অনুদান যোগাচ্ছে জার্মানির একটি সংস্থা। চুক্তি অনুযায়ী বছরের শেষে বাইরের একজন নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞকে দিয়ে প্রকল্পের কাজের হালহকিকত সম্বলিত একটি প্রতিবেদন লিখিয়ে পাঠাতে হয়। সেই কাজটাই করে দিতে হবে আমায়।

কাজটা বেশ শক্ত। প্রথমত, বিশেষজ্ঞ আমি নই। তাছাড়া এই বিষয়ে আমার অল্পবিস্তর ঘোরাঘুরির দৌড় পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই। সম্পূর্ণ অচেনা জায়গায় অজানা ভাষাভাষী মানুষজনের মধ্যে দিনকয়েক কাটিয়ে আস্ত একটা প্রতিবেদন লিখে ফেলা যতটা কঠিন, তার চেয়েও কঠিন নিরপেক্ষ থাকা। কিন্তু যতীন ও তাঁর সহযোগী শিক্ষাসন্ধানের সেক্রেটারি অনিল প্রধানের তরফ থেকে উপরোধ আশ্বাস চলতেই লাগল। আমার তরফেও সংশয়ের আড়াল থেকে উঁকি দিতে লাগল টিলা টাঁড় মহুয়ার দেশের সেই বিখ্যাত বনেদি টান। আর এই দ্বিমুখী টানের মাঝে দাঁড়িয়ে একটা শর্ত দিলাম আমি: যাব, ঘুরব, রিপোর্টও লিখব। কিন্তু সেই রিপোর্টে তত্ত্ব তথ্য পরিসংখ্যান কিচ্ছু থাকবে না। যা দেখব, অনুভব করব, সেটাই লিখব। তাতে যদি অনুদানকারী সংস্থার চাহিদা পূরণ না হয় আমি অপারগ।

সব শুনে যতীন বললেন, তথাস্তু! আমরা এটাই চাইছি। এবং এক নভেম্বরের হিমেল সন্ধ্যায় পৌঁছে গেলাম ময়ূরভঞ্জ জেলার নুয়াশাহিতে, শিক্ষাসন্ধানের প্রোজেক্ট অফিসে। গ্রামের প্রান্তে পিচরাস্তার ধারে একটি পাকা বাড়ির দোতলায় অফিস ও থাকার ব্যবস্থা। বাড়িটার পরেই বিস্তীর্ণ মাঠ, ফসল কাটা হয়ে গিয়েছে, মাঠের শেষে সুনেই নদী, নদীর ওপারে শুরু হচ্ছে শিমলিপালের জঙ্গল।

সেদিন কুয়াশা ছিল না, তারার আলোয় কালো জঙ্গলশীর্ষের পেছনে নীলচে পাহাড়শ্রেণি আলাদা করে চেনা যাচ্ছিল।

এক সপ্তাহ ছিলাম। প্রতিদিন একটি মোটরবাইকের পেছনে বসে শীতের শীর্ণ সুনেই নদী পার হয়ে চলে যেতাম জঙ্গলের ভেতর ছড়ানো গ্রামগুলোয়। সকাল থেকে সন্ধে, রোজ গড়ে একশো কিলোমিটার ধরলে সাতদিনে প্রায় সাতশো কিলোমিটার ঘুরেছি, তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ছড়ানো কুড়িটিরও বেশি গ্রামে গিয়েছি, ইস্কুল পরিদর্শন করেছি, শিক্ষক ছাত্র গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেছি। শেষপর্যন্ত আমার কাছে যা জমেছে তা কতগুলি ইমেজ— কথা শব্দ দৃশ্য আর গন্ধ।

ফিরে এসে রিপোর্টটা লিখতে বসে ইমেজগুলো যতই সাদা পাতায় গেঁথে তোলার চেষ্টা করতে লাগলাম, ততই সেগুলো ঝাপসা হয়ে হারিয়ে যেতে লাগল— ঠিক যেন ছুটন্ত মোটর সাইকেলের আয়নায় অপস্রিয়মাণ দৃশ্যাবলী। সেই আয়নায় লেখা ছিল, যেমন থাকে—

OBJECTS IN THE MIRROR ARE CLOSER THAN THEY APPEAR

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন গিয়েছিলাম, মাঠে ফসল কাটা হয়ে গিয়েছে। গ্রামে গ্রামে ধান ঝাড়াই হচ্ছে, নতুন বাঁশের চালি থেকে উজ্জ্বল সোনালি শস্যদানা ঝরে পড়ছে টনটনে মেটে উঠোনে। সেভাবেই কথা দৃশ্য শব্দ আর গন্ধের রূপকল্পগুলো ঝরেছে আমার চেতনায়, আমার ভেতরে চুঁইয়ে ঢুকে পড়েছে, পরস্পরে ফিসফাস করে চলেছে অবিরল।

একে নিরপেক্ষতা বলে? এভাবে কি প্রতিবেদন লেখা যায়? আমি জানিনা।

*

কাশফুলে ভরা বিস্তীর্ণ মাঠ, দূর আকাশে ধোঁয়ার নিশান উড়িয়ে চলেছে ট্রেন। দুই ভাইবোন ছুটছে রেলগাড়ি দেখবে বলে। তাদের চুল উড়ছে, পরনের কাপড় উড়ছে, হাতে একটুকরো আখ বাঁশির মতো। এই দৃশ্য ছেলেবেলার স্মৃতিতে কাঠখোদাই হয়ে ছিল। মাঠঘাট দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে মেয়েটি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। জীবনে আর কোনোদিন রেলগাড়ি দেখা হবে না তার। কিন্তু ওদের সেই রাঙা গাইয়ের হারিয়ে যাওয়া বাছুর, যাকে খুঁজতে এতদূর এসেছিল, তাকে পেয়েছিল।

ছবির অপু, অক্ষরের অপু— কার সঙ্গে প্রথম পরিচয় মনে পড়ে না। সেই কাঠখোদাই ছবির অগণন ছাপ উড়ে উড়ে ছড়িয়ে পড়েছে আমার ছেলেবেলা জুড়ে। অক্ষরজ্ঞান হবার পর সেই দৃশ্যটা বইয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি, পাইনি। কোথায় যে লুকিয়েছিল। খেলনার বাক্সে সেই আম আঁটির ভেঁপু বইতে কি? একটু বড়ো হবার পর টানা গদ্য পড়তে পারলাম যখন, ততদিনে বইটা জীর্ণ, খুটিকুটি হয়ে হারিয়ে গিয়েছে। মাথার মধ্যে দৃশ্যটা বদলে যাচ্ছিল ক্রমশ। প্রথমে দুর্গা খসে গেল ছবি থেকে, হারিয়ে গেল রুপোলি কাশের বনে। তারপর ধীরে ধীরে অপুও ঝাপসা হয়ে এল।

অনেককাল পরে আমার মনে হল সেইসব অপুরা আবার বুঝি ফিরে এসেছে— হাতের আখের টুকরো হয়ে গিয়েছে পাচনবাড়ি, গরু মহিষের পাল চরাচ্ছে বনের ধারে। মোটরসাইকেলে জঙ্গলের ভেতর এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে যাওয়া আসার পথে দেখতে পেলাম তাদের। সেই দুর্গারাও ফিরে এল— বন থেকে জংলি কাঠপাতার বোঝা নিয়ে ফিরছে, কাঁচা শালপাতার থালা সেলাই করছে, জল বয়ে আনছে বড়ো বড়ো কলসিতে। এক কাঁখে কলসি, আরেকটিতে ছোটো ভাই কিংবা বোন, পরনে মলিন ছোটো হয়ে আসা নীল ফ্রক কোনোকালে স্কুলের ইউনিফর্ম ছিল, অশক্ত দেহের ভারসাম্য রাখছে দুইদিকে দুই বোঝা। ছবিগুলো এতই চেনা যে তার ভেতরের সত্যিটা অভ্যস্ত চোখের ফাঁক দিয়ে পিছলে গিয়েছিল। শিমলিপালের মুক্ত অনাবিল প্রকৃতির মাঝে ফুটে উঠল এক আশ্চর্য তীক্ষ্ণতা নিয়ে।

যে স্কুলগুলোয় আমরা গেলাম, সেখানে সর্বত্রই পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার অর্ধেকেরও কম। ফসল কাটার মরশুম। বাড়ির বড়োরা এসময়ে দূর দূর দেশে ধান কাটতে চলে যায়। ছোটো ছেলেমেয়ে ঘরকন্না সামলায়। যারা খুব ছোটো, মায়ের দুধ ছাড়েনি, তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ কেউ বাবামায়ের সঙ্গে যায়। আবার যারা খানিকটা বড়ো, তারাও যায় হাত লাগাতে। এমনটাই বললেন স্কুলের শিক্ষকেরা।

বছরের এই সময়ে পাকাপাকিভাবে স্কুল-ছুট হয়ে পড়ে অনেক ছেলেমেয়ে।

*

এই প্রবণতা রোখার উদ্দেশ্য নিয়ে একটি শিবিরের আয়োজন করেছে শিক্ষাসন্ধান। রামচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রাইমারি স্কুলের ছেলেমেয়েদের তিনদিনের ছবি-আঁকা গান-গাওয়া গল্প-বলার শিবির। তিনটে দিন সবাই মিলে সারাদিন একসঙ্গে থাকা, খাওয়াদাওয়া—বেশ একটা পিকনিকের পরিবেশ। ঘরভর্তি সৃজনশীলতা কলকল করছে।

আচ্ছা, তোমাদের গ্রামে সব ছেলেমেয়েই কি ইস্কুলে যায়? প্রশ্ন করি আমি।

হিন্দিতে করা প্রশ্ন ওড়িয়ায় তর্জমা করে দেন প্রদীপ। তারপর সেটি হো ভাষায় অনুবাদ করে যমুনা সামাদ, এই প্রোজেক্টে ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট। উপস্থিত ছেলেমেয়েদের বেশিরভাগ কোল্‌হো জনজাতির, দুচারজন শবরও আছে। খুব ছোটোরা ওড়িয়া প্রায় বোঝে না।

না! ওরা সমস্বরে বলে ওঠে। কেউ কেউ জঙ্গলে যায়, মাঠে যায়...

সেখান থেকে কী নিয়ে বাড়ি ফেরো?

কাঠ... শালপাতা... ধান... পেয়ারা... ছাগল... ছাতু... আমলকী...

এদিক ওদিক থেকে লাফ দিয়ে উঠে সোৎসাহে তালিকা তৈরি করতে থাকে।

আর ইস্কুল থেকে তোমরা কী নিয়ে বাড়ি ফেরো?

আমার এই প্রশ্নে চুপ মেরে যায় ওরা, পরস্পরে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

বই!— সামনের সারি থেকে একটি ছেলে পাঠ্যবই মাথার ওপর তুলে বলে ওঠে। ওর চিকন কালো মুখ হাসিতে ঝলমল করে।

কিন্তু বই তো তোমরা বাড়ি থেকেই নিয়ে আস, তাই না? কী এমন জিনিস যা তোমরা বাড়ি থেকে আনো না, কিন্তু ইস্কুল থেকে নিয়ে ফেরো?

আবার নীরবতা। কয়েক সেকেন্ড পরে একটি রোগামতো ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের পেটে আঙুল দেখিয়ে সরল মুখে বলে—

টিকিন মান্ডিজম!

ওর কথায় ঘরসুদ্ধু সবাই হাসিতে ফেটে পড়ে। হো ভাষায় টিকিন মান্ডিজম মানে হল দুপুরের খাবার, অর্থাৎ মিড-ডে মিল। হাসির রোল চলতেই থাকে। আর এসবের মধ্যে একটি মেয়ে, বড়োদের প্রশ্নের মধ্যে লুকিয়ে থাকা উত্তর ধরতে পারার মতো বয়স যার হয়েছে, উঠে দাঁড়িয়ে বলে—

শিক্ষা!

কিন্তু শিক্ষা কী? আমি ফের প্রশ্ন ছুঁড়ে দিই। শিক্ষা দিয়ে শালপাতার মতো থালা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বানানো যায়? নাকি কাঠের মতো জ্বালিয়ে রান্না করা যায়? বাড়িতে শিক্ষা নিয়ে গিয়ে কী কর?

প্রশ্নটা বেয়াড়া, উত্তরটা তাই নিজেই দেবার চেষ্টা করি।

শিক্ষা হল ফলের মতোই— আমি বলি— যা বাড়ির লোকেদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যায়। সেটা খুব ছোটোখাটো জিনিসও হতে পারে, যা কিছু-না-কিছু রোজ তোমরা ইস্কুলে শেখ। এই যেমন ধরো কিছু স্বাস্থ্যবিধি— হাত ধুয়ে খাবার খেতে হয়, নোংরা জলে রোগজীবাণু থাকে— এইরকম। কিংবা ধরো, আমাদের এই এত বড়ো দেশ আর তার অধিবাসীদের কথা...

আমি বলে যেতে থাকি। বলতে বলতে কথাগুলো নিজের কানেই কেমন অদ্ভুত শোনায়। দুটো ভাষায় তর্জমা হয়ে সেটা কী দাঁড়াবে ভাবতে গিয়ে আরও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ি। আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে জঙ্গলের ভেতর সেই শুনশান ইস্কুলবাড়িটা। সামনে উৎসুক মুখে বসে আছে যে ছেলেমেয়েরা, সামনের বছর এইসময় এদের মধ্যে অনেকেই আর ইস্কুলে আসবে না। মাঠ জঙ্গল থেকে শালপাতা কাঠকুটো কিংবা ছাগল নিয়ে ফিরবে। কিংবা বাবামায়ের সঙ্গে চলে যাবে দূরে, নদীর ধারে ধানের দেশে। আজকের এই দিনটা ওদের স্মৃতিতে অলীক হয়ে থাকে, সাদা কাগজে রং পেন্সিল দিয়ে আঁক কাটা ছবির মতো।

সেই ছবিতে যে জগতটা ফুটে ওঠে তা আমাদের জানাশোনা বাস্তবের থেকে যোজন দূরের। সেখানে পরপর ত্রিভুজাকার পাহাড়ের পেছনে যে সূর্য ওঠে, তার গায়ে রশ্মিগুলো জবাফুলের গর্ভকেশরের মতো ; সাদা কাগজের ওপর আড়াআড়িভাবে বেঁকে চলে যাওয়া পথটা দূরে গিয়ে নদী হয়ে যায় ; উড়ন্ত পাখির ডানা থেকে ঝরে বৃষ্টির ফোঁটা। আরেকটা ছবিতে শহরে দেশলাইবাক্সের মতো অসংখ্য বাড়ির প্রতিটি ছাতে ডিশ অ্যান্টেনা, তার ওপর বসে আছে ময়ূর ; রাস্তা দিয়ে সারি দিয়ে ট্যাঙ্ক চলেছে, তার ওপর বসে সহাস্য পরিবার— বাবা মা ছেলেমেয়ে। অনেকগুলো ছবিতেই দেখা যায় রেখামানুষ— মাথা আর পেটের দুটি বৃত্ত, দুপাশে হাত ও পায়ের সরলরেখা।

সাদা জমির ওপর বিচিত্র রিক্ততায় ফুটে আছে অনেক মানুষ, একই পরিবারভুক্ত— মাথা পেট হাত পা। একটি পেটের দুই পাশে দুটি হাত, নীচে দুটি পা। পা দুটো নিয়ে যায় দূরে, হাত দুটো কাজ করে। সেই হাতের শ্রম থেকে আসে যে খাবার, তাতে পেটের খিদে মেটে। পেটের খিদে মেটার পর বাড়তি যা কিছু খাবার থাকে, তাতে আরেকটি পেট ভরে। আবার দুটি হাত শ্রমের জন্য তৈরি হয়ে ওঠে, দুটি পা তাকে নিয়ে যায় দূরে। এক আবহমান কালের রেখাচিত্র, ফুটে উঠেছে সাদা কাগজের ওপর। কোনো প্রেক্ষাপট আঁকা নেই।

আর কীই বা হতে পারে? যেখানে জীবনের সরল সমীকরণ হল, একটি প্রাণ = একটি পেট + দুটি হাত, সেখানে বন থেকে ফল কাঠ শালপাতা নিয়ে ফেরা একটি ছেলে বা মেয়ে ইস্কুল-ফিরতি ছেলে বা মেয়েটির থেকে অনেক বেশি বাস্তব। যেখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবন অপরিবর্তনীয় ছন্দে গড়িয়ে চলে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তে, খিদে থেকে অনাহারে, সেখানে শিক্ষা এক অলীক কুয়াশাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ। সেখানে একটি ছেলে বা মেয়ে প্রকৃতপ্রস্তাবে ইস্কুল থেকে যা নিয়ে ঘরে ফেরে তা হল পেটের মধ্যে টিকিন মান্ডিজম। বাড়িতে বেঁচে যাওয়া একথালা খাবারে আরেকজনের একবেলা পেট ভরে।

জানেন, এখানে অনেক পরিবার একটি ছেলেকে ইস্কুলে পাঠায়, আরেকটিকে পাঠায় জঙ্গলে। মেয়ে হলে ঘরের কাজ। যমুনা বলল আমায়।

বছর পঁচিশের যমুনা সামাদ বিএ পাস, এই অঞ্চলেরই মেয়ে। সকাল থেকে ব্যস্তভাবে শাড়ি গাছকোমর করে বেঁধে ছুটোছুটি করছে। বিভিন্ন স্কুলের ছোটো ছেলেমেয়েদের দেখভাল করা, তাদের ঝগড়াঝাঁটি নিষ্পত্তি করা, ছবি আঁকার সরঞ্জাম বিলোনো, দুপুরে এতজনের পাত পড়বে তার তদারকি— অনেক কাজ। ওর সদ্য হাঁটতে-শেখা বছরখানেকের ছেলেটা মায়ের পিছু পিছু ঘুরছে, দুদণ্ড এসে বসলে কোলের ওপর ঝাঁপাচ্ছে।

বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিক্ষায় অধিকার আইনের কথা যখন বোঝাও, তখন কী বলে ওরা? আমি জানতে চাই।

ছটফটে ছেলের হাতে কাগজ পেন্সিল ধরিয়ে দিয়ে খুদে ছবি-আঁকিয়েদের পাশে বসিয়ে দেয় যমুনা।

ওরা বলে, একটা কি দুটোকে নিয়ে যাও, কিন্তু সবকটা ছেলেমেয়েকে কিছুতেই ইস্কুলে পাঠাব না। যেন ইস্কুল নয়, কয়েদখানায় পাঠাতে বলছি। এরপর আর কী বলা যায় বলুন তো?

যমুনা সখেদে জিজ্ঞেস করে।

আমি আর কীই বা বলব? ইস্কুল বাড়িটাকে দেখি। সর্বশিক্ষা অভিযানের টাকায় সম্প্রতি গোলাপি রং হয়েছে, গাছপালার ফাঁকে অনেকদূর দেখা যায়। এই কংক্রিটের স্থাপত্যশৈলী এখানকার মাটির তৈরি খড় খাপরার চালের বাড়িগুলোর থেকে একেবারেই আলাদা। বরং মিল রয়েছে থানা আর পঞ্চায়েত অফিসের সঙ্গে। প্রতিটি স্কুলবাড়ি গোলাপি রঙের, সামনের দেয়ালে একটি করে ঘড়ি আঁকা, প্রতিটি ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় দশটা তিরিশ মিনিট, স্কুল শুরুর সময়। তার পাশে আঁকা একটি করে উচ্চতামাপক স্কেল। এখানে ছেলেমেয়েদের অপুষ্টি আর জিনগত কারণে গড় উচ্চতা শহরে সচ্ছল ঘরের সমবয়সিদের তুলনায় কম; তবুও প্রতিটি স্কেল ছফুট উঁচু। পাশে লেখা স্কুল শিক্ষা দপ্তরের হেল্পলাইন আর ই-মেল ঠিকানা। এই জঙ্গল এলাকায় অবশ্য কোথাও কম্পিউটার নেই। বিদ্যুৎও আসেনি। মোবাইলের সিগনালও না থাকার মতোই। তবে স্কুলে সরকারি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য পোশাকবিধি চালু হয়েছে— শিক্ষকদের আকাশি শার্ট নীল প্যান্ট আর শিক্ষিকাদের গোলাপি শাড়ি।

শিক্ষাসঙ্কানের এই অনুষ্ঠানে অবশ্য তাদের কাউকে দেখা যায় না। সে ব্যাপারে জানতে চাই আমি।

যমুনা উত্তর দেবার আগেই ওর ছেলে সদ্য-আঁকা ছবি মাকে দেখাতে ছুটে আসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক ছবি নয়, কাগজের ওপর পেনসিলের শিস ফুটিয়ে তোলা অসংখ্য ফুটো। কী করে ছবি আঁকতে হয় সেটা যমুনা ছেলেকে বোঝাতে চেষ্টা করে, দাদা-দিদিদের দিকে দেখায়, কাগজটা ওর হাত থেকে নিতে যায়। কিন্তু পুত্র নাছোড়, গর্বিত শিল্পী, ঠোঁট ফুলিয়ে ওর নিজস্ব বুলিতে প্রতিবাদ করে। কাগজটা দুহাতে মাথার ওপর তুলে ধরে ওপর দিকে তাকায়, গোল হয়ে ঘুরতে থাকে, আপন মনে হাসে।

সেই দেখে ছোটো একটি মেয়ে কী যেন বলে উঠতে ফের একচোট হেসে ওঠে সকলে। জানা যায়, একমাত্র ওই মেয়েটিই বুঝেছে যমুনার ছেলের শিল্পকর্ম। কাগজের ওপর রাতের আকাশ তৈরি করেছে সে, ছিদ্রগুলো হল তারা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোলামকুচির রান্নাবাটি

গ্রাম বললে মনের চোখে যে ছবিটা ভেসে ওঠে, শিমলিপালের জঙ্গলে কোল্‌হোদের গ্রামগুলো ঠিক তেমন নয়। গাছপালার মাঝে দু-তিনটি করে ঘর, সাধারণত একই পরিবারের, বনের মধ্যে অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়ানো। সমতলের অন্যান্য আদিবাসীদের মতো আঁটসাঁট চালে-চালে বসতি প্রায় নেই। এই কারণে বাচ্চাগুলোকে ঝেঁটিয়ে ইস্কুলে নিয়ে আসার বাড়তি কিছু সমস্যা আছে, ভৃগু বলেছিল আমায়।

এভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকায় বনের নির্জনতা ছেয়ে থাকে সর্বত্র। শীতের দুপুরে গাছের পাতায় ঝিকমিক করে উজ্জ্বল রোদ, পাখি ডাকে। মাঠের একপাশে তিনটি ঘর, দূরে সবুজ শুখুয়াপাত্তা পাহাড়ের ধোঁয়াটে রেখা। বিরসার বাড়িতে মোটরসাইকেল রেখে হাঁটতে থাকি আমরা। ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে নেমে গিয়েছে ঢালু পথ। কিছুদূর যাবার পর উঁচু উঁচু গাছের ছায়ায় ছোট্ট একটু চত্বর দেখা যায়, তার ধারে একটি মাটির কুঁড়ে। দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা লাল সাইকেল। ভেতরে রেডিয়ো কিংবা মোবাইলে ওড়িয়া ফিল্মি গান বাজছে।

বিরসা ডাকে— তুরাম! তুরাম!

ভেতর থেকে এক তরুণ বেরিয়ে আসে। তার পরনে শস্তা জিন্স, লাল নাইলনের টি-শার্ট, হাতে স্টিলের বালা। তুরাম সরটে ইন্টারমিডিয়েট কলেজে বারো ক্লাস পড়ছে।

আমরা আরও কিছুটা ভেতরে একটি প্রাচীন তেঁতুল গাছের নীচে যাই। সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন কয়েকজন গ্রামবাসী। এবড়োখেবড়ো পথ দিয়ে লাল সাইকেলটি হাঁটিয়ে নিয়ে চলে তুরাম।

তেঁতুল গাছের নীচে উপস্থিত আট দশজন প্রায় সকলেই বৃদ্ধ পুরুষ। দিনের এই সময় বসতির সমর্থ নারীপুরুষেরা মাঠে নয়তো জঙ্গলে রয়েছে। খানিক দূরে কুঁড়ের দাওয়ায় বসে শালপাতার থালা বানাচ্ছে এক নারী। ধুলোর স্তূপে খেলা করে দুতিনটি অর্ধনগ্ন শিশু। বাইরের লোক দেখে খেলা থামিয়ে এসে দাঁড়ায়— নাকে সর্দি, মুখে আঙুল পোরা। একটি দড়ির চৌপাইয়ে কোমর পর্যন্ত গোঁজা সম্পূর্ণ নগ্ন এক বালক, মাথাটা দেহের তুলনায় বেঢপ, চোখ দুটো অস্বাভাবিক কোণে বাঁকানো।

ছেলেটি জন্মের পর থেকেই নাকি এমন, সম্ভবত সেরিব্রাল পলসিতে আক্রান্ত। হাঁটতে, এমনকি দাঁড়াতেও পারে না। সারাদিন ওকে ওইভাবে খাটিয়ায় গুঁজে রাখা হয়। ওর পায়ের কাছে মাছি ভনভন করে।

আমরা এসে খাটিয়ায় বসার পর কথা শুরু হবার জন্য উসখুস করতে থাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকলে। ভৃগু বিরসারা তর্জমা করার জন্য উন্মুখ। কিন্তু কীভাবে শুরু করব ভেবে পাইনা, খুব ক্লান্ত আর দিশাহারা লাগতে থাকে। খাটিয়ার সামনে মাটিতে বৃদ্ধেরা বসে থাকেন উবু হয়ে, নিষ্প্রাণ পিচুটি-পড়া চোখ দিয়ে জরিপ করেন আমাদের। সামান্য দূরে সাইকেলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তুরাম সিং। জড়বুদ্ধি ছেলেটাও মাথাটা অদ্ভুতভাবে বাঁকিয়ে চেয়ে থাকে, ঠোঁটে বিকৃত হাসি, লালা ঝরে। শিশুর দল উৎসাহ হারিয়ে খেলায় ফিরে যায়।

হঠাৎ মনে পড়ে যায়, উনিশ শতকের কোম্পানি পেইন্টারদের আঁকা এমন ছবি দেখেছি অনেক। এমনই ঝাঁকড়া তেঁতুল কিংবা বটগাছের নীচে খাটিয়ায় বসে সাহেব অফিসার, মাথায় সোলা টুপি, সামনে মাটিতে জড়সড় একদল দেহাতি নেটিভ। সাহেবের পেছনে পাগড়ি-আঁটা আর্দালি, তর্জমাকার মুন্সী, কিছুটা দূরে বাঁধা ঘোড়া। আমাদের ঘোড়া, থুড়ি মোটরসাইকেল, অবশ্য বিরসার বাড়িতে ছেড়ে এসেছি। তাছাড়া আমলা অফিসার মন্ত্রীসান্ত্রীর মতো কোনো সরকারি প্রসাদ বিলোতেও আসিনি আমরা। জমির পাট্টা, বিপিএল কার্ড... কিছুই না। এমন একটা বিষয়ে কথা বলতে এসেছি, যার কোনো প্রাসঙ্গিকতা এখানে জড়ো-হওয়া মানুষগুলোর জীবনে আছে বলে কল্পনা করাই কঠিন।

প্রবীণ পুরমি সিং-এর খালি গা, মাথায় গামছা পাগড়ির মতো করে জড়ানো। উনি স্থানীয় বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সভাপতি, পরের জন্য লতাপাতা কাটতে বেরিয়েছিলেন, আমাদের আসার খবর পেয়ে চলে এসেছেন। কাস্তেটা হাতেই রয়ে গিয়েছে।

পুরমির এক ছেলে ম্যাট্রিক পাশ। ভদ্রকে কাজ করে, সেখানেই থাকে। গ্রামের পথ বিশেষ মাড়ায় না। আর দুই ছেলে স্কুলের পড়া শেষ করেনি। তারা বাড়িতে থেকে মাঠে কাজ করে। বছরে কয়েক মাস কাজ থাকে না, সেইসময় পাথর ভাঙতে যায় শুখুয়াপাত্তা পাহাড়ের খাদানে।

নয় নয় করেও গ্রামে তো একটা প্রাইমারি স্কুল আছে। হাইস্কুলটা অবশ্য দূরে। লেখাপড়া শিখে কী হয়? কিছু কি হয়? আমি জানতে চাই।

সেই প্রশ্ন, যা আমরা তাড়া করে ফিরছি গত কদিন ধরে। কিংবা আমাদের তাড়া করে ফিরছে। বিরসার মুখে তর্জমা শুনে চেয়ে থাকেন পুরমি। নীরবে হেসে পায়ের সামনে থেকে ঘাস ছেঁড়েন, এদিক ওদিক তাকান। তেঁতুলপাতার আলোছায়ায় কুব কুব করে কুবো ডাকে, খাটিয়াবন্দি ছেলেটা চেয়েই থাকে।

উত্তরটা সহজ নয়; শিক্ষা ওঁর এক ছেলেকে কেড়ে নিয়েছে।

লেখাপড়া শিখলে মানুষের ভয়ডর কাটে, পুরমি নিরুত্তেজ গলায় বলেন। অচেনা বাইরের লোক দেখলে পালিয়ে যায় না, এগিয়ে গিয়ে কথা বলতে পারে।

শিক্ষার মূল্য সম্পর্কে এমন অদ্ভুত কথা আগে কখনো শুনিনি। এই কথার ভেতরের অর্থ ধীরে ধীরে উন্মোচিত হবে আমার কাছে, প্রতিটি দিন, যখন বাফার এরিয়া ছেড়ে ক্রমশ জঙ্গলের ভেতরদিকে ছোটো ছোটো বসতিগুলোয় যাব। জনপদ যত প্রত্যন্ত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিচ্ছিন্ন, মানুষগুলোও ততই মুখচোরা আর জড়সড়। মোটরসাইকেলে আগন্তুক দেখে তারা গুটিয়ে যায়, প্রদীপের ওড়িয়া ভাষার প্রশ্নে ঠোঁট বুজে আসে ঝিনুকের মতো, বোবা কুণ্ঠিত চোখ মেলে চেয়ে থাকে, কিংবা নামিয়ে নেয় পায়ের কাছে।

*

প্রাচীন শাল পিয়াল মহুয়া শিরীষ ও বেশিরভাগ নাম-না-জানা গাছের ছায়ায় ছায়ায় পথ গিয়েছে বনের ভেতর। কখনো উঁচুনীচু ঘাটি পার হতে হয়। দূরে দেখা যায় পাহাড়শ্রেণি, মাঝে মাঝে অতিকায় বাসাল্ট আর গ্রানাইটের মনোলিথ দাঁড়িয়ে থাকে আদিম দেবতার মতো। কোথাও পাথরের খাঁজে টলটল করছে জল, লাল শালুক ফুটে আছে। দূরে দূরে ছড়ানো আট-দশ ঘরের একেকটি গ্রাম। ছোটো ছোটো খেতগুলো নীচু জমিতে, নালার ধারে। এই নালাগুলো গিয়ে মিশেছে সুনেই নদীতে, সুনেই বৈতরণীতে।

ফসলের মরশুম। মাঠে রয়েছে বেশিরভাগ পরিবার। পাকা ধান কাটা আর ঝাড়াই মাড়াই হচ্ছে। ব্যস্ততার ছবি। খড় পেঁচিয়ে তৈরি অতিকায় অজগর সাপের মতো দড়ি পড়ে আছে পথের ধারে। এই দড়ি পেঁচিয়ে লক্ষ্মীর ঝাঁপির আকারের ধানের গোলা তৈরি হয়ে উঠবে। কিন্তু এত নিবিড় মমতার সৃজনে তৈরি ফসলে পেট ভরবে বড়োজোর মাস চারেক। তারপর বেরিয়ে পড়তে হবে কাজের সন্ধানে।

সেজন্য অবশ্য মালিন্যের ছায়া নেই কোথাও। বনের ধারে হাট বসেছে। তার প্রায় এক কিলোমিটার আগে থেকে কয়েক পা অন্তর বসে গিয়েছে হাঁড়িয়ার ঠেক। গাছতলায় বড়ো বড়ো অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি সাজিয়ে বসেছে স্থানীয় মেয়েরা। বিড়িবড়া আর ঘুগনির অস্থায়ী দোকান দিয়েছে কেউ কেউ। আমরা এক জায়গায় থেমে সবুজ শালপাতার রেকাবে মুড়ি পাতলা ঘুগনি দিয়ে মেখে খাই। মাটিতে গোল হয়ে বসে কলাইয়ের বাটিতে হাঁড়িয়া পান করছিল একটি দল। আমাদের দেখে একটু যেন সচকিত হয়ে যায়।

বিভিন্ন বয়সের পুরুষ। অনেকেরই হাতে কিছু না কিছু সওদা ; হাট থেকে ফিরছে। কারোর কারোর নেশাতুর চাহনি, গলার স্বর জড়িয়ে এসেছে।

হাঁড়িয়া মহুয়া সবই চলেছে এক সাথে, ভৃগু বলে। হাটে কেনাকাটার পর যা দু-পাঁচ টাকা পকেটে থাকে সব এতেই চলে যায়। দেখছেন না, দু-পা অন্তর কেমন ঠেক বসেছে। সব ঠেকেই কেউ না কেউ চেনা মানুষ বেরিয়ে পড়ে। তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বসে গিয়ে এক পাত্র খেতে হয়। এই করতে করতে কেউ কেউ বাড়ি পর্যন্ত আর পৌঁছতে পারে না, রাস্তার ধারে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে।

এই যত হাঁড়িয়া দেখছেন সবই কিন্তু বিপিএলের এক টাকা কিলোর চালে, বিরসা জানায়। চাল যাদের প্রাপ্য তাদের কাছে ঠিকমতো পৌঁছয় না, এদিকে হাড়িয়া বেচে এখানে অনেকে বড়োলোক হয়ে গেছে।

আমাদের থেকে কিছুটা তফাতে বসেছিল এক যুবক, কোলে একটি বনমোরগ। ওর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথায় লাল ফেট্টি বাঁধা আর ত্রস্ত হরিণের মতো দুটি অপূর্ব চোখ। সেই চোখ মেলে আড়ে আড়ে নিরীক্ষণ করছিল আমাদের। চোখে চোখ পড়লেই মুখটা ঘুরিয়ে নিচ্ছিল। মোরগটা ঘাড় বেঁকিয়ে চারদিক জরিপ করছিল ছুরির মতো চোখে, পাতার ফাঁক দিয়ে আসা রোদ ঝিলিক দিচ্ছিল পিঠের পালকে।

মোরগটা কোথায় পেলি রে? প্রদীপ ওকে জিজ্ঞেস করেন ওড়িয়ায়।

যুবক সলজ্জ হেসে মুখ লুকোয়। পাশ থেকে একজন জানায়, ফাঁদ পেতে ধরেছে। খেতে পড়ে থাকা শস্যদানা খেতে এসেছিল মোরগটা আজ ভোরবেলায়। এখন হাটে নিয়ে চলেছে বিক্রি করবে বলে।

ওর নাম তুরি বর্জা, থাকে এই অঞ্চলে সবচেয়ে প্রত্যন্ত গ্রাম পুঙ্গিচুয়ায়। বনের অনেকটা ভেতরে ওইরকম বেশ কয়েকটি বসতি রয়েছে। তবে একটি পাহাড়ি নালার কারণে পুঙ্গিচুয়া গ্রামটা বর্ষার সময় প্রায় চার মাস সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অতি সম্প্রতি একটি প্রাইমারি স্কুল হয়েছে পুঙ্গিচুয়ায়।

তুই পুঙ্গিচুয়ায় থাকিস? ভৃগু বলে। আমরা কাল যাব তোদের গ্রামে।

এই কথা শুনে তুরি চোখভর্তি বিস্ময় আর কৌতূহল নিয়ে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর ফিক করে হেসে ওঠে। ওর মুখটা হাসিতে ঝলমল করে বনমোরগের পিঠের মতো।

জানো অপু, তুরি বর্জাকে দেখে আমার মনে পড়ে গিয়েছিল সেই সাঁওতাল যুবকের কথা, মামজোয়ানের ইস্কুলে যাবার পথে একদিন যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তোমার। তার গলায় ছিল হিংলাজের মালা, পিঠে তিরধনুক। একটা পাখি শিকার করেছিল সে। তুরিও মোরগ শিকার করেছিল, তবে ফাঁদ পেতে। ওর কপালে লাল কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা ছিল।

অরণ্যের মাঝে এই এক দেশ, জানো, যেখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম জন্মায়, বড়ো হয়, বুড়ো হয়। তারা কখনো ইস্কুলে যায় না। বয়ঃপ্রাপ্তির পর কেউ কেউ বাইরে যায় জ্বালানি কাঠ পাতা কিংবা শ্রম বিকোতে। সেখানে ওড়িয়াভাষী মানুষের সংস্পর্শে আসে, দালাল মহাজন আড়তদার কন্ট্রাক্টরের খপ্পরে আসে। তারপর গ্রামে ফেরে বাইরের পৃথিবীর ধূর্তামি আর শঠতার গল্প নিয়ে। এই গল্পগুলো শিকলের মতো মানুষগুলোকে বেঁধে রাখে।

একটি স্কুল, আট-দশ বছরের বুনিয়াদি শিক্ষা, হয়তো এই শিকলটা ভাঙতে পারে। যে বয়সে অন্য একটি ভাষা চটপট শিখে নেওয়ার জন্য তৈরি থাকে মস্তিষ্কের গড়ন, তখন রাজ্যের প্রধান ভাষা সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় হয়তো বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে, সেখানকার মানুষদের সঙ্গে লেনদেন করার জন্য জরুরি আত্মবিশ্বাস জোগাতে পারে। এমনকি হয়তো এভাবে একটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সমাজের মূলধারায় মিশে যেতেও পারে।

কী ভাবছেন? প্রদীপ জিজ্ঞেস করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী ভাবছি ? মাথার ভেতর কিছু ধোঁয়াটে ভাবনা পাক খাচ্ছে। শিক্ষা হল বহির্বিশ্বের দরজার চাবি— এই কথাটা কতকাল ধরে শুনে এসেছি, কিন্তু কখনো এত তীক্ষ্ণভাবে এক আদিবাসী যুবকের মুখে খোদাই করা দেখিনি।

*

আকাশে শীত বিকেলের মরে-আসা আলো, ছাতারে পাখির কিচিরমিচির, দূর থেকে ভেসে আসছে ছাগলের ডাক। কিন্তু হুড়িসাহী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আধখেঁচড়া ঘরদুটোয় ঘন ছায়া জমেছে। ফ্রেমবিহীন জানলার গোবরাটে সাজিয়ে রাখা খোলামকুচি, বোধহয় রান্নাবাটি খেলার জন্য। সিলিঙে ঝুলে-পড়া ঢালাইয়ের তক্তাগুলো বাদুড় বলে ভ্রম হয়। এই বাড়ি তৈরির কাজে এসে একজন ঠিকা শ্রমিক মারা গিয়েছে। সেই ঘটনাটা এক অশুভ ছায়ার মতো ঘিরে আছে জঙ্গলের মাঝে এই ইস্কুলবাড়িটাকে। পাশ দিয়ে উঠে গিয়েছে পথ। গ্রামটা অনুচ্চ টিলার ঢালে।

ধূসর ব্যাসাল্টের একটি শিলাস্তর শিরার মতো শিমলিপাল অরণ্যের বুক বেড় দিয়ে চলে গিয়েছে, ভদ্রক থেকে পঞ্চলিঙ্গেশ্বর পর্যন্ত তার বিস্তার। নুড়ি পাথর বিছানো পথ দিয়ে গ্রামে এসে পৌঁছতে সূর্যটা দূর পাহাড়ের পিছনে ডুবে গেল। বসতির সীমানায় গাছপালার নীচে কতকগুলো লম্বাটে পাথর দাঁড় করানো আছে। ওগুলো কী আমি জানি ; একটা চাপা অস্বস্তি ছায়ার ভেতর কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠে।

দিনের বেলায় গ্রামে এলে লোকজনের দেখা পাওয়া যায় না, তাই ইচ্ছে করেই এই সময়টা বেছে নিয়েছি আমরা। পাতলা ঝোপঝাড়ে ঢাকা পাথরের ঢালে গোটা কুড়ি মাটি-খাপরার ঘর নিয়ে হুড়িশাহী গ্রামটা বলা যেতে পারে প্রত্যন্তেরও উপান্ত। বেশিরভাগই কোল্‌হো আর দু-চার ঘর মহাকুড় সম্প্রদায়ের বাস। তারাও পশ্চাৎপদ জাতি হিসেবে নথিভুক্ত। সকলেই বিপিএল, তবে কার্ড নেই প্রায় কারোরই। বসতির আশেপাশে যেটুকু যা জমি আছে সবই আচোট পাথুরে। সকলেই অন্যত্র জন খাটে। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে পাকা রাস্তার সংযোগ নেই, তিন কিলোমিটার পায়ে-চলা কাঁকরে পথ হেঁটে আসতে হয়। টাইফয়েড কিংবা ডায়েরিয়ায় চিকিৎসার সুযোগ আসে না। সম্প্রতি ময়ূরভঞ্জ জেলায় আসন্নপ্রসবাদের জন্য অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু হয়েছে, নাম জননী এক্সপ্রেস। গত কয়েকদিনে রাস্তায় চোখেও পড়েছে সেই গাড়ি। কিন্তু হুড়িশাহীতে জননী এক্সপ্রেস আসবেই বা কীভাবে ?

গ্রামে শিশুমৃত্যুর হার কেমন ? সংবেদনসূচক নীচু গলায় জানতে চাই আমি।

প্রশ্নটা হো ভাষায় অনুবাদ করে দেবার আগেই এক যুবক হাতের পাঞ্জা দাড়িপাল্লার মতো দুলিয়ে জবাব দেয়—

ফিফটি-ফিফটি !

যুবকের নাম গুসে বানারা। দিল্লিতে কমনওয়েলথ গেমস ভিলেজ তৈরির সময় জন খেটেছে সে, হিন্দি জানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিফটি-ফিফটি ? ভারতে মোটামুটি অনগ্রসর জেলাগুলোয় শিশুমৃত্যুর গড় হার প্রতি হাজারে সত্তরের আশেপাশে। কিন্তু ফিফটি-ফিফটি মানে হল এক হাজার শিশুর জন্ম হলে পাঁচশোটি মারা যায় ! ছবিটা অতিরঞ্জিত করছে কি গুসে ? অহেতুক অদৃষ্টবাদী হয়ে পড়ছে ? আমার মনে পড়ে যায় গ্রামের ধারে খাড়া পাথরখণ্ডগুলো। টিকাকরণের হার কত সেটা আর সাহস করে জিজ্ঞেস করি না।

একটা বড়ো পাকুড় গাছের নীচে বড়ো বড়ো পাথরের চাটান— তার ওপরে বসেছে সবাই। অতিথিদের জন্য একটি খাটিয়াও আনা হয়েছে।

হুড়িশাহীর প্রবীণতম মানুষটির নাম সবরম সিং বানারা, প্রায় দৃষ্টিহীন। বয়সের গাছপাথর জানা নেই, তবে এই বসতি পত্তনের শুরু থেকেই এখানে আছেন। এছাড়া আর প্রায় সকলেই তরুণ যুবক। তাদের মধ্যে নবনির্মিত স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যরাও আছে। সকলেই নিরক্ষর। স্কুল পরিচালনায় তাদের ভূমিকা হল বিভিন্ন কাগজে প্রধান শিক্ষকের দেখিয়ে দেওয়া খোপে নীরবে টিপছাপ দেওয়া।

এই জমায়েতেও তারা প্রায় নীরব থাকে, প্রশ্ন করলে হুঁ হাঁ করে এক-দুকথার জবাব সারে। বেশিরভাগ কথাবার্তা চালায় গুসে বানারা। ও ছাড়া এখানে হিন্দি জানে আমিন সিং, বছর কুড়ির ছিপছিপে তরুণ। হায়দরাবাদে একটি ইটভাটায় কাজ করেছে সে, স্থানীয় এক ঠিকাদার নিয়ে গিয়েছিল। একটা পুরো সিজন কাজ করিয়ে নিয়েছে কিন্তু একটা পয়সাও দেয়নি।

লোকটা মাহাতো, সবাই জানে ও ঠগবাজ। এইভাবে অনেকের মজুরি মেরেছে। পাকা রাস্তার ধারে মাহাতোদের গ্রামে থাকে। গুসে বলে।

রাগ হয় না ? সবাই মিলে এককাট্টা হয়ে ধরে ধোলাই দিতে ইচ্ছে হয় না ? আমিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করি।

রাগ করে আর কী করা যাবে ? আমিন মলিন হাসে। লোকটা যে ঠগ সে তো জানাই আছে। তবু লোকে ওর সঙ্গে যায়, দুবেলা খাবার আর দুটো পয়সার আশায় যায়।

এই বয়সেই দুর্ভাগ্যকে হজম করতে, তার সাধারণীকরণ করতে শিখে গিয়েছে আমিন। রাগ এখানে বিলাসিতা, এমন কি তরুণ বয়সেও। এখানে বয়ঃপ্রাপ্তির আগেই মানুষ জীবনের দুস্তর বিপত্তির সঙ্গে ঘর করার কৌশলগুলো রপ্ত করে ফেলে। শিমলিপালের জঙ্গলে প্রায় প্রতিটি গ্রামে গুসে আর আমিনের মতো যুবকের দেখা পেলাম। সুদূর মহানগরে উন্নয়নের নিশিডাক তাদের গ্রাম থেকে টেনে বের করেছে, তাদের শ্রম শুষে ছিবড়ে করে ফিরিয়ে দিয়েছে। বাইরের দুনিয়ার এক তমসাময় ছবি নিয়ে ফিরেছে তারা। উপরি পাওনা বলতে একটা-দুটো ভাষা, কৃচিৎ সংক্রামক যৌন ব্যাধি, এমনকি এইডসও। তাদের আলো-মরে-যাওয়া তরুণ চোখ, ঠোঁটের দুপাশে তিক্ত ভাঁজ পড়েছে। বেশিরভাগ বসতিতে এরাই প্রথম এগিয়ে এসে কথা বলছে। আগন্তুক হয়ে বাইরের যে দুনিয়াটা থেকে এসেছি, তারই এক ভিন্ন রূপ, বদলে-যেতে-থাকা ভারতবর্ষের ভিন্ন পাঠ শুনেছি এদের মুখে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু গুসে বা আমিনদের ধরে রাখার মতো কিছু নেই হুড়িশাহীর। জমি অনুর্বর, জঙ্গলও মুমূর্ষু। এছাড়া রয়েছে জলাভাব।

গোড়া থেকেই কি এমন ছিল? জানতে চাইলাম সবরম সিং বানারার কাছে।

তা নয়। আগে চারপাশে জঙ্গল অনেক ঘন ছিল, জীবনও ছিল সহজ। বালক বয়সে বাবামায়ের সঙ্গে সিংভূম থেকে এই অঞ্চলে এসেছিলেন সবরম। এখানকার সব কোল্‌হোরাই নাকি বিশ শতকের গোড়ায় সিংভূম থেকে এসেছে, যে কারণে এখানে একটি চলতি পদবি হল সিং। তবে সিংভূম এদের আদি উৎসভূমি নয়।

সিংভূমে আমরা ছিলাম বটে অনেককাল— সবরম সিং বলেন— আসলে কিন্তু আমরা হরপ্পার মানুষ।

এই চমকপ্রদ তথ্য এরপর বিভিন্ন বসতিতে গিয়ে শুনব বেশ কয়েকজনের মুখে। ব্রিটিশরা এদেশে আসার আগে শত শত বছর সিংভূমের অরণ্য ছিল কোল্‌হোদের বাসভূমি, কিন্তু আদতে নাকি তারা সিন্ধুসভ্যতার মানুষ। অনেক হাজার বছর আগে প্রাচীন নদীপাড়ের সভ্যতা শুকিয়ে যাবার পর তারা ছড়িয়ে যায়, চলে আসে এই উপমহাদেশের দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলে।

শিমলিপালের জংলি বসতিতে কয়েকজন প্রবীণ মানুষের স্মৃতির ঝাঁপিতে পাওয়া এ এক বিচিত্র কাহিনি, যার মধ্যে হয়তো থাকতেও পারে ইতিহাসের বীজ। আমি জানিনা, তবে এটুকু জানি যে উনিশ শতকের গোড়ায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছোটনাগপুর অঞ্চলে শাসক ও আদিবাসীদের মাঝে সৃষ্টি করেছিল এক দালাল মহাজন শ্রেণি। আবহমানকাল ধরে চাষবাস শিকার আর জঙ্গলের ফল কন্দ কুড়িয়ে জীবনযাপন করে আসছিল যে মুণ্ডা ওরাওঁ সাঁওতালরা, তারা রাতারাতি পরিণত হল ভূমিদাসে। শুরু হল বিক্ষোভ প্রতিরোধ, যা ১৮৩১-৩২ সালে ফেটে পড়ল কোল বিদ্রোহে। ব্রিটিশ শাসকেরা নির্মম হাতে বিদ্রোহ দমন করেছিল। ক্ষমতার নীচে পদানত হয়ে থাকল তারা কিছুকাল, তারপর শুরু হল এক বিচিত্র নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। দলে দলে অধিবাসীরা চলে যেতে থাকল তাদের বাসভূমি ছেড়ে— চাবাগানে খনি-খাদানে সুদূর আন্দামানে কিংবা বাংলায় ওড়িশায়। ময়ূরভঞ্জের এই কোল্‌হোদের মতো। স্বদেশভূমি থেকে উৎখাত হয়ে, সবকিছু হারিয়ে এতকাল পরেও তারা আঁকড়ে আছে সেই ইতিহাস, যার রেশ কখনো ফুটে ওঠে নামের শেষে সিং পদবীতে, কিংবা বিরসা নামের ভেতর এক বীরের স্মৃতিতে।

সেই ইতিহাসে কখনো পাওয়া যায় লোককাহিনির আভাস। ব্রিটিশদের সঙ্গে দুর্ধর্ষ লড়াই করে পরাজিত হবার পর এদের পূর্বপুরুষদের জিভ নাকি কেটে নিয়েছিল সাহেবরা। সেই ভয়াবহতার পর সাতটি পরিবার কীভাবে শিমলিপালের এই শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে এসে প্রথম বসতি স্থাপন করে, তার গল্প শোনায়।

থেমে থেমে কথা বলেন সবরম, শুকনো নদীর খাত থেকে জল ছেঁচে তোলার মতো করে। তাঁর একঘেয়ে স্বরে হো ভাষায় বিবরণ কোনো আঁধার অতীতের জঠর থেকে উঠে তর্জমা হয়ে আসে। দিনের আলো প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। মাথার ওপর পাকুড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাছে ঘরে-ফেরা পাখিদের ডানা ঝাপটানোর শব্দ শোনা যায়। এইসময় মানুষের কণ্ঠস্বর কেমন ক্ষীণ হয়ে আসে। সবরমের লালাপিচ্ছিল ঠোঁট নড়ে, প্রায়ান্ধ চোখের মণিতে একটু আলো লেগে থাকে। উপস্থিত সকলে চুপ করে শোনে এই কাহিনি। হয়তো ছেলেবেলা থেকে বহুবার শুনেছে, তবুও।

আমার মনে পড়ে যায় চেনা এক উপন্যাসের শুরু। ভাগ্যের ফেরে স্বভূমি থেকে উৎখাত হয়ে গভীর জঙ্গলের মধ্যে বসতি স্থাপন করতে আসছে কয়েকটি পরিবার, একটি খরস্রোতা নদীর ধারে, যার জল গলানো কাচের মতো স্বচ্ছ আর তার ধারে প্রাগৈতিহাসিক ডিমের মতো মসৃণ পাথরখণ্ড ছড়ানো। পৃথিবী এতই নবীন যে বেশিরভাগ জিনিসের নামকরণ হয়নি তখনও।

*

মসৃণ পিচরাস্তার ওপর দিয়ে দ্রুত বেগে যেতে যেতে আচমকা মোটরবাইক থামায় ধ্রুব। পেছনে বিরসাদের বাইকটা ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে ইঞ্চি দুয়েক তফাতে। বিদ্যুৎগতিতে রাস্তা পার হচ্ছে একটি মুরগি, তার পিছু পিছু ছটি ছানা, এক সারিতে। হয়তো কয়েক ঘণ্টা আগে ডিম ফুটে বেরিয়েছে, এরই মধ্যে মুরগির দেখাদেখি গলা সামনে বাড়িয়ে মাছের মতো পুচ্ছ দুলিয়ে ক্ষিপ্র ছুট দেবার কায়দা রপ্ত করে ফেলেছে। কিংবা হয়তো এটা জিনগত।

রাস্তার পাশে গ্রাম, তিনদিকে বন। কালভার্টের ধারে বনবিভাগের বোর্ড জানাচ্ছে জায়গাটা হাতি চলাচলের পথ। সূর্য ডুবে গিয়েছে অনেকক্ষণ কিন্তু এখনও আকাশ থেকে চুঁইয়ে নামছে নীলচে গোলাপি আলো। এইসময় বনের হাতি বের হয়, বিশেষত এখন এই ফসল পাকার মরশুমে। জোড়া ইঞ্জিন চতুর্থ গিয়ারে পড়ে গোঁ গোঁ শব্দ করে, জঙ্গলে প্রতিধ্বনি হয়।

সারিসুয়া গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে একটি মজাদার মুরাল দেখলাম। ক্লাসঘরের দেয়ালে নানান জীবজন্তু ফুল পাখি আঁকা, আর ব্ল্যাকবোর্ডের চারপাশে এক বিশালাকার হাতি। শিল্পীর কল্পনাকে তারিফ না করে উপায় নেই— ঠিক যেন হাতির পেটে ব্ল্যাকবোর্ড। প্রেতসম হাতির দল চলেছে রাস্তা কালভার্ট সাইনবোর্ড ইস্কুলবাড়ি ফুঁড়ে।

কিছুদূর গিয়ে রাস্তা দুভাগ হয়েছে, জঙ্গলের ঘন ছায়ায় ঢুকে গিয়েছে লাল মোরামের রেখা। ডাঁই করা বালি, হলুদ মাটি কাটার গাড়ি— রাস্তা তৈরি হচ্ছে। একপাল নগ্নপ্রায় শিশু বালির ওপর গড়াগড়ি দিয়ে খেলা করছে, কয়েকজন মাটি কাটার গাড়িটার ওপর উঠেছে। বেশ কিছুটা দূরে গ্রাম, প্রাপ্তবয়স্ক কেউ ত্রিসীমানায় নেই। খুবই ছোটো ছোটো শিশু— কেউ কেউ সদ্য হাঁটতে শিখেছে, ঠোঁট দিয়ে লালা ঝরছে। সুকুমারত্ব অদৃশ্য দড়ির মতো ওদের একত্রে বেঁধে রেখেছে এখানে। যেন জঙ্গলের ছায়া জমিয়ে তৈরি একদল প্রেতশিশু।

জানো অপু, এখানে বালক পুত্রের পিছু পিছু কোনো মাকে দুধমাখা ভাতের থালা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতে দেখলাম না, কিংবা ইস্কুল যাবার সময়ে চুল আঁচড়ে দিতে। গত বর্ষায় ডাগর মেয়ে ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়েছে এমন মাকে দেখলাম, কিন্তু সেই শোক মা কীভাবে বয়ে বেড়াচ্ছে মুখ দেখে তার কোনো আন্দাজ পেলাম না। জঙ্গলের ভেতর এমন অনেক বসতি দেখলাম, যেখানে কেবল শিশুরা রয়েছে। বাবা-মা কাজ থেকে ফেরেনি, কিংবা চলে গিয়েছে দূরে নদী আর ধানের দেশে।

অনেক সময় ছোটো বাচ্চারা ধুম জ্বর নিয়ে ইস্কুলে চলে আসে, বিরসা বলেছিল। বাড়ি যে পাঠানো হবে, খোঁজ নিয়ে হয়তো দেখা যায় বাড়িতে বড়ো কেউ নেই। কেউ নেই, কী আর করবে, ইস্কুলে চলে এসেছে।

হেডলাইটের সামনে আলোর রশ্মিতে ফিনফিনে কুয়াশা এসে পড়ে। সেদিকে চোখ রেখে ধ্রুব গল্প করে। এর আগে এখানে অন্য একটি প্রোজেক্টে কাজ করেছে সে। তিনটি পঞ্চায়েত এলাকার সব স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ডেটাবেস তৈরির কাজ— প্রায় দেড় হাজার ছেলেমেয়ের ছবি তোলা, নাম ধাম ইত্যাদি নথিভুক্ত করা, বিশাল কর্মযজ্ঞ। সেটা করতে গিয়ে নানান বিচিত্র অভিজ্ঞতা জমেছে ওর ঝুলিতে।

অনেক বাচ্চার ইস্কুলের খাতায় যে নাম লেখা রয়েছে, দেখা গেল সে নিজেই জানে না সেই নামটা?

এমন হয় নাকি?

অদ্ভুত লাগছে তো? এটা খুবই হয়। মনে করুন ক্লাস থ্রির খাতায় আসমান কিস্কুর নাম রয়েছে, কিন্তু সাতদিন হন্যে হয়ে খুঁজেও ওই নামের কাউকে পেলাম না— না ইস্কুলে না গ্রামে। তারপর হয়তো আট দিনের মাথায় একজনকে পাওয়া গেল, তার নাম বাগুন কিস্কু। কিন্তু ইস্কুলের খাতায় আবার তার নামই নেই। আসমান কিস্কু আর বাগুন কিস্কু যে একই বালক, এটা আবিষ্কার করতে কালঘাম ছুটে যাবে। ব্যাপারটা আর কিছুই না। ছেলেটা ছোটোবেলা কাটিয়েছে মামার বাড়িতে। সেখানে সবাই ওকে ডাকে বাগুন বলে। একটু বড়ো হবার পর বাবা নিজের কাছে নিয়ে এসে ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে। ভর্তির সময় খুব কায়দা করে নাম দিয়েছে আসমান, তারপর নিজেই ভুলে গিয়েছে। হা! হা! হা! হা!

তারপর ধরুন দেখা গেল একই ছেলে দুটো আলাদা নামে এসে ছবি তোলার জন্য দাঁড়াচ্ছে। খোঁজ নিতে জানা গেল দ্বিতীয় নামটি ওর দাদার, ইস্কুলে আসা বন্ধ করে দিয়েছে অনেক কাল। কিন্তু দাদার নাম ডাকা হচ্ছে শুনে ছোটো ভাই সরল মনে এসে দাদার হয়ে প্রক্সি দিচ্ছে।

হা! হা! হা! হা!

হাস্যধ্বনি লোফালুফি করতে করতে অন্ধকার জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে ছুটে চলে দুটি মোটরবাইক।

বিরসা পাশ থেকে এসে যোগ দেয়— কখনো কখনো এমনও হয়, বাড়ির লোকেরা ইস্কুলে এসে ছেলেমেয়ের পদবী বদলে দিতে বলে। মনে করুন কোনো ছেলের পদবী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টিউ। একদিন ছেলের বাবা এসে বলল, মাস্টার ওই পদবীটা ভালো লাগছে না। ওটা কেটে সিং করে দাও। আমরা এখন থেকে সিং হয়েছি।

হা! হা! হা! হা!

সেই হাসি, যা মনের ভার লাঘব করে না। ভারি পাথরে মতো চেপে বসে।

হোয়াটস ইন আ নেম? যেখানে চালের কার্ড কেরোসিনের কার্ড বিপিএল কার্ড চাঁদের আলোর মতো অধরা, সেখানে সত্যিই নামে কীই বা আসে যায়?

এখানে ইস্কুলে গিয়ে কোনো পড়ুয়াকে জন্মতারিখ জিজ্ঞেস করুন, বলতে পারবে না। ওদের বাবা-মাই বলতে পারবে না। স্কুলে ভর্তির সময় যা খুশি একটা সনতারিখ বসিয়ে দেওয়া হয়।

হা! হা! হা! হা!

যেখানে নবজাতকের টিঁকে যাওয়ার সম্ভাবনা ফিফটি-ফিফটি, টিকাকরণ হয় না, জন্মমৃত্যুর নিবন্ধীকরণ হয় না, সেখানে সনতারিখেই বা কি আসে যায়?

হা! হা! হা! হা! হাসির শব্দ বাইকের গর্জন ছাপিয়ে আঁধার জঙ্গলে উড়ে ছড়িয়ে পড়ে, মৃত পাখির ছেতরানো পালকের মতো।

নুয়াশাহিতে ফিরে ধ্রুবর ল্যাপটপে সেই মুখগুলো দেখি। পাশে লেখা নাম ধাম বয়স পরিচয়। ছবিগুলো স্ক্রিনে পরপর ভেসে ওঠে, হারিয়ে যায়। জোড়া জোড়া চোখ চেয়ে থাকে তীব্র বিহ্বল উৎসুক করুণ সন্ত্রস্ত চাহনি নিয়ে। গত কয়েকদিন এই চাহনিগুলো দেখে আসছে আমাদের, এই বোবা মুখগুলো, বুঝি মুখগহ্বরে জিভ নেই। সেই কোন ইতিহাসের কালে এদের পূর্বপুরুষের জিভ কেটে নিয়েছিল ব্রিটিশরা, তারপর থেকে যেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম জন্মাচ্ছে জিভ ছাড়াই।

ছবিগুলো দেখতে দেখতে এক আচ্ছন্ন অবসাদ চেপে বসে। এই বোবা মুখগুলো থেকে কী কথা বের করে আনব আমি? এখানে আসার আগে বলেছিলাম— যা দেখব, অনুভব করব, সেটাই লিখব। কিন্তু কীই বা দেখতে পাচ্ছি? আর অনুভব? ক্রমশ একটা কুয়াশাঘেরা জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ছি মনে হয় যেন। একটা ব্যর্থতার অনুভূতি ঘন হয়ে আসে। সারাদিন ঘোরাঘুরির পর ফিরে এসে অসম্ভব ক্লান্ত লাগে। দিনের পর দিন মানুষের কাছে গিয়ে তাদের দুর্দশার কাহিনির তর্জমা শোনা, তাদের থেকে নিজের দূরত্বটাকে আড়াল করার চেষ্টা করা। দূরত্ব থেকেই যায়। তেঁতুল গাছের নীচে বসা সাহেবের সেই ছবিটা ভেসে ওঠে মনের চোখে।

দোতলায় অতিথিকক্ষের লাগোয়া বারান্দা, সামনেই রিক্ত ফসলকাটা মাঠ ফিকে কুয়াশায় ঢাকা। সুনেই নদীর ওপারে জঙ্গলরেখায় একটিও আলোর বিন্দু দেখা যায় না। অস্পষ্ট পাহাড়শ্রেণির মাথায় একফালি চাঁদ উঠেছে। একটা রাতচরা পাখি মাঠের ওপর দিয়ে ট্যাঁ ট্যাঁ করে ডেকে উড়ে গেল। জঙ্গলের ভেতরে গ্রামগুলোয় এখন নিশুতি রাত। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। যেন এক অচেনা গ্রহ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুকনো পাতার দেশ

শিমলিপালের জংলি গ্রামে দিন শুরু হয় পাখি ডাকার আগে। ভোরের আলো ফুটতেই বড়োরা কাজে বেরিয়ে পড়ে। গাছপাতার ফাঁক দিয়ে যখন সূর্যের আলো পড়ে মাটিতে আর পাখির কলকাকলিতে ভরে ওঠে চারদিক, গ্রামে তখন ছোটো ছেলেমেয়ে আর অথর্ব বুড়োবুড়ি ছাড়া বিশেষ কাউকে দেখা যায় না। এইসময় একজন বাঁশিওয়ালা বের হয়। সাত কিলোমিটার দূরের এক বসতি থেকে সাইকেল চালিয়ে সে আসে। গলায় ঝোলানো ছোট্ট বাঁশিতে হুইসিল দিতে দিতে গাছগাছালির মাঝে ছড়ানো ঘরে ঘরে গিয়ে বিভিন্ন নাম ধরে ডাক পাড়ে সে। বাঁশিওয়ালার ফিটফাট পোশাক, হাতে ঘড়ি, বুক পকেটে একটি পেন গোঁজা। কোন মেয়েটি দিনকয়েক হল ইস্কুলে আসছে না, কার জ্বর সবে ছেড়েছে, কোন ছেলেটা বাবা-মায়ের সঙ্গে ধান কাটতে গিয়ে ফেরেনি এখনও, এইসব খোঁজখবর নেয়। কবে মেয়েদের নতুন ইউনিফর্ম সেওয়া হবে, কোনদিন টিকিন মাল্ডিজমে ডিম হবে, সেসব জানায়। সূর্যটা শুখা পাতা পাহাড়ের কোল ছেড়ে ওপরে ওঠার আগেই ছেলেমেয়েগুলো গুটি গুটি পায়ে বেরিয়ে এসে বাঁশিওয়ালার পিছু পিছু চলতে থাকে।

গ্রামের নাম হ্যামলিন নয়, রুগুড়ি। বাঁশিওয়ালার নাম রামরাই সিং। হ্যামলিনের সেই বাঁশিওয়ালা গ্রামের শিশুদের ঘরছাড়া করে চিরকালের মতো বন্দি করে দিয়েছিল এক গুহার ভেতর। রুগুড়ির বাঁশিওয়ালা রামরাই ওদের বের করে আনে আবহমান অন্ধকারের গুহা থেকে। এই বাঁশিওয়ালার সুর তাদের চেনা। ওদের নিজেদের ভাষায় ছড়া গল্প বলে সে, পড়া বুঝিয়ে দেয়।

রামরাই সিং বিএ পাস, রুগুড়ি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাসন্ধানের নিয়োগ করা ভাষাশিক্ষক। আমরা যখন সেখানে গেলাম, একঘর কচিকাঁচার মাঝে মেঝেয় বসে রামরাই একটি ওড়িয়া ভাষায় লেখা বই থেকে পড়ে বোঝাচ্ছে ওদের। কেউ কেউ শুনছে, কেউ আপন মনে খেলা করছে, দুটি খুব ছোটো বাচ্চা ওর পিঠের ওপর ঝুঁকে পড়ে একবার বইটা দেখছে, একবার মুখ ঘুরিয়ে ওকে দেখছে। পাশের ঘরে আরেকটি ক্লাস চলেছে বড়োদের। সেখানে টাস্ক দিয়ে বাইরে রোদে পিঠ দিয়ে এক বাইরের লোকের সঙ্গে গল্প করছে সরকারি শিক্ষক।

বাইরের লোকটি ঠিকাদার, কাছেই একটি নির্মীয়মাণ অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে কাজের তদারকি করছে। আমাদের আসতে দেখে সরে পড়ে সে। তরুণ শিক্ষক দীপচন্দন বেহেরার বাড়ি ভদ্রকে। বনের ভেতর গ্রামসড়ক যোজনার ঝাঁ-চকচকে রাস্তা হয়েছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যানবাহন বলতে কেবল শালপাতার থালা বোঝাই ছোটো ট্রাক আর দূরাগত শিক্ষকদের মোটরবাইক ছাড়া আর বিশেষ কিছু চলে না বলে অটুট আছে। ভদ্রক থেকে বাইকে রুগুড়ি আসতে প্রায় দুঘন্টা লাগে। হিসেব করলে পথে যত টাকার পেট্রোল পোড়ে তা এই অঞ্চলে বেশিরভাগ পরিবারের দৈনিক আয়ের থেকে বেশি।

সেটা উল্লেখ করতে ঠোঁট উলটে অসহায়তার ভঙ্গি করে দীপচন্দন। ওর টুকটুকে খয়ের রঞ্জিত ঠোঁট, কপালে গেরুয়া ফোঁটা। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের আবেদনপত্রে অপশন ভরার সময় নাকি ভুল করে এই অঞ্চলের খোপে টিক দিয়ে ফেলেছিল। আবার নতুন করে পরীক্ষায় বসার জন্য তৈরি হচ্ছে। এবার আর ভুল হবে না, উপকূলবর্তী অঞ্চলের খোপেই টিক দেবে সে।

দীপচন্দনের এই অসতর্কতার কাহিনির ভেতরের গল্পটা একটু ভিন্ন, সেটা জেনেছিলাম পরে। এই আদিবাসী অঞ্চলগুলোয় স্থানীয় আবেদনকারী খুব কম থাকে, অন্যদের পছন্দের তালিকাতেও থাকে একেবারে নীচের দিকে। এর ফলে অপেক্ষাকৃত নিম্নমেধার প্রার্থীদের জন্য সুলভ হয়।

সুলভ, এবং গ্রামসড়ক যোজনার দৌলতে সুগম্য। কিন্তু পড়ুয়াদের জন্য অচিরেই দুর্লভ হয়ে ওঠেন এই শিক্ষকেরা।

রুগুড়ির ইস্কুলে আরেকটি দুর্লভ বস্তু হল জল। আশেপাশে কোথাও জলের উৎস নেই। ছেলেমেয়েরা বাড়ি থেকে বোতলে জল ভরে নিয়ে আসে। রান্নার জলও এভাবে টেনে আনতে হয়। স্থানীয় বিডিওর কাছে দরবার করেছিল রামরাই, তাতে কাজ না হওয়ায় খোদ জেলাশাসককে চিঠি লিখেছিল। তাতে ফল পাওয়া যায়, পূর্ত বিভাগ থেকে ইঞ্জিনিয়ার এসে পরিদর্শন করে যায়। একটি টিউবওয়েল অনুমোদন হয়েছিল, পাইপ ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ চলে এসেছিল পঞ্চায়েত দপ্তরে। তারপরে কর্তাদের বোধোদয় হয় যে এখানে জলস্তর অনেক নীচে, যে পাইপ এসেছে তা যথেষ্ট দীর্ঘ নয়। সেই পাইপ ফিরে যায়। আবার নতুন করে অনুমোদন, আবার নতুন ঠিকাদার। এই করে দুবছর ঘুরতে চলেছে, পুরোনো আধিকারিকেরা বদলি হয়ে গিয়েছে। তবু চিঠি লিখে চলেছে অক্লান্ত রামরাই সিং। অপেক্ষা করছে। এবার একটা আরটিআই করবে ভাবছে। স্কুলে একটা টিউবওয়েল হলে ও নিজের কাজটা আরও ভালোভাবে করতে পারে, ছেলেমেয়েরা টিকিন মাড্ডিজমের পর বাড়িতে জল খেতে যাবার ছুতোয় পালিয়ে যেতে পারে না।

ফিরে আসছি, আমাদের বিদায় জানাতে বেশ কিছুটা হেঁটে এসে যাত্রাপথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে একা রামরাই। হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা ? নাকি কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখেনা গল্পের নায়ক ?

গার্সিয়া মার্কেজের গল্পে এক বৃদ্ধ কর্নেল অপেক্ষা করেছিলেন পেনশনের চিঠির, রামরাইয়ের অপেক্ষা একটি টিউবওয়েলের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে পড়ে অপু, ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ভালো ফল করার পর যখন কলকাতায় গিয়ে পড়তে চাওয়ার কথা বলেছিলে, তোমার মা একটি প্রশ্ন করেছিলেন—

আর আমার কী হবে? আমি কি গাঙের জলে ভেসে এসেছি? তুই পুজোআচ্চা না করলে ওরা আমায় মাথায় করে রাখবে ভেবেছিস?

তোমার কাছে এর কোনো উত্তর ছিল না। বিকল্পও ছিল না। যজমানেরা মাথায় করে রাখেনি সর্বজয়াকে। দারিদ্র্য আর অপুষ্টির সঙ্গে নীরবে জুঝেছে সে, তোমাকে সেভাবে কিছু জানতে দেয়নি। ফুসফুসের অসুখ চেপে রেখেছে দীর্ঘদিন। ঠিকমতো চিকিৎসা হয়নি, মারা গিয়েছে অকালে।

কলকাতা টেনেছিল তোমায়। মনে আছে, যাবার আগের দিন রাতে উত্তেজনায় ঘুম হয়নি তোমার? তারপর পা রাখলে সেই বিশাল জটিল আশ্চর্য সব-পেয়েছির মহানগরে, যার ক্ষয়াটে ইটপাথরের গায়ে জড়ানো শ্যাওলায় অস্তগামী সূর্যালোকের মতো লেগেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গরিমা। এই শহরের মোহিনী রূপ নগরকামিনীর মতো বেঁধেছিল তোমায়, গ্রামে আর ফিরতে চাইতে না। গেলে দু-চারদিনের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠতে, পালিয়ে আসতে।

এই প্রান্তিক জঙ্গলপ্রদেশের কোনো কলকাতা নেই, তবে কটক ভুবনেশ্বর আছে। সেখানে যাবার বাস ছাড়ে বনের ধারে ছোট্ট গঞ্জ সরট থেকে। বিদ্যুৎ আছে সরটে। দোকানপাট, ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, ব্যাঙ্ক, পোস্টাপিস, ভিডিও হল, মদের দোকান ও থানা আছে। ব্যাঙ্কে সদ্য এটিএম বসেছে। থানার নতুন তিনতলা বাড়ি কাঁটাতার বালির বস্তায় সেজে উঠেছে দুর্গের মতো। তার ঘুলঘুলি দিয়ে দিবারাত্র উঁচিয়ে থাকে স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের নল।

কটক জাজপুর ভুবনেশ্বর যাবার বাসগুলো যেখানে এসে দাঁড়ায়, তার চারপাশে গজিয়ে উঠেছে দোকানপাট, পাইস হোটেল। খোলা নর্দমায় ভনভন করে মাছি, মোবাইল রিচার্জের গুমটিতে বাজে ওড়িয়া ফিল্মি গান। এক জায়গায় স্তূপাকার করে বিক্রি হচ্ছে খমিরের গুলি, যা হাঁড়িয়া বানাতে লাগে, এছাড়া নকল ব্র্যান্ডের প্রসাধনসামগ্রী, বলিউড তারকাদের পোস্টার। তুরাম সিং-এর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় এখানে; একদল সহপাঠীর সঙ্গে গলা জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে বাসের জানলায় তিন শহরগামী তরুণীর দিকে লোলুপ চেয়ে আছে। ছেলেগুলোর পরনে চটকদার পোশাক, কারো বা চোখে সানগ্লাস, জেলচর্চিত কেশবিন্যাস। একটি বইয়ের দোকানও আছে সরটে; সেখানে সাজানো বেশিরভাগ নোটবই, চাকরির পরীক্ষার গাইড, ওড়িয়া সফট পর্ণ। পুরো বাজার এলাকাটা ঘুরে ওই খমিরের গুলি ছাড়া অরণ্যবাসী মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস তেমন কিছু চোখে পড়ে না। তুরি বর্জার মতো কাউকে দেখা যায় না।

এখানে ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকেই পড়েছে বিরসা বিরোলি। বিরসার বাড়ি নোটোয়। কাপ্তিপদার ডিগ্রি কলেজে পড়ার সময় যারা তাকে নোটোর পিলা (ছেলে) বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যঙ্গবিদ্রূপ করত, তারাই কীভাবে এখন আদর করে পাশে ডেকে বসায়, চিঠি দরখাস্ত লিখিয়ে নেয়, সে কথা বলছিল একদিন। বিরসার বুকপকেটে সবসময় গোঁজা থেকে একটি পেন। এই পেনের খোঁচায় রামরাই সিং রুগুড়ির ইস্কুলে টিউবওয়েলের দরবার করেছে খোদ জেলাশাসকের কাছে। সেই টিউবওয়েল এখনও আসেনি বটে, তবে ব্লকের আধিকারিকেরা এসে দেখে গিয়েছে কয়েক দফায়।

১৯৮৬ সালে, যে বছর দেশে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা হয়, রামরাইয়ের জন্ম। সেই শিক্ষানীতিতে প্রথম আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এত বছরে তার অনেক কিছুই হয়নি। রামরাই সিং-এর সঙ্গে যখন আমার দেখা হল, ওর বয়স তখন পঁচিশ। তবু কোনোএকভাবে রামরাইয়ের কাহিনি জাতীয় শিক্ষানীতির রজতজয়ন্তী উদযাপন।

কিন্তু বিরসা রামরাইরা ব্যতিক্রম, লেখাপড়া বেশিরভাগকেই গ্রাম ছাড়া করেছে পুরমি সিং-এর ছেলের মতো। সেইজন্য বাচ্চাকে স্কুলে পাঠাবার তদ্বির করতে গেলে যমুনাকে গ্রামবাসীদের কাছে শুনতে হয়— একটা কি দুটোকে নিয়ে যাও, কিন্তু সবকটা ছেলেমেয়েকে কিছুতেই ইস্কুলে পাঠাব না।

যমুনা ওর নিজের ছেলেকে শহরের ভালো স্কুলে রেখে পড়াতে চায়, সম্ভব হলে ভুবনেশ্বরে কোনো আবাসিক স্কুলে। তফশিলি সম্প্রদায়ের জন্য বিভিন্ন সরকারি বৃত্তি আছে, খোঁজ নিয়ে জেনেছে সে। ওর স্বামীও একটি স্বেচ্ছাসেবি সংস্থায় কাজ করে। বাড়িতে ছেলের সামনে ওড়িয়া ভাষায় কথা বলে ওরা। ভাত থেকে হাঁড়িয়া তৈরির প্রক্রিয়া যমুনা একদিন বিশদে বলেছিল আমায়। ওদের সমাজে ঘরে ঘরে এটি প্রচলিত। কিন্তু যমুনা হাঁড়িয়া তৈরি করে না। ওর স্বামী নেশাভাং করে না।

যমুনা সামাদের গল্প জঙ্গলের ছায়া ছেড়ে, ছন্নছাড়া গেরস্থালি ছেড়ে গ্রাম সড়ক যোজনার নতুন পথের মতো বেঁকে গিয়েছে নুয়াসাহি হয়ে বালেশ্বরের দিকে।

সরটের বাজার এলাকা ছেড়ে বাসরাস্তা ধরে কিছুটা এগোলে মাঠের ধারে প্রবীণ সুরাই হেমব্রমের বাড়ি। আমরা তাঁর কাছে গিয়েছিলাম একটি ধাঁধার উত্তরের খোঁজে।

ইটের দেয়াল, টালি খাপরার চাল, তিনটি ঘর নিয়ে সুরাই হেমব্রমের ছিমছাম বাড়ি। সামনে উঠোনে ধান ঝাড়াই হচ্ছে, তার তদারকি করছিলেন। আমাদের অভ্যর্থনা করে দাওয়ায় এনে প্লাস্টিকের চেয়ার পেতে বসালেন। বয়স ষাটের ওপর হলেও স্বাস্থ্য অটুট আছে, মাথাভর্তি চুল আর চিবুকে পাকা দাড়িতে ধানের ভুসি লেগেছে।

শিক্ষার আলো পেয়ে আরণ্যক সমাজের বাইরে যারা আসে, তারা সচরাচর আর ফেরে না। এর ফলে সমাজটা ভেতর থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে। এই ধাঁধা থেকে মুক্তির উপায় কি?

ঠিক তাই, সুরাই বলেন। যারা এগোয়, তারা আর পেছনপানে তাকায় না। পরবে-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পার্বণে আসে না, পরিবারে বিয়ে-শ্রাদ্ধ হলে বড়োজোর একা আসে। ছেলেমেয়েদের আনে না। এক প্রজন্ম পরে সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক চুকেবুকে যায়।

তার মানে ব্যক্তির উন্নতি থেকে সমাজ কিছু পায় না, আর যত দোষ গিয়ে পড়ে লেখাপড়ার ওপর। তাই তো? প্রদীপ বলেন।

সম্মতিসূচক মাথা নাড়েন সুরাই হেমব্রম।

হ্যাঁ, আর এটা খুব মর্মান্তিক, কারণ শহরের মতো আমরা নিজের সমাজের বাইরে জীবন কল্পনাও করতে পারি না। যুগ যুগ ধরে আদিবাসী সমাজে সবথেকে বড়ো শাস্তি হল সমাজ থেকে বহিষ্কার। কিন্তু দিনকাল পালটাচ্ছে, আর এই সমস্যার সমাধান কী আমার সত্যিই জানা নেই।

আদিবাসী সমাজে শিক্ষার প্রসারে আজীবন কাজ করে চুলদাড়ি পাকিয়ে ফেলেছেন সুরাই। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হয়ে মেয়েদের ইস্কুল ও বৃত্তি শিক্ষার কলেজ গড়েছেন। এখনও তিনি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উপদেষ্টা সদস্য।

কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে থেকে ফের বলেন—

যে শিক্ষা একজন আদিবাসীকে নিজের সমাজ সংস্কৃতি সম্পর্কে গর্বিত করে তুলবে, দূরে ঠেলে দেবে না, সেই শিক্ষাই দেওয়া উচিত ইস্কুলগুলোয়। সেইভাবে পাঠ্যবই লিখতে হবে এবং যতদূর সম্ভব পড়ুয়ার মাতৃভাষায়। কিন্তু এখানে শিক্ষকদের একটা বড়ো ভূমিকা আছে। আমাদের এই জঙ্গলমহলে মাস্টাররা সব বাইরে থেকে আসে, তারা আমাদের ভাষা সংস্কৃতি কিছুই জানে না।

আমার মনে পড়ে যায় রুগুড়ি স্কুলের দীপচন্দন বেহেরার ঠোঁট ওল্টানোর সেই ভঙ্গিটা। এরপরে বাইকে যাওয়া আসার পথে বারকয়েক দেখা হয়েছে ওর সঙ্গে। হাত নেড়ে সুপ্রভাত বিনিময় হয়েছে, ইংরেজিতে।

উনিশশো ছিয়াশির জাতীয় শিক্ষানীতিতে আদিবাসী সমাজের মধ্যে থেকে শিক্ষক তৈরির ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষার প্রসার যেখানে নেই, সেখান থেকে শিক্ষক আসবে কীভাবে? এ এক বিচিত্র দুষ্টচক্র। তাই না? আমি বলি।

হ্যাঁ, কিন্তু এর একটা বিহিত আছে। সুরাই বলেন।

কী সেটা?

মাস্টারকেও পড়ুয়া হতে হবে। পড়ুয়া পড়বে চোখ দিয়ে, মাস্টার পড়বে কান দিয়ে।

তার মানে?

পড়ুয়া লিখতে পড়তে শিখবে, মাস্টার শুনবে জানবে আমাদের সমাজ সংস্কৃতির কথা। তারা পড়ুয়াদের পাশে বসে মিড-ডে মিল খাবে। কত দূর দূর থেকে ওরা আসে, এই গ্রামদেশে কোথায় খাবার কিনে খাবে বলুন তো? ওরা খেলে খাবারের গুণমানে একটা নজরদারিও থাকবে। ওরা গ্রামে মিটিঙে সালিশিতে থাকবে, মতামত দেবে। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে একটা সেতুর মতো হয়ে থাকবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতে বলতে সুরাই হেমব্রমের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়। ওঁর কণ্ঠস্বরে মেশে উঠোনে ধান ঝাড়াইয়ের শব্দ, কুয়োর কপিকলে জল টানার শব্দ।

এবার শেষ প্রশ্নটি করি...

আপনি তো অনেককাল ধরে মাটির কাছাকাছি থেকে দেখছেন শিক্ষার ছবিটা। এত বছরে কী পরিবর্তন হয়েছে? কিছু কি পরিবর্তন হয়েছে?

সোনালি খড়ের স্তূপে হেমন্তের অপরাহ্নের আলো এসে পড়েছে। অনেকক্ষণ চুপ করে সেদিকে চেয়ে থাকেন সুরাই।

হ্যাঁ, হয়েছে। কিন্তু বড়ো ধীর গতি এই পরিবর্তনের। যেখানে পৌঁছোবার কথা ছিল তার ধারেকাছেও যেতে পারিনি আমরা।

স্মৃতিতে ডুব দিয়ে উঠে সরাসরি তাকিয়ে বলেন—

আপনি তো নোটোয় গিয়েছিলেন। চল্লিশ বছর আগে সারা নোটো পঞ্চায়েত চষে ফেললেও একজনও সাক্ষর মানুষ পাওয়া যেত না। লোকজন আঠেরো বিশ মাইল জংলি পথ ভেঙে এখানে আমার কাছে আসত চিঠি কিংবা দরখাস্ত লিখে দেবার জন্য। এজন্যে সপ্তাহে একটা দিনও নির্দিষ্ট ছিল, মঙ্গলবার। ওইদিন আমি কোথাও বেরোতাম না। এখন আর কারোর এতদূরে আসার দরকার পড়ে না। এই পরিবর্তনটা হয়েছে।

হয়তো তাই, মনে মনে বলি। হয়তো চল্লিশ বছর আগে যমুনা সামাদরা ক্রিশ্চান হয়ে যেত।

AMARBOI.COM

*

পুঙ্গিচুয়া আর তেন্ডু, দু কিলোমিটার দূরত্বে দুটি গ্রাম। মাঝখান দিয়ে বয়ে গিয়েছে একটি পাহাড়ি নালা। দুটিই সমান প্রত্যন্ত আর অনগ্রসর, বর্ষার তিনটে মাস সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আশেপাশের এলাকা থেকে। পুঙ্গিচুয়ায় একটি সরকারি স্কুল তৈরির সিদ্ধান্ত হল যখন, তেন্ডুর মানুষেরা বেঁকে বসেছিল। পুঙ্গিচুয়ায় যদি ইস্কুল হতে পারে, তাহলে তেন্ডুতে কেন নয়? যদি একটিই ইস্কুলের জন্য টাকা বরাদ্দ হয়ে থাকে, তাহলে সেটা তেন্ডুতে না হয়ে পুঙ্গিচুয়ায় কেন হবে? দড়ি টানাটানি চলল এবং পুঙ্গিচুয়ার জিত হল। প্রতিবাদে তেন্ডুর মানুষ তাদের ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল।

সে বছর তিনেক আগের কথা। এখন অবস্থাটা ঠিক কী সেটা সরেজমিনে দেখার জন্য চলেছি আমরা। মোটরবাইকের আয়নায় সরে যায় কেঁদ পিয়ালের বন, ঢেউখেলানো মাঠ, ছোটো ছোটো খোপকাটা জমিজিরেত, পুষ্পিত সরগুজা আর ধান পেকে হলদে হয়ে আছে, দূরে জঙ্গলের মাথায় অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণি, পাকা ফসল মাথায় কৃষকদম্পতি, সাঁকোর নীচে বহতা নালা, খড়খাপরার গ্রাম, শালুকফোটা দিঘি, রাস্তা জুড়ে ছাগলপালের চাক্কা জ্যাম, পেছনে ছাতা হাতে রাখাল বালক, প্রাচীন বটের ঝুরি ধরে খেলারত ঝুলন্ত ফলের মতো শিশুরা... শত অভাব আর বঞ্চনা সত্ত্বেও এই অঢেল অনাবিল সৌন্দর্য থেকে চোখ ফেরাবে এমন সাধ্যি কার?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি নির্মীয়মাণ কালভার্টে এসে থমকে যায় গ্রামসড়ক। নীচে সেই নালা, সুনেই নদীর শাখা, যা বছরে ক'মাস ওদিকের গ্রামগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। কালভার্টটি কতকাল ধরে নির্মীয়মাণ দেখে বোঝার উপায় নেই ; লোহার রডে মরচে ধরে খাবলা খাবলা কংক্রিট খসে গিয়েছে। শীতের গোড়ালি-ডোবা খাতের ওপর বাইক ঠেলে পার করার পর এপারে রাস্তা বলে আর কিছু নেই। শুখুয়াপাত্তা পাহাড়ের কোল বেয়ে পাথুরে পথের একটি রেখা চলে গিয়েছে শাল মহুয়া ও আরও নাম-না-জানা গাছের ঘন বনের ভেতর।

বেশ কিছুদূর যাবার পর দশবারো ঘরের একটি বসতি। এখানেই তুরি বর্জা থাকে, কিন্তু ওর দেখা মিলল না। আগের দিন থেকে বাড়ির লোকেরা ওকে দেখেনি, হয়তো বনে গিয়েছে। পাহাড়ের ওদিকের ঢালে বন খুব ঘন। সেখানে গেলে দু-তিনদিন পরে ফিরে আসাও কিছু অস্বাভাবিক নয়।

বসতিটা ছাড়িয়ে শুরু হচ্ছে বাবলা জাতীয় গাছের বন। সব পাতা ঝরে গিয়েছে, তার ওপর সূর্যের আলো পড়ে শুকনো পাতার কার্পেট উজ্জ্বল বাদামি হয়ে আছে। জোড়া বাইকের শব্দে পথের ওপর থেকে বনঘুঘুর একটা ঝাঁক উড়ে যায়।

কে বলবে স্কুল পরিদর্শনে চলেছি? কোনো ভূতুড়ে অ্যাডভেঞ্চারও হতে পারে। সেকথা ভৃগুকে বলতে খুব নির্বিষ্টভাবে পথের পাথরগুলো পাশ কাটাতে কাটাতে বলে— এর মধ্যে টায়ার পাংচার হলে কী হবে ভাবুন তো একবার?

কী হবে সেটা ভাবতে গিয়ে গলা ছেড়ে হেসে উঠি দুজনেই। হাসি ছাড়া আর কীই বা করার থাকবে? গত কয়েকদিন জঙ্গলের মধ্যে কোথাও টায়ার মেরামতির দোকান দেখিনি একটাও।

বনের ধারে একতলা স্কুলবাড়িটা দেখে প্রথমে ভূতের বাড়িই মনে হয়। স্কুল চলছে, কিন্তু পরিচিত কলকাকলি নেই।

জানো অপু, এই প্রত্যন্ত অরণ্যপ্রদেশে একটি ছোটো ছেলে বা মেয়ে একজন প্রাপ্তবয়স্কের ক্ষুদ্র সংস্করণ— অন্তত সমাজ পরিবার তাকে সেভাবেই দেখে। বয়ঃসন্ধির ঢের আগেই সে জীবনের পাঠশালায় বেঁচে থাকার জন্য জরুরি জ্ঞানগুলো আয়ত্ত করে ফেলে, চারপাশের প্রকৃতি সম্পর্কে প্রখর ইন্দ্রিয়বোধ গড়ে ওঠে, এমনকি কৌম মূল্যবোধগুলোও আত্মস্থ করে। নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজে একজন সমবয়সির তুলনায় অনেক সম্পূর্ণ সে। কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় তার এই অর্জনের কোনো মূল্য নেই, স্বীকৃতিও নেই। ক্লাসঘরের চৌকাঠ পেরনোর সময় সে চটি ছেড়ে আসার মতো জীবন আর প্রকৃতির কাছে শেখা এই জ্ঞানগুলো বাইরে রেখে আসে। তার প্রখর ইন্দ্রিয়গুলো ঘুমিয়ে পড়ে সঙ্গে আসা খুদে ভাইবোনের মতো। ক্লাসঘর ভরে থাকে নীরব ছায়ায়। এখানে একমাত্র বৈধ জ্ঞান তাই, যা থাকে পাঠ্যবইয়ে দুর্বোধ্য ছাপার অক্ষরে।

সেই মলিন জীর্ণ বইয়ের পাতা খুলে একসঙ্গে মিলেমিশে বসে থাকে দুটি-তিনটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রেণি, শ্লেটে আঁকিবুঁকি কাটে। তাদের চেহারা দেখে কে কোন শ্রেণি বোঝা যায় না। সঙ্গে বইয়ের যে থলিগুলো এনেছে, সেগুলো সরকারি সিমেন্টের বস্তা কেটে তৈরি। একে কি উন্নয়নের ট্রিকল ডাউন ইফেক্ট বলা যাবে? কে জানে। থলির ভেতর থেকে উঁকি মারে স্টিলের থালা। ঘরের পেছনদিকে মেঝেয় কুণ্ডলি পাকিয়ে ঘুমোয় কচিকাঁচারা। মিড-ডে মিল তৈরি হয়ে গেলেই ওরা জেগে উঠবে।

সেই কাজের তদারকি করেন স্কুলের একমাত্র শিক্ষক মাঝবয়সি কানাই চরণ সিং। উনি ভূমিজ সম্প্রদায়ের। এই স্কুলে শিক্ষাসন্ধানের নিয়োগ করা কোনো ভাষাশিক্ষক নেই। দেওয়া সম্ভব হয়নি।

মেনুতে আজ ভাত আর সয়াবিনের তরকারি। জলের উৎস প্রায় এক কিলোমিটার দূরে। এছাড়া বর্ষায় ছাতের ফুটো দিয়ে জল পড়ে। পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে চালের সাপ্লাই অনিয়মিত।

এসব সমস্যা তো লেগেই আছে। কিন্তু সব থেকে বড়ো মুশকিলটা হয় কখন জানেন? যেদিন মিড-ডে মিলে ডিম দেওয়া হয়। পড়ুয়াদের অনেকের সঙ্গেই ছোটো ভাইবোনেরা চলে আসে। সে না হয় চাল একটু বেশি নেওয়া গেল। কিন্তু ডিমের বরাদ্দ তো মাথাপিছু একটা করে। ডিম কেটে ভাগ করলেই বাচ্চাগুলো সাংঘাতিক কান্নাকাটি জুড়ে দেয়। ওদের গোটা ডিম চাই।

কানাইচরণ এমন কাতরভাবে তাকান, যেন এই সমস্যার কথা আমরা একটু ওপরমহলে পৌঁছে দিই। একটি শিশুমনে দ্বিখণ্ডিত না করে কীভাবে একটি ডিম দ্বিখণ্ডিত করা যায়? এই বিষয়ে কি কোনো সেমিনারে আলোচনা হবে? সংসদেই কি আলোচনা হবে? সরকার বিশেষজ্ঞ কমিটি গড়বে কি?

সমস্যা থেকে মুখ ফিরিয়ে ক্লাসঘরের ভেতরে তাকাই। বাইরে উজ্জ্বল স্পন্দিত পৃথিবী, ঘরের ভেতর যথারীতি ছায়াচ্ছন্ন। ক্লাস ওয়ান থেকে ফোর, সর্বমোট বাহান্নটি ছেলেমেয়ে। দেহের আকার দেখে কে কোন ক্লাসের বোঝার যেমন উপায় নেই, এদের মধ্যে কতজনের বাড়ি তেন্তু সেটাও বোঝা যায় না। ভৃগু হাত তুলতে বললে বাইশটি হাত ওঠে। এবং ঘরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে।

দুই গ্রামে দড়ি টানাটানির গল্প আজ দৃশ্যতই অতীত। এই ছবি ধরে রাখতে প্রদীপ ক্যামেরা বের করলে পুঙ্গিচুয়ার এক বালক পাশেই তেন্তুর সহপাঠীর হাতটা কনুই থেকে ঠেলে তুলে ধরে। দুজনেরই মুখে বিজয়ীর হাসি।

তেন্তুর বালকটির নাম মাথাই সিং। এক মাথা কোঁকড়ানো চুল, উজ্জ্বল পুঁতির মতো চোখ। দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে। রোজ সকালে দু কিলোমিটার হেঁটে ইস্কুলে আসে মাথাই। পথে একটা নালা পেরোতে হয়। বর্ষায় নালার জল ওর কোমর অব্দি উঠে আসে। তখন পোশাক আর বইয়ের থলি মাথার ওপরে তুলে পার হতে হয়। কিন্তু তাতে কী? ইস্কুলে না এলে যে বনের ভেতর খেতপাহারায় যেতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথাই সিং-এর পাঠ্যবইয়ে জিরাফ ঈগল উট এরোপ্লেন আপেল ইত্যাদির ছবি ও ওড়িয়া ভাষায় তাদের নাম লেখা আছে। কিন্তু নাম বললে ছবি দেখে বেশিরভাগ বস্তুই শনাক্ত করতে পারে না সে।

তেন্ডুতে কি কেউ আপেল খায়?

এই অঞ্চলের ওপর দিয়ে কি কোনো এরোপ্লেনের উড়ানপথ আছে?

হো ভাষায় এরোপ্লেনকে কী বলে?

বেয়াড়া প্রশ্নগুলো মাথার মধ্যে বুড়বুড়ি কাটে। তাদের প্রশ্রয় না দিয়ে আমি মাথাইকে জিজ্ঞেস করি—

আচ্ছা বল দিকি, আমাদের এই দেশটার নাম কী?

প্রশ্ন শুনে চুপ করে থাকে সে, বন্ধুদের মুখের দিকে তাকায়, ওর উজ্জ্বল পুঁতির মতো চোখদুটো নিষ্প্রভ হয়ে যায়। অবশেষে টেনে টেনে বলে—

আমাদের এই দেশের নাম শুখুয়াপাত্তা পাহাড়।

*

আমার এখানে থাকার দিন ফুরিয়ে আসছে। এই কদিনে মাথার মধ্যে যে ছবিগুলো জমেছে, সেগুলো কোনো নির্দিষ্ট ক্রমে সাজাতে পারি না আমি। খুব ছেলেবেলায় দেখা ছায়াছবির মতো দুর্বোধ্য কতকগুলো খণ্ডদৃশ্য, কোনো লাগাতার গল্প বলে না। এই কদিনে অনেকগুলো ইস্কুলে গিয়ে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলেছি দুটি ভাষার দেয়ালের ফোকর দিয়ে, কিন্তু স্কুলছুটদের সঙ্গে— যাঁদের স্থানীয় পরিভাষায় বলে পাঠপড়িবনা-পিলা— কথা বলার সুযোগ হয়নি। এই খামতির কথা বলতে ভৃগু একদিন রাস্তা ছেড়ে আচমকা মোটরবাইক ঘুরিয়ে নেমে গিয়েছিল মাঠের মধ্যে। সেখানে মহিষ চরাচ্ছিল কয়েকটি বালক, আমাদের ওভাবে আসতে দেখে লাঠি ছাতা ফেলে দুদ্দাড় করে ছুটে পালিয়ে গেল। স্থানীয় যত মানুষজনের সঙ্গে কথা বলেছি, তাদের মধ্যে পুরুষই বেশি। অথচ এই সমাজে আপাতভাবে নারীপুরুষে একটা সাম্য রয়েছে। তাছাড়া ছড়া গান লোককথা কৌম স্মৃতির আকর তো নারীই। এই প্রসঙ্গে একদিন জানা গেল, এখানে এক গ্রামে একজন শতায়ু বৃদ্ধা আছেন যিনি সিংভূম থেকে আগত প্রথম দলের সঙ্গে এসেছিলেন।

খোঁজ করে যাওয়া হল সেই প্রবীণার কাছে। তাঁর সন্তানেরা কেউ বেঁচে নেই আর, প্রৌঢ় নাতিদের সংসারে থাকেন। গিয়ে দেখা গেল বয়সের ভারে মেরুদণ্ডটা কোমর থেকে বেঁকে চতুষ্পদের মতো সামনে ঝুঁকে এসেছে, কিন্তু অথর্ব নন। লাঠিতে ভর দিয়ে খুব ধীরে ধীরে এসে বসলেন দাওয়ায়। আমাদের প্রশ্নগুলো ওঁর এক নাতির ছেলে বৃদ্ধার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জোরে জোরে পুনরাবৃত্তি করছিল। একটি প্রশ্নেরও উত্তর দেননি। ওঁর ঘন বলিরেখাময় পাখির বাসার মতো মুখে অস্বচ্ছ দুটি চোখ স্থির চেয়েছিল আমাদের দিকে। ঠোঁটের কোণে লেগেছিল এক বিচিত্র হাসির আভাস। ঠোঁটের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফাঁক দিয়ে একটি শব্দও বেরিয়ে আসেনি। নাতির ছেলের কণ্ঠস্বর ওঁর কানের গহ্বরে প্রতিধ্বনি হচ্ছিল যেন প্রাচীন শুকনো কুয়োর ভেতর।

দোলিপড়া পঞ্চায়েত এলাকায় বনের ধারে এক জায়গায় অনেকগুলো খাড়া গ্রানাইট পাথরের মনোলিথ। তার খাঁজে কাঠ পাতা মাটি দিয়ে ঘর বানিয়ে বাস করছে একটি পরিবারের তিন প্রজন্ম। গৃহকর্তা শঙ্কর দেহুরির বয়স মধ্য পঞ্চাশ, তাঁর ছেলে লক্ষ্মী দেহুরি, লক্ষ্মীর আট বছরের ছেলের নাম সনাতন। ওদের বাসস্থানটা বনদপ্তরের খাস জমিতে। চারপাশে উনো পাথুরে জমি। কিছুদূরে আদিবাসীদের যা অল্প জমিজমা আছে সেখানে চাষের কাজে লোক লাগে না। শঙ্কর ও লক্ষ্মী তাই বিশ কিলোমিটার দূরে কাপ্তিপদায় উচ্চবর্ণ হিন্দুদের জমিতে জনমজুর খাটতে যান। যখন চাষের কাজ থাকে না, লক্ষ্মী তখন শুখুয়াপাত্তা পাহাড়ের খাদানে পাথর ভাঙতে যায়।

এই পরিবারের গল্পে এমনিতে কোনো বিশেষত্ব নেই, কেবল একটি তথ্য ছাড়া— শঙ্কর দেহুরি লিখতে পড়তে জানেন, সনাতনও ইস্কুলে যায়, কিন্তু মধ্যম প্রজন্ম লক্ষ্মী দেহুরি নিরক্ষর।

সত্তরের দশকে ওদের গ্রামটা ছিল সুনেই নদীর ধারে। সেচের জন্য নদীতে একটি বাঁধ প্রকল্প হয়। স্বাভাবিকভাবেই খাল কেটে দূরে কাপ্তিপদায় সম্পন্ন বর্ণহিন্দুদের জমি সেচসেবিত হয়, কিন্তু জঙ্গলের ভেতর অনেকগুলো আদিবাসী গ্রাম নিঃশব্দে ভেসে যায়। কোনো পুনর্বাসন হয়নি, কিছু পরিবার এককালীন ক্ষতিপূরণ পেয়েছিল। তার মধ্যে শঙ্কর দেহুরিও ছিলেন। ভিটে জমি সমাজ দেবস্থান গ্রাম হারিয়ে বারো হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন শঙ্কর। যথারীতি কিছুকালের মধ্যেই সেই টাকা নিঃশেষ হয়ে যায়। তারপর আর ভাগ্য ফেরাতে পারেননি। বনের ধারে এই অস্থায়ী মাথা গোঁজার ঠাঁই ক্রমশ স্থায়ী রূপ পেয়েছে। ভালো করে তাকালে দেখা যায় মাটির দেয়ালে পুরোনো কাঠের জানলা দরোজা— ছেড়ে-আসা ভিটে থেকে খুলে আনা হয়েছে।

বাঁধের গর্ভে তলিয়ে যাওয়া সেই গ্রামে একটি প্রাইমারি ইস্কুল ছিল, শঙ্কর সেখানে পড়েছেন। সেখান থেকে এই দোলিপড়ায় আসার পর আশেপাশে কোথাও ইস্কুল ছিল না। লক্ষ্মী তাই নিরক্ষর রয়ে গিয়েছে। কয়েক বছর হল কাছেই একটি ইস্কুল হয়েছে, ওর ছেলে সনাতন সেখানে পড়তে যায়।

এক পরিবারের তিন প্রজন্মের এই গল্প কি প্রবহমান ভারতবর্ষের আশাব্যঞ্জক গল্পের খোপে রাখা যাবে? নাকি নিরাশাব্যঞ্জক? কে জানে।

আমরা যখন শঙ্কর দেহুরির কুঁড়েয় গেলাম, লক্ষ্মী তখনও কাজ থেকে ফেরেনি। এছাড়া গোটা পরিবারটাই শীত বিকেলের শেষ সূর্যের তাপ গায়ে মেখে ঘরকন্নার কাজ করছিল। মইয়ের ওপর উঠে ঘরের চাল মেরামত করছিলেন শঙ্কর, মইটা নীচে থেকে ধরেছিল নাতি সনাতন। ওর মা উঠোনে বঁটি পেতে শাক কাটছিল। খানিকটা দূরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাথরের ঢালু চাটানে বসে কাঁথা সেলাই করছিলেন শঙ্করের স্ত্রী। ছবি তোলার জন্য প্রদীপ ক্যামেরা বের করতে সামনে এসে দাঁড়াল দাদু ও নাতি, মাঝের প্রজন্ম ফ্রেমের বাইরেই রয়ে গেল। তবে প্রেক্ষাপটে ধরা রইল খাড়া পাথরের মনোলিথ।

পাথর কাটতে কাটতে একদিন শুখুয়াপাত্তা পাহাড়ের খাদান যখন নিঃশেষ হবে, তখন লক্ষ্মী হয়তো এই বাসাল্টের চাঁইগুলো ভাঙতে শুরু করবে। আশা করা যেতেই পারে ততদিনে সনাতন ইস্কুলের গণ্ডি পার হয়ে যাবে। বাড়িতে একজন সাক্ষর মানুষ থাকায় সেটা কিছু অসম্ভব নয়। ততদিন এই পাথরখণ্ডগুলো দাঁড়িয়ে থাকবে আদিম দেবতার মতো।

সূর্যটা গাছের আড়ালে হেলে পড়ায় পাথরের ছায়াগুলো দীর্ঘ হয়েছে। বনের মধ্যে ঘরে-ফেরা পাখিদের কিচিরমিচির, কিছুক্ষণের মধ্যেই স্তব্ধ হয়ে যাবে। নিষ্পত্র মগডালে শেষ আলোর ছোপ মুছে যাবার পরেও খানিকক্ষণ নীলচে গোলাপি আলোটা থেকে যাবে আকাশের গায়ে। ইতিমধ্যে কালভার্টের নীচে যেন সারাদিন ঘুমিয়ে থাকা নালার কলকল শব্দ শোনা যায়। বন ছাড়িয়ে একটি ঢেউখেলানো কাঁকরে মাঠ, তার ধারে গাছপালার মাঝে একটুখানি ফাঁকা জায়গায় খোলা আকাশের নীচে অস্থায়ী সংসার পেতেছে চার-পাঁচটি পরিবার— নারী পুরুষ শিশু, এমনকি পোষা কুকুরও আছে। তাদের মলিন বেশবাস, উসকোখুসকো চুল, হতদরিদ্র চেহারা। খোলা মাঠের ওপর পোঁটলা পুঁটলি ছড়ানো রয়েছে। মেয়েরা মাটতে গর্ত খুঁড়ে কাঠকুটো জ্বেলে রান্না চাপিয়েছে, বাচ্চারা আগুনের ধারে বসে তাপ নিচ্ছে, কেউ কেউ শুয়ে পড়ছে গাছের ডালে ঝোলানো দড়ির বিছানায়। ওরা নিজেদের মধ্যে যে ভাষায় কথা বলে সেটা ধ্রুব এমনকি বিরসাও ঠিকমতো বুঝতে পারে না। দলপতি গোছের একজনের কাছে খোঁজ নিয়ে জানা গেল ওরা ধুয়া সুনারি, অঙ্গুল জেলার রাইঝরণ থেকে এসেছে।

কয়েক প্রজন্ম আগেও এই ধুয়া সুনারিরা বৈতরণী নদীর জল ছেঁচে সোনা বের করত। বৈতরণী নিঃস্ব হয়েছে, কিন্তু বংশপরম্পরায় ধাতু নিষ্কাশনের শৈলী আজও ওদের রক্তে বইছে। এখন লোহা পেতলের পাত্র রাং ঝালাই করে মেরামত করে ওরা। ফসল ওঠার এই মরশুমে শিমলিপালের দরিদ্র আদিবাসী গ্রামের মানুষের হাতেও দুটো পয়সা থাকে, ফুটোফাটা বাসনকোসন দুচারটে সবার ঘরেই থাকে। ধুয়া সুনারিরা বছরের এই সময়ে আসে, গ্রামের ধারে ফাঁকা জায়গায় দিন কয়েকের আস্তানা পাতে ওরা, তারপর অন্যত্র কাজের সন্ধানে চলে যায়।

ধাতু গলিয়ে ঝালাইয়ের পদ্ধতি দেখতে চাইলে ওদের যন্ত্রপাতিগুলো এনে দেখায়। খুবই পুরোনো আর মৌলিক গড়নের, দেখে মনে হয় কয়েক প্রজন্ম ধরে অপরিবর্তিত আছে। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়েছে, পাতলা অন্ধকারে জিনিসগুলো মিউজিয়ামের দ্রষ্টব্যের মতো দেখায়। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানুষ, গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি, এদিক ওদিক আগুনের আভায় দীপ্যমান মুখ আর দেহাংশ, কুকুরের সিলুএট... এসবই যেন জাদুঘরে প্রাগৈতিহাসিক গ্যালারির প্রেক্ষাপটে আঁকা ছবি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঁধার বনের বুক চিরে চলে গিয়েছে পথ। ফিরে যাচ্ছি, আর হয়তো কোনোদিন আসব না এই পথে। আজ কুয়াশা নেই। মোটরসাইকেলের আলোর টানে দুপাশ থেকে উড়ে আসছে জংলি পোকা, হেডলাইটের কাচে সেঁটে যাচ্ছে, চুলে জড়িয়ে যাচ্ছে— একটা কড়া বনজ গন্ধ। আকাশে অগণন তারা, মুখ তুলে ওপরদিকে তাকালে কেমন ঘোর লেগে যায়। ছুটন্ত পথের পিঠে চেপে চেয়ে থাকি এক অতল নিশ্চল অতীতে, শত শত বছর আগে নিভে যাওয়া নক্ষত্রের আলোর দিকে। এই কদিনে যে অসংখ্য সুকুমার মুখগুলো দেখেছি, তারাও এভাবেই নীরবে চেয়েছিল আমাদের দিকে, অতীত প্রজন্মের দিকে। এখন এই রাতের আকাশ যেন অপটু হাতে কাগজে পেনসিলের শিস ফুটিয়ে তৈরি, নক্ষত্ররাজি চেয়ে আছে সমাগত ভবিষ্যতে। সেখানে একজন যমুনা সামাদের ছেলে ছাপা অক্ষরের ছাঁদ দেখে ভাষা পড়তে পারবে। আকাশের জটিল সংকেতমালা কথা বলে উঠবে ওর সঙ্গে—

এই যে তুমি, ফিরে এসেছ— দেখ, আমি হলাম কালপুরুষ, আর এই যে আমি সপ্তর্ষিমণ্ডল, আর এই যে, নৈর্ঋত কোণে তাকাও, এই আমি হলাম গ্রেটবেয়ার... আমাদের চিনতে পার কি?

পারবে, একদিন ঠিক পারবে। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে, আকাশ আর ধরিত্রীর চুম্বনে জন্ম নিচ্ছে যে বর্তমান, সেখানে খোলা আকাশের নীচে গাছের ডালে ঝুলন্ত দড়ির বিছানায় শুয়ে আছে যে ধুয়া সুনারির ছেলেটা, তার মাথার ওপর সম্পূর্ণ অচেনা ছমছমে চুমকি-বসানো চাঁদোয়া থেকে চুপটুপ করে আতঙ্ক ঝরছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বারমুডার জাহাজ

ইন্দির পিসির সেই কাঁথার পুঁটলিটা মনে আছে? রাজ্যের ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো থাকত ওর মধ্যে। একটি কাঁথা বোনার জন্য বহুকাল ধরে জমিয়েছিলেন বুড়ি। কিন্তু চোখের তেজ চলে যায়, ছুঁচে সুতো পরাতেই পারতেন না, পরনের থান ছিঁড়ে গেলে গিঁট বেঁধে নিতেন। তবু পরম যত্নে পুঁটলি করে রেখে দিতেন ন্যাকড়াকানি, বর্ষার পর ভাদ্রের কড়া রোদ উঠলে মাঝে মাঝে সেগুলো খুলে উঠোনে মেলে দিতেন। ভাইবউয়ের সঙ্গে খটাখটি হলে অভিমান করে গৃহত্যাগ করার সময় ছেঁড়া মাদুর, তোবড়ানো ঘটির সঙ্গে ওই পুঁটলিও বগলদাবা হয়ে তাঁর সঙ্গে যেত।

জানো অপু, দিনের পর দিন মাঠেঘাটে চরে গঞ্জে ঘুরে কতকগুলো টুকরো টুকরো ছবি জমিয়ে তুলেছি আমি ইন্দিরের ন্যাকড়াকানির মতো। কোনো নকশি কাঁথা বুনে তুলতে পারি না তাই দিয়ে। ছবিগুলো জমা করে রাখি, নাড়াচাড়া করি, রঙগুলো ক্রমশ ফিকে হয়ে আসে।

এই ঘোরাঘুরির খরচ জোগায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের একটি বৃত্তি। কী খুঁজছি আর কী পাবার আশা করছি তার একটা আগাম ধারণা দিতে হয়, যাকে বলে প্রকল্প প্রস্তাব। কী পাওয়া গেল, কতটাই বা পাওয়া গেল, তারও খতিয়ান দিতে হয় বছরের শেষে। নতুবা পরের কিস্তির টাকা বন্ধ হয়ে যায়। তত্ত্ব আর ধারণার খোপ কেটে নিয়ে গ্রামেগঞ্জে যাই, প্রশ্নমালার খাঁচা সাজিয়ে নিয়ে যাই মানুষজনের কাছে, স্কুলপড়ুয়াদের কাছে। কিন্তু বাস্তব অনর্গল সেইসব খোপ আর খাঁচা থেকে পিছলে বেরিয়ে যায় স্কুলছুটের মতো। ইন্দিরের পুঁটলিতে জমে বাতিল কাপড়ের টুকরো (ওর মধ্যে মরা মেয়ের শাড়িও আছে), ভারি হয়ে ওঠে জগদ্দল পাথরের মতো।

বুনিয়াদি শিক্ষা নিয়ে যে নানান কাজ হয়ে চলেছে দেশ জুড়ে, সেখানে প্রায়ই লক্ষ করি একটি প্রবণতা: যেসব তথ্য পরিসংখ্যান খাঁচার নির্দিষ্ট খোপে ভরা যায় না, সেগুলো চলে যায় বাতিলের ঝুড়িতে। নয়তো থেকে যায় প্রশ্নচিহ্নের আকারে, ধাঁধার মতো।

তেমনই একটি ধাঁধা ছিল সাক্ষরতা নিয়ে, যা শিক্ষার স্তরে পৌঁছয় না। সরকারি হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে তখন সাক্ষর মেয়েদের মধ্যে এক বিরাট অংশ রয়ে গিয়েছে বিদ্যালয় শিক্ষার বাইরে। এই অসংগতি দেখে বিশিষ্ট জনতত্ত্ববিদ মহেন্দ্র কুমার প্রেমী লিখলেন—

পশ্চিমবঙ্গে এটা খুব বিস্ময়ের যে চল্লিশ শতাংশ সাক্ষর নারী কোনোরকম শিক্ষাগত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগ্যতা অর্জন করে না, আর মাত্র আঠেরো শতাংশ মাধ্যমিক সম্পূর্ণ করে। এই হার খুবই কম এবং এই রহস্যের ব্যাখ্যা প্রয়োজন।*

এত সংখ্যক নারী সাক্ষর হচ্ছে, অথচ স্কুলের চৌহদ্দির বাইরে থেকে যাচ্ছে— সব অর্থেই এ এক বিপুল অপচয়। সাক্ষরতা থেকে বুনিয়াদি শিক্ষার বিক্ষুব্ধ সমুদ্রযাত্রায় কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে তারা? জনতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে এ যেন এক বারমুডা ট্র্যাঙ্গেল, এক রহস্য যার ব্যাখ্যা মেলে না।

*

সেই রহস্য আমাকে ফের টেনে আনল লালমাটি টিলা টাঁড় পলাশ মহুয়ার দেশে। এখানে শোষিত নিঃস্ব জীবন প্রকৃতির উদার রিক্ততার মাঝে ফুটে থাকে এক বিচিত্র তীক্ষ্ণতায়। বুভুক্ষু কঙ্কালসার দেহে প্রতিটি হাড়ের গ্রন্থি যেমন দেখা যায়, তেমনই বিভিন্ন আর্থসামাজিক জোড়গুলো স্পষ্ট ফুটে ওঠে এখানে। কিন্তু এহ বাহ্য। ভেতরের কথা হল, এই অঞ্চলের এক গভীর টান যা কতকাল ধরে ঘর থেকে বের করে এনেছে আমায়। এ হল আমার প্রথম যৌবনের রোমান্টিক অ্যাডভেঞ্চারভূমি।

পুরুলিয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে সকালের ঝালদাগামী বাসে জানলার ধারে সিট পেয়ে বসার বেশ কিছুক্ষণ আগে থেকেই বাসের ইঞ্জিনটা স্টার্ট দিয়ে রেসের ঘোড়ার মতো ছটফট করে, নীচে দাঁড়িয়ে বিহারি কন্ডাক্টর হাঁকে— উরমা বলরামপুর বাঘমুণ্ডি কুশলডি ঝালদা...

কতকালের চেনা নামগুলো লোকটার শিরা-ফোলানো গলা থেকে যেন একটি একটি করে বাসার থেকে উড়ে পড়ে আশ্চর্য বর্ণময় সব পাখি, ওড়াওড়ি শুরু করে দেয় স্মৃতির আকাশে। কিন্তু পথ চলা শুরু হতে উত্তেজনাটা ঝিমিয়ে আসে। পুরুলিয়া শহর ছেড়ে কিছুদূর যেতে সেই ভাঙাচোরা রাস্তা, ধুলোয় মোড়া দেহাত, ছিটেবেড়ার চালে অপুষ্ট পুঁইলতা, দর্মার দোকানে মিয়নো তেলেভাজা, পান্তুয়ার ঘোলা রসে বোলতার শব, উনুনের ছাইগাদায় কুকুরকুণ্ডলি, লাঠি হাতে উবু হয়ে বসা আদিবাসী বৃদ্ধ— যেন কতকাল আগে আমি শেষবার আসার সময় থেকে এভাবে বসে আছে অপেক্ষায়। রাস্তার পাশে বাস দাঁড়াতে শুরু হয়ে যায় সেই চেনা হুড়োহুড়ি, দরাদরি, পিছনের মই বেয়ে বাসের মাথায় ওঠে মানুষ ঝাঁকা সাইকেল, ভেতরে বিড়ি ঘাম আর মহুয়ার তেলের গন্ধ, সিটে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো উজ্জ্বল কমলা শাড়িপরা ওরাওঁ রমণী, কাঁখে শিশু, জানলার নীচে শুকনো বমির ফোয়ারা... সেই আবহমান চেনা ছবি।

চলেছি এক পুরোনো বন্ধুর ডাকে। কয়েক বছর হল অযোধ্যা পাহাড়ের মাথায় স্কুলছুট আদিবাসী বাচ্চাদের নিয়ে একটি স্কুল চালাচ্ছে সে। পুরুলিয়া থেকে শিরকাবাদ

---

* Mahendra K Premi, *Population of India in the New Millennium: Census 2001*, National Book Trust 2006, p. 217

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে একটা বাস প্রতিদিন অযোধ্যা পাহাড়ে যায়। কিন্তু আমার মাথায় নড়ছে স্মৃতির পোকা, বাঘমুণ্ডিতে নেমে বহুকাল আগে যাওয়া একটি পথ দিয়ে পাহাড়ে উঠব বলে এই দিক দিয়ে চলেছি।

বাসটা বলরামপুর মোড় থেকে ডাইনে ঝালদার দিকে বাঁক নিতে রাস্তাটা অদ্ভুতভাবে ভালো হয়ে গেল। চওড়া মসৃণ পিচঢালা পথ, কিন্তু দুপাশে মহুয়া পলাশের বন আগের চেয়ে পাতলা হয়েছে। পথে যানবাহনও যেন বেড়েছে অনেক— পাশ দিয়ে হুস হুস করে চলে যাচ্ছে দামি গাড়ি, বেশিরভাগ এসইউভি, কয়েকটির ভেতরে চিনা কিংবা জাপানি রয়েছে মনে হল। বাঘমুণ্ডিতে পৌঁছে রহস্যটা পরিষ্কার হল। শুনেছিলাম, কিন্তু মনে ছিল না। একটি অত্যাধুনিক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি হচ্ছে অযোধ্যা পাহাড়ের ওপর। প্রচলিত অর্থে জলবিদ্যুৎ ঠিক নয় ; পাম্পের সাহায্যে জল পাহাড়ের ওপর জলাধারে তুলে প্রয়োজনমতো সেই জল ছেড়ে টারবাইন ঘুরিয়ে তৈরি হবে বিদ্যুৎ। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, ভারতে এই প্রথম, যা তৈরি হচ্ছে জাপানি প্রযুক্তিবিদদের সহায়তায়। বেশ কয়েক বছর ধরে এই নির্মাণের কাজ চলছে, আর তাতেই জায়গাটা আমূল বদলে গিয়েছে। অনেক লোকলস্কর গাড়ি ঘরবাড়ি যন্ত্রপাতি নিয়ে গমগম করছে। অনেক বছর আগের সেই ছোট্ট ঝিমধরা গঞ্জটা বদলে গিয়েছে জাদুবলে। অযোধ্যা মোড়ের চারপাশে তৈরি হয়েছে নতুন নতুন পাকা বাড়ি, তাদের সর্বাঙ্গে কাচ সেরামিক স্টেনলেস স্টিলে ভুঁইফোঁড় বৈভবের উগ্র ছাপ। গজিয়ে উঠেছে দোকানপাট, গাড়ি সারাইয়ের গ্যারেজ, টেলিফোন বুথ, খাবারের হোটেল ; চারিদিকে ছড়ানো আবর্জনা। লোকজন যাদের দেখা যায় বেশিরভাগই আদিবাসী নয়। অনেক বিহারি রয়েছে, পান গুটখার দোকানে বাজছে ভোজপুরী গান। সবকিছু ঢেকে আছে পুরু লাল ধুলোর আস্তরণে।

আমায় নামিয়ে দিয়ে বাসটা হর্ন দিতে দিতে চলে যায়। একটা ঘোর-লাগা ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। নিজেকে রিপ ভ্যান উইঙ্কলের মতো মনে হয়। এই মোড়ের কাছেই একটা মাঠ ছিল। সপ্তাহে কোনো একটা দিন সেখানে স্থানীয় আদিবাসীদের হাট বসতো। এছাড়া হাঁটুর ওপর শাড়ি পরা গ্রাম্য মেয়েরা জ্বালানি কাঠের বান্ডিল নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকত সকালভর। মোরগ লড়াই হতো হাটের দিন। সেই মাঠটাও ভ্যানিশ। স্মৃতির ফলকগুলো কিছুই আর খুঁজে পাওয়া যায় না, কেবল দূরে ওই পাহাড়টা ছাড়া। তারও গায়ে সবুজ আচ্ছাদন অনেক ফিকে হয়েছে, লাল দগদগে ক্ষত।

ধাতস্থ হবার জন্য একটি চায়ের গুমটি দোকানে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। তরুণ বাঙালি দোকানি ধূমায়িত প্লাস্টিকের কাপ এগিয়ে দিয়ে বলল—

সার্ভিস জিপটা এইমাত্র বেরিয়ে গেল, আবার সেই একঘণ্টা পরে। তবে সরকারি গাড়ি পেয়ে যাবেন, হাত দেখিয়ে উঠে পড়বেন।

আমার ভ্যাবাচ্যাকা চাহনি দেখে জিজ্ঞেস করে— আপনি সাইটে যাবেন তো ?

গন্তব্য বলতে ভীষণ অবাক হয়ে যায় সে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে— আসলে জামাপ্যান্ট-পরা ভদ্দরলোক যারাই এখানে আসে, সকলেই সাইটে যায় কিনা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই ভাবলাম বুঝি আপনিও। কিন্তু এদিক দিয়ে পাহাড়ের ওপর যাবেন কীভাবে? শিরকাবাদ দিয়ে গেলে তো বাস ট্রেকার যা হোক কিছু একটা পেয়ে যেতেন।

আমি ইতস্তত করি। ঠিক কী কারণে এদিক দিয়ে যাব বলে এসেছি, কীসের টানে, সেটা বললে ছেলেটির চোখে বিস্ময় আরও কতটা বিস্ফারিত হবে তার একটা আন্দাজ পাবার চেষ্টা করি। কিন্তু কিছু আর বলতে হয় না। তার আগেই যেন প্রায় মাটি ফুঁড়ে উদয় হয় একজন লোক— রোগামতো, মাঝবয়সি, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পরনে ঢোলা খাকি শার্ট। একটা মুদির দোকানে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমায় মাপছিল সে। জানা গেল, আমাকে নিতেই সে এসেছে অযোধ্যা পাহাড়ের মাথায় ডুমুরদি বিদ্যাশ্রম থেকে। অধমের নাম নবীন মাছোয়ারি।

আপনার গাড়িটা রাখলেন কোথায়? নবীন এদিক-ওদিক তাকায়।

গাড়ি তো আনিনি, বাসে এসেছি। এখান থেকে পায়ে হেঁটে উঠব বলে এসেছি।

এবার নবীনের বিস্মিত হবার পালা।

হেঁটে উঠবেন? বলেন কি! অনেকটা পথ যে, খুব চড়াই, রাস্তাও খারাপ। অনেক সময় লেগে যাবে।

বিস্ময়ের মধ্যেও ওর কণ্ঠস্বরে একটা চাপা উত্তেজনা টের পাই আমি।

শীত ফুরিয়ে আসছে, আবহাওয়া এখনও মনোরম। বাতাসে এমন এক চনমনে সুবাস, যা কেবলমাত্র এই লাল মাটি আর মহুয়া পলাশের দেশেই পাওয়া যায়। কিন্তু দুপুর একটায় সূর্য উঠে গিয়েছে মাথার ওপর; এবং কড়া হয়েছে। আকাশে ভাসমান মিহি ধুলোকণায় তাপ ফুটেছে।

গাড়ির রাস্তা ধরে উঠলে ডুমুরদি পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে, নবীন বলে। বনের ভেতর দিয়ে পায়ে-চলা পথ আছে চরুয়াদের। আমরা সেটাই ধরব। তার আগে কিছু সওদা করার আছে। আপনার দুপুরের খাওয়া হয়েছে?

অনেক বছর আগে এই মোড়ের ওপর একটিই ভাতের হোটেল ছিল— খড়ের চাল, মাটির দেয়াল। তার গায়ে যাত্রার পোস্টার সাঁটা ছিল, সাঁওতালি ভাষায় কিন্তু বাংলা হরফে লেখা— এতাং সাসাং লুমং শাড়ি এল কানহম জ্গাৎ কুড়ি। সেখানে ভাতের সঙ্গে পালং-কুমড়োর ঘ্যাঁট প্লাস্টিকের মগে করে পরিবেশন করেছিল মনে আছে। তবে উৎকৃষ্ট প্যাঁড়া মিলেছিল, তাতে কাঁচা কাঠের ধোঁয়ার গন্ধ। এই বিষয়ে আমাদের এক বন্ধু একটি বিচিত্র তত্ত্ব খাড়া করেছিল: এইসব গ্রামদেশে প্যাঁড়ার স্বাদ এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে বিপরীত অনুপাতে যুক্ত, বিশেষ করে মানুষদের ঘরে শিশুর জন্য দুধ কেনার সামর্থ্যের সঙ্গে। অর্থাৎ, যত প্রত্যন্ত অনুন্নত অঞ্চল, প্যাঁড়া ততই খাঁটি ও সুস্বাদু। সে যাইহোক, লাল প্লাস্টিকের টেবিল চেয়ার, বেসিন, ফ্রিজার, বলিউড তারকাদের পোস্টারে সজ্জিত ধাবা গোছের রেস্টুরেন্টটি সেই ভাতের হোটেলের উত্তরসূরি কী না বোঝার কোনো উপায় নেই।

অযোধ্যা মোড় থেকে প্রথম এক কিলোমিটার রাস্তা সোজা চলেছে সমতলে। জঙ্গল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠে গিয়েছে, পথের দুপাশে বড়ো বড়ো টিনের ছাউনি, গোডাউন। কয়েক পা যেতে মনে হল যুদ্ধক্ষেত্রে ঢুকে পড়েছি ; এক অক্ষৌহিণী সৈন্য প্রবল বিক্রমে ঝড় তুলে ধেয়ে চলেছে সবুজ পাহাড়টার দিকে— অতিকায় আর্থমুভার, পে-লোডার, সিমেন্ট মেশাইয়ের পিপে, আঠেরো চাকার ট্রাক চলেছে। সারি সারি অস্থায়ী সেনাছাউনি পড়েছে শ্রমিকদের, চারিদিকে ছড়ানো পাইপ, তার, অচেনা যন্ত্র। কয়েক মিনিটের মধ্যে সর্বাঙ্গ ঢেকে গেল পুরু ধুলোয়, তার সঙ্গে ঘাম মিশে লাল চটচটে মাটির প্রলেপ।

এই চলছে আজ দু-বছর ধরে !

প্রবল আওয়াজে গলা তুলে নবীন বলে। একটি ভারি চটের থলে কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে পিঠে ফেলে অদ্ভুত ক্ষিপ্র পা ফেলে চলে সে। ওর সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে হাঁফিয়ে উঠি আমি।

চরুয়াদের জংলি পথ শুরু হবে কখন ? চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করি। মুখের মধ্যে ঢুকে যায় একখাবলা ধুলো, জিভে উন্নয়নের সোঁদা কাঁকরে স্বাদ।

একটি সরু পায়ে-চলা রাস্তা পিচসড়ক ছেড়ে নেমে গিয়েছে, ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে বেশ কিছুদূর গিয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠেছে। চড়াই ভেঙে প্রায় শ-তিনেক ফুট ওপরে একটি ছোট্ট বসতিতে এসে পড়লাম। ভূমিজদের গ্রাম, সম্পূর্ণ জনহীন, পরিবারসুদ্ধু সকলে চলে গিয়েছে দূর দেশে জন খাটতে— নবীন জানাল। মাটির দেয়ালে চুন-কালির আলপনা ফিকে হয়েছে, চালে জড়িয়ে আছে শুকনো লাউ-কুমড়োর লতা। দেখে মনে হয় চিরকালের জন্য ছেড়ে চলে গিয়েছে বুঝি।

বসতির ওপরদিকে উঁচু শাল-মহুয়ার জঙ্গল। অতিকায় বাসাল্ট পাথরের ফাঁক দিয়ে উঠেছে পথ, কখনো হারিয়ে যাচ্ছে ঘন শিয়ালকাঁটার ঝোপে। গাছে গাছে পাতা ঝরা শুরু হয়নি এখনও, হাল্কা বাদামি হয়ে আছে বন। শুকনো ডালপাতার ফাঁকে রোদের আঙুল এক উদাস ধূসর গন্ধ উসকে তুলছে, এক পলকা আবেগ, যা মনে ছেয়ে আসার আগেই দূরাগত যান্ত্রিক শব্দে হারিয়ে যায়। বিচিত্র নিজ্‌ঝুম এই বসন্তের বন। একটিও পাখির ডাক নেই।

ঘণ্টাখানেক চড়াই বেয়ে ওঠার পর পাহাড়ের কাঁধের কাছে এসে ফের গাড়ির রাস্তা পেয়ে গেলাম। পাহাড়ের ফাটল দিয়ে একটি সরু জলধারা নেমে এসে এক জায়গায় পাথর ক্ষয়ে আঁজলা-ভর কূপের মতো হয়েছে, সেখান থেকে উপচে পড়ে হারিয়ে যাচ্ছে নীচের ঘন ঝোপঝাড়ে। আমরা হাতে-মুখে ধুলোময়লা ধুয়ে একটি ঝুলন্ত কার্নিশের মতো চাটানে এসে দাঁড়াই।

প্রায় দু হাজার ফুট উঠে এসেছি, পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে সূর্য, আমাদের পায়ের নীচে উপত্যকার বিস্তার। ফাল্গুনের অপরাহ্নের কমলাভ আলোয় ধ্বংসের ছবিটা স্পষ্ট ফুটে ওঠে : বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে সবুজের ছালচামড়া উঠে গিয়ে লাল দগদগে মাংস বেরিয়ে পড়েছে, তার ওপর হলুদ আর্থমুভারগুলো এত উঁচু থেকে জীবন্ত ক্রিমির মতো দেখায়। একটি প্রাকৃতিক নালায় বাঁধ দিয়ে বিরাট এক জলাধার তৈরি হয়েছে, তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একপাশে দেশলাইবাক্সের মতো একগুচ্ছ ইমারত। পাহাড়ের মাথায় যে দ্বিতীয় জলাধারটি তৈরি হচ্ছে, তার কংক্রিটের গার্ড-ওয়াল দেখা যায়।

ওই যে দেখুন কেষ্টবাজার নালা, নবীন আঙুল উঁচিয়ে দেখায়। পাহাড় থেকে এইরকম অনেকগুলো ছোটো ছোটো ঝর্না মিশে নালাটা তৈরি হয়েছে, বছরভর জল থাকে। এবার এইদিকে দেখুন...

প্রোজেক্ট এলাকা থেকে একটি শুকনো খাত ফিতের মতো এঁকেবেঁকে দিগন্তে ঝাপসা হয়ে হারিয়ে গিয়েছে।

ওইদিকে আমার গ্রাম, নোটনপুর। আশেপাশে বিশটা গ্রামে এই নালার জালে চাষ হতো বছরে দুটো। কিন্তু বাঁধ দেবার পর নালার জল শুকিয়ে গিয়েছে। চাষবাস প্রায় বন্ধ।

এখানে কি হতে চলেছে সেটা গ্রামের মানুষদের জানানো হয়নি ? আমি প্রশ্ন করি।

লোকে জানে কলকাতা থেকে কারেন্ট এনে ড্যামের জল ওপরে তোলা হবে, তারপর সেই জল থেকে ফের কারেন্ট তৈরি হয়ে চলে যাবে কলকাতায়। জাপানিরা এ বড়ো আজব কল বানাচ্ছে বটে !

আমি নবীনের মুখে তিক্ততার রেখা খুঁজি। ঘনায়মান ছায়া ওর মুখে। সূর্যটা ক্রমশ ফিকে গোলাপি হয়ে দূরে পাহাড়ের আড়ালে ডুবে যেতে শুরু হয়েছে। পায়ের নীচে পাথর থেকে ঠান্ডা উঠছে এবার।

কিন্তু একটা কথা আমায় বলেন তো বাবু— নবীন আমার দিকে ফিরে বলে— এখান থেকে কারেন্ট বানিয়ে যদি নিয়েই যাবে, তবে এত ফৈজৎ করে এতদূরে আনাই বা কেন ?

আমি এর কী উত্তর দেব ? বিদ্যুতের চাহিদা-ঘাটতি-যোগান সম্পর্কে যেটুকু যা জানি, সেটা ওকে বোঝানোর চেষ্টা করব ? এই পরিবেশে সেটা নিষ্ঠুর রসিকতার মতো শোনাবে কি ?

আমাদের পায়ের নীচে বিছিয়ে থাকা বিস্তীর্ণ উপত্যকার মাঝে ছড়ানো নামগোত্রহীন জনপদ। সূর্যটা ডুবে যাবার সাথে সাথেই এক আদিম অন্ধকার এসে সবকিছু ঢেকে নিচ্ছে, যেমন নিয়েছে সৃষ্টির আদিকাল থেকে। শুধু পাহাড়ের মাথায় জলাধারের নির্মীয়মাণ কংক্রিটে শেষ রক্তিম আলো লেগে আছে। এই নীচে থেকে দেখে মনে হচ্ছে যেন ইতিহাসের কোনো ক্ষমতান্ধ রাজার দুর্গপ্রাসাদ।

প্ল্যানটা ছকা হয়েছিল সত্তরের দশকে, কিন্তু এখন এটা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে জানিস— ডুমুরদিতে পৌঁছনোর পর অমিতাভ বলছিল আমায়। এখন সেন্ট্রাল গ্রিড হয়েছে, দেশের এক জায়গায় বাড়তি বিদ্যুৎ ঘাটতি আছে এমন জায়গায় পৌঁছে দেওয়া যায়। এর পাশাপাশি আরেকটা জিনিসও হয়েছে— বিদ্যুৎ এখন আর অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা নয়। বিদ্যুৎ এখন পণ্য, বিভিন্ন জোন-এ কেনাবেচা চলে সারাক্ষণ। আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই রাজ্যে, বিশেষত এই জেলায় শয়ে শয়ে গ্রাম বিদ্যুৎহীন থাকা সত্ত্বেও তাই ভিনরাজ্যে বিদ্যুৎ বেচে বছরে কয়েক হাজার কোটি টাকা লাভ করছে ওয়েস্ট বেঙ্গল পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কর্পোরেশান। ব্যাপারটা ভাব একবার! এদিকে বিদ্যুতের সাহায্যে পাহাড়ের মাথায় জল তুলে সেই জলের চাপে ফের বিদ্যুৎ তৈরি করতে যে পরিমাণ শক্তির অপচয় হবে, শুধুমাত্র তাই দিয়েই কিন্তু গোটা পুরুলিয়া জেলার প্রতিটি বিদ্যুৎহীন গ্রামে প্রত্যেকটি ঘরে অন্তত একটি করে আলো জ্বালানো যেত।

এই শেষ কথাগুলো বলার সময় অমিতাভর চোখে ফুটে উঠেছিল এক বিপন্নতা, যা আমার খুব চেনা, যা আমি প্রথম দেখেছিলাম আজ থেকে অনেক বছর আগে এখানকার এই পাহাড় জঙ্গলের মাঝে।

*

তোমাকে একটা গল্প বলি অপু। তিন তরুণের গল্প, তিন বন্ধু। সে অনেক বছর আগের কথা। তিনজনে মিলে বনের মাঝে ক্যাম্পিং করবে বলে তারা এসেছিল এই অঞ্চলে। তখন শরৎকাল, বৃষ্টিধোয়া অরণ্য উজ্জ্বল সবুজ হয়ে আছে, মাটির রং টকটকে লাল। কলকাতা থেকে ওরা একটি ছোটো তাঁবু ভাড়া করে এনেছিল, এছাড়া পুরুলিয়া শহর থেকে রেশন সংগ্রহ করেছিল। গজাবুরু পাহাড়ের নীচে দিয়ে একটি পাহাড়ি নালা বয়ে গিয়ে সুবর্ণরেখায় মিশেছে। ওদের পরিকল্পনা ছিল সেই নালার ধারে তাঁবু ফেলে দুদিন থাকার। কিন্তু স্থানীয় গ্রামবাসীরা নিষেধ করল। ওদিকের জঙ্গলে প্রায়ই হাতি চলে আসে— তারা জানাল— এছাড়া ওপরদিকে জোরে বৃষ্টি হলে পাহাড়ি নালার শুকনো খাতে আসে হড়পা বান। দুইই আসে অতর্কিতে, বিশেষত বছরের ওই সময়টায়। তখন মাঠে মাঠে ফসল পেকেছে, দূর পাহাড়ের মাথায় হস্তীযূথের মতো ফিরতি বর্ষার কালো মেঘ।

কিন্তু তরুণ রক্তে যথারীতি ছিল যৌবনের দুর্মর উদ্দীপনা ; তাছাড়া অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এতদূর এসেছিল তারা। সুতরাং একটা রফাসূত্র বের হল, এই অযোধ্যা পাহাড়ের ছায়ায়, বাঘমুণ্ডির পথের থেকে কয়েকশো মিটার ভেতরে। ঘন পলাশের বনে একটুকরো ফাঁকা জায়গায় তাঁবু পড়ল। চারদিকে জঙ্গল, অযোধ্যা পাহাড়ের দিকটায় জমি ক্রমশ উঁচু হয়েছে। ত্রিসীমানায় মনুষ্যবসতি চোখে পড়ে না।

সে অনেককাল আগের কথা, তবু আজও স্মৃতিতে অম্লান সেই চন্দ্রালোকিত পাথুরে ভূমি, ভোরবেলায় পাখির কলতান, শ্যাওলাসবুজ কাঠের ধোঁয়ার গন্ধ, অরণ্যরাত্রির শব্দ। দুটি নিটোল অনাবিল দিন কাটাল তারা সেখানে— নিজেদের খাবার রান্না করে, পাথরের খাঁজে জমা ঝর্ণার জলে স্নান করে, সন্ধ্যার পর কাঠকুটো জড়ো করে আগুন জ্বেলে, বনের লতা লাইকেন ছত্রাক গিরগিটি তন্ন তন্ন অবলোকন করে এক নিবিড় প্রলম্বিত সময়ের প্রবাহে যেন ভেসে পড়েছিল তিনজনে। তৃতীয়দিন সকালে প্রাতঃকৃত্য সেরে তাঁবুতে ফিরে এসে দেখল, চুরি হয়েছে। মানিব্যাগ ক্যামেরা ঘড়ি টর্চ ট্রাঞ্জিস্টার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেডিয়ো... সবকিছু রয়েছে যথাস্থানে, খোয়া গিয়েছে কেবল একটি কেরোসিনভর্তি জেরিক্যান।

এমন বিচিত্র চুরি দেখে প্রথমে থতমত খেয়ে গিয়েছিল তিন তরুণ। এই বিজন জঙ্গলে সামান্য কয়েক লিটার কেরোসিন চুরি করতে কে আসবে? কেনই বা এভাবে এসে দামি জিনিসপত্র, এমনকি টাকার ব্যাগ ছেড়ে শুধুমাত্র কেরোসিনের টিন নিয়ে যাবে? অনেক ভেবে তাদের মনে উদয় হল, এই দুদিনে বনের মধ্যে কোথাও শুকনো ডালপাতা পড়ে থাকতে দেখেনি তারা। জলের ধারে সবুজ ঘাসে ছাগল চরতে দেখেছে। দুপুরবেলায় গাছপালার মাঝে এক জায়গায় ঠিক যেন অনেক মানুষের সমবেত দীর্ঘশ্বাসের মতো শব্দ শুনেছে। কিন্তু সেই শব্দ অনুসরণ করে গিয়ে দেখেছে তকতকে মাটির ওপর ঝাঁটার দাগ, তার ওপর দিয়ে পায়ে-চলা পথের রেখা। রাতে ঘুমের ফাঁকে শোনা গিয়েছে ক্ষীণ মাদলের শব্দ, এমনকি ভোরবেলায় বনে পাখির কোরাসে কৃচিৎ মোরগের ডাক। এইসব টুকরো টুকরো দৃশ্য আর শব্দ ইন্দ্রিয় ছুঁয়েছে রহস্যময় সংকেতের মতো, কিন্তু পরস্পরে যুক্ত হয়ে অর্থবহ হয়ে ওঠেনি।

এতক্ষণে স্পষ্ট হল: জঙ্গলের মধ্যে মানুষের বসতি রয়েছে। মরীচিকার মতো ছায়ামানুষেরা তাদের দুর্জ্ঞেয় জীবন যাপন করে চলেছে। আচমকাই যেন একটা পর্দা সরে গেল চোখের ওপর থেকে, সেই অদেখা বনবাসী মানুষগুলোর চোখ দিয়ে জঙ্গলটা দেখতে শুরু করল তারা। এই বিশুষ্ক রিক্ত বন, এই গাছপালা, যাতে কোনো ভোজ্য ফল ধরে না, এই মাটি, যা জল ধরে না, লাল কাঁকরে রক্তচক্ষুর মতো চেয়ে থাকে। এই পলাশ মহুয়া লালমাটির দেশে অচেনা এক দেশের আভাস পেল তারা।

বনের ভেতর ওই বসতিগুলোয় যদি ঘরে ঘরে যথেষ্ট জ্বালানি থাকত, তাহলে রাত্রিবেলা তাঁবু থেকে নিশ্চয়ই আলো দেখতে পাওয়া যেত। পাতলা বন আর জমির উঁচুনীচু ঢাল থাকায় সেটাই হবার কথা। কিন্তু ওই ছায়ামানুষদের দেশে দিনের আলো ফুরিয়ে আসার সঙ্গে প্রাত্যহিকের কাজকর্ম চুকে যায়, জীবন গুটিয়ে আসে। পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে, পাখির ডাকে জাগে— এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পেল তারা।

সেই প্রথম এক বিচিত্র বিপন্নতার বোধে আচ্ছন্ন হল তিন নাগরিক মধ্যবিত্ত কলেজপড়ুয়া তরুণ। এমন দেশের কথা তাদের সিলেবাসে ছিল না।

সিলেবাসে নেই, এমন কিছু বই তোমায় পড়তে দিয়েছিলেন আড়বেলিয়া স্কুলের হেডমাস্টারমশাই। তার মধ্যে একটি ছিল আবিষ্কারের কথা। চল্লিশ হাজার বছর আগে আমাদের গুহাবাসী পূর্বপুরুষেরা পশুর চর্বি গলিয়ে পাথরের গর্তে ঢেলে প্রথম আলো জ্বেলেছিল, শ্যাওলা পাকিয়ে তৈরি করে নিয়েছিল তার সলতে। কিছু কিছু জায়গায় আবার আঠাকাঠিতে জোনাকি গিঁথে, পাইনের মোচা অথবা তৈলাক্ত মাছ শুকিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে রাতে আলো জ্বালা হতো। শেটল্যান্ড দ্বীপের বাসিন্দারা সামুদ্রিক পাখি মাটিতে গিঁথে সলতে পাকিয়ে তার গলার ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে জ্বালিয়ে নিত। এসবই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাক্‌ইতিহাস, যার কথা তুমি বইতে পড়েছ। এইসব আলো ছিল ক্ষণস্থায়ী, কটু ধোঁয়া আর দুর্গন্ধও হতো। হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের এই গ্রহের মানুষেরা তাই দিনের আলো ফুরিয়ে যাবার সাথে সাথে বাসাফেরতা পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ত। জেগে উঠত ফের ভোরের পাখির ডাকে।

সময়ের সঙ্গে ক্রমশ আলো জ্বালাবার কৌশলের উন্নতি হতে লাগল— আরও উন্নতমানের সলতে, জ্বালানি, পাত্র। ইউরোপে মধ্যযুগে মৌচাকের থেকে আহরিত মোমে স্বচ্ছ স্থির আলো জ্বলতে শুরু হয়েছে। আমাদের এই দেশেও তখন তিল রেড়ি নারকোল ইত্যাদি বীজের তেলে জ্বলছে প্রদীপ ও মশাল। তবে এইসব আলো জ্বলত মূলত কতিপয় সম্পন্ন মানুষের গৃহে। আপামর মানুষ তেল খাবে না জ্বালাবে স্থির করতে পারত না। তবু কিন্তু নগরপত্তনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য জড়িয়ে আছে আলোর প্রযুক্তির বিকাশ। আলো হয়ে উঠেছে সভ্যতার উপমেয়। তারপর এল শিল্পবিপ্লব। বাষ্পশক্তিকে বাগে এনে তৈরি হতে লাগল বিদ্যুৎ। যে রেলগাড়ি দেখবে বলে একদিন দিদির সঙ্গে ছুটেছিলে কাশের বনে, যে রেলগাড়ি একদিন তোমায় নিয়ে এল কলকাতা শহরে, সেখানে এসে তুমি প্রথম দেখলে বৈদ্যুতিক আলো। বিদ্যুতের আলোয় মাকে প্রথম চিঠি লিখলে তুমি।

AMARBOI.COM

বনের শুকনো ডালপাতায় বোনা দেয়াল, তার দুদিকে মাটির প্রলেপ, খড় কিংবা খাপরার চাল। এরকম প্রায় বিশ-পঁচিশটা ঘর নিয়ে ডুমুরদি গ্রাম। শ-খানেক লোকের বাস, সকলেই আদিবাসী। পাথুরে জমিতে সামান্য চাষ করে, গোপালন করে, বনের মধু আমলকী সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে তারা। বেশিরভাগ সমর্থ পুরুষনারী জন খাটতে বাইরে যায়।

অযোধ্যা পাহাড়ের ওপর এই গ্রামের এক প্রান্তে বিদ্যাশ্রম। বামনাকৃতি পলাশ আর পিয়ালের বনে বেশ খানিকটা পতিত সমতল জমির ওপর চওড়া একটি গ্রানাইটের চাটান— দেখলে মনে হয় যেন আকাশ থেকে বিশাল এক তাল গালা ভূমির ওপর পড়েছে। সেই চাটানে শিকড় ছড়িয়ে বেড়ে উঠেছে একটি ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছ। এই চাটান ঘিরে পাঁচটি মাটির ঘর আর তিনটি লম্বাটে দেয়ালহীন ঘাসপাতায় বোনা চালা।

মাটির দেয়ালে ভাঙা খাপরা গিঁথে তৈরি হয়েছে মুরাল ; তাতে ফুটে আছে গাছ পাখি জীবজন্তুর কল্পনা। এছাড়া একটি পাকা পায়খানা, তার পাশে কাঠের মাচায় কালো প্লাস্টিকের ট্যাঙ্ক ; কেরোসিন পাম্পে জল ওঠে। স্বাতন্ত্র্য বলতে এটুকুই। বিদ্যাশ্রমে কোনো বেড়া দেওয়া নেই, ঘরগুলো গ্রামেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে ভাবতে বাধা নেই। ঢোকার মুখে নীচু একটেরে মাটির দেয়ালে ডুমুরদি বিদ্যাশ্রমের নামটা চুন দিয়ে লেখা, রোমান হরফে।

আশ্রমে ঢুকে বাঁহাতি কুঁড়ের দাওয়ায় একটি ডিসপেনসারি ; সপ্তাহে একদিন এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডিপ্লোমাধারী ডাক্তার আসেন বলরামপুর থেকে। লম্বা চালাঘরের দুটিতে ক্লাস বসে। তৃতীয়টি, কঞ্চির রেলিং ঘেরা, খুব ছোটো শিশুদের ক্রেস। পেছনদিকে একটি টিনে-ছাওয়া গুদামের মতো ঘরে আমলকী লাক্ষা ইত্যাদি বনের জিনিস ডাঁই করে রাখা থাকে। গ্রামের লোকেদের কাছ থেকে কেনা হয়, তারপর ঝাড়াইবাছাই হয়ে চলে যায় পুরুলিয়া শহরে সমবায় বিপণিতে।

সারা দেশে তো বটেই, আমাদের এই রাজ্যেও জনসংখ্যায় নারীপুরুষের গড় হিসেবের নিরিখে আদিবাসীদের মধ্যে মেয়েদের অনুপাতটা ভালো, অমিতাভ বলছিল। এর থেকে অন্তত এটুকু বলা যায় যে এই সমাজে মেয়েশিশু সেভাবে উপেক্ষিত নয়। সেটা খালি চোখেও ধরা পড়ে। ঘরে বাইরে মেয়েরা পুরুষদের পাশাপাশি সমান তালে কাজ করে, তাদের বেশ কিছুটা স্বাধীনতাও আছে। কিন্তু তাহলে এদের মধ্যে নারী শিক্ষা সাক্ষরতার হার এত শোচনীয় কেন? আপাতভাবে এটা একটা ধাঁধা মনে হতে পারে, কিন্তু একটু খোঁজ নিলেই খুব চেনা একটা ছবি পাবি তুই। বাবা-মা ফসলের মরশুমে দূরে কাজ করতে চলে যায়, কখনো সপ্তাহ মাস গড়িয়ে যায়। বাড়ির একটু বড়ো মেয়েটা ছোটো ভাইবোনদের দেখাশোনা করে, রান্নাবান্না করে। এভাবেই কখন একদিন স্কুলছুট হয়ে পড়ে সে। এই অঞ্চলে আরেকটা খুব চালু কারণ হল ম্যালেরিয়া। সেটা কখনো প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে, তবে সাধারণত নাছোড় ঘুসঘুসে জ্বর মাঝেমধ্যেই কাবু করে বিছানায় ফেলে। দু-দশদিন কামাই করার পর ইস্কুলে গিয়ে পড়া বুঝতে পারে না। এদিকে বাড়িতেও সাহায্য করার মতো কেউ নেই। ইস্কুলে গেলে মাস্টারের বিদ্রূপ শাস্তি। একদিন যাওয়া বন্ধ করে দেয়। গল্প শেষ। এই দুটো জিনিসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে আমরা ক্রেস আর ডিসপেনসারিটা চালু করেছি। যাদের বাবামায়েরা দূরে কাজ করতে যায়, তারা ছোটো ভাইবোনদের সঙ্গে নিয়ে বিদ্যাশ্রমে আসে।

এই কাজগুলো করার কথা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের। কিন্তু ডুমুরদিতে কোনো অঙ্গনওয়াড়ি নেই। অযোধ্যা পাহাড়ের মাথায় একটি সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে বটে, কিন্তু তার হাল অনুমেয়। সামান্য ক্লোরোকুইন ট্যাবলেটই মেলে না সেখানে, তবে দেয়ালে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের স্বাস্থ্যবিধি ফলাও করে লেখা আছ, বাংলায়।

অলচিকিতে লেখা হলেও যে বিশেষ কিছু ফারাক হতো তা নয়, অমিতাভ হেসে বলে। দ্যাখ, তিন বছর আগে এই বিদ্যাশ্রম আমরা শুরু করেছিলাম আদিবাসী স্কুলছুটদের লেখাপড়ায় ফেরানোর একটা উদ্যোগ নিয়ে। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে দেখলাম, এইরকম একটা অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারটা লতায় পাতায় জুড়ে আছে আরও পাঁচটা বিষয়ের সঙ্গে। এখনও সেই জোড়গুলিকে চিনে চলেছি। শিক্ষানবিশি চলছে। ক্রেস আর ডিসপেনসারি তারই একটা ফল বলতে পারিস।

বেশ, কিন্তু আমলকী লাক্ষা কালেকশান সেন্টারের ব্যাপারটা? এর সঙ্গে শিক্ষার কী সম্পর্ক? আমি জানতে চাই।

অমিতাভ আমার দিকে চেয়ে থাকে এক মুহূর্ত, তারপর বলে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থনীতিতে অপারচুনিটি কস্ট বলে একটা কনসেপ্ট আছে, সেটা জানিস হয়তো। সুযোগের মূল্য। শিক্ষাকে যদি সম্পূর্ণ অবৈতনিক করেও দেওয়া হয়, তাহলেও কিন্তু গরিব ঘরের বাবামায়েদের একটা অদৃশ্য মূল্য চোকাতে হয়। যেমন ধরা যাক, ছেলেটা ইস্কুলে না গিয়ে যদি চায়ের দোকানে কাজ করত, কিংবা ঘরকন্নার ভার মেয়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে যদি বাবা-মা দূরে কোথাও একটু বেশি মজুরির কাজ করতে চলে যেতে পারত। মূল কারণটা অবশ্যই দারিদ্র্য। এখানে আমরা গ্রামের সেইসব লোকেদের কাছ থেকেই বন থেকে তুলে আনা জিনিস ন্যায্য দাম দিয়ে কিনছি, যারা ছেলেমেয়েদের এখান লেখাপড়া করতে পাঠাচ্ছে। এইভাবে খুব ছোটো করে হলেও সুযোগের মূল্য কিছুটা চোকাবার একটা চেষ্টা করছি।

তিন আদিবাসী নারী আমলকী কেটে রোদে শুকোনো, বোতলে ভরা, লাক্ষা ঝাড়াইবাছাই করে প্যাকেটে ভরার কাজ করে এখানে। এভাবে একটা কর্মসংস্থানও হচ্ছে। এছাড়া স্কুল ও ক্রেস-এর ছেলেমেয়েদের জন্য দুপুরের খাবার রান্না করা, ছোটো বাচ্চাদের দেখাশোনা করার কাজ করে আরও কয়েকজন। বাইরের যোগাযোগ, জিনিসপত্র আনা-নেওয়ার কাজ করে নবীন। তিনজন শিক্ষক ও অমিতাভকে নিয়ে মোট বারোজন, বেশিরভাগই আশেপাশের অঞ্চলের।

সন্ধ্যাবেলা বড়ো চালাঘরে পরিচয় হয় তাদের সঙ্গে। খেজুরপাতার চাটাই পেতে লণ্ঠনের আলো ঘিরে সবাই গোল হয়ে বসে। চা-মুড়ি সহযোগে মিটিং হয়: সারাদিনের কাজের পর্যালোচনা করা, জমে থাকা কাজের খতিয়ান নেওয়া, হিসেবনিকেশ, অভাব অভিযোগ— এটাই নিত্যকার রুটিন এখানে। কথাবার্তার খেই খুব একটা ধরতে পারি না আমি। চড়াই পথে এতটা হেঁটে আসার ক্লান্তি ঘিরে আসে জংলি ঝিঁঝিঁর তানের মতো। চারদিকে ঘন অন্ধকারের মাঝে লণ্ঠনের মৃদু আলোয় ভেসে-থাকা মুখগুলো দেখি— সজীব, আন্তরিক, মুখর, নীরব কতগুলো মুখ। রাতের বন জেগে ওঠার আগেই মুখগুলো একে একে মিলিয়ে যায় অন্ধকারে। যে যার মতো গ্রামের পথ ধরে। কেবল এক মাঝবয়সি নারী থেকে যায়। আমাদের রাতের খাবার পরিবেশন করে সে। অদ্ভুত নিঃশব্দ বনের প্রাণীর মতো পায়ে চলাফেরা তার। একটিও কথা বলে না।

ওর নাম সাবিত্রী, সাবিত্রী মুণ্ডা। ওর কথা পরে তোকে বলব। অমিতাভ বলে।

বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ শুরু হবার পর বাতাসে ভেসে আসা ধূলিকণা জঙ্গলে গাছের গোড়ায় জমছে। এর ফলে লাক্ষার যোগান কমে আসছে। একই কারণে টান পড়েছে বনে মধু সংগ্রহেও। বায়ু দূষণের জন্য, কিংবা বনের গাছে ফুল অকালে ঝরে যাচ্ছে বলে, মৌমাছিরা আর এদিকে বিশেষ আসছে না। এই নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা সকলের।

তবে বনে মৌমাছি না আসুক, প্রতিদিন সকালবেলায় এক ভিন্ন জাতের মৌমাছির দল এসে জড়ো হয় এখানে; মৌচাকের মতোই প্রাণের গুঞ্জনে ভরে ওঠে ডুমুরদি বিদ্যাশ্রম। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। মাঠে হালকা পলাশ বনের নীচে ঝরাপাতার স্তূপে ছোপ ছোপ আলোছায়া, তার ওপর দিয়ে অনেকগুলো পায়ে-চলা পথ ছড়িয়ে গিয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তালুরেখার মতো। ওরা আসে সুশৃঙ্খল সারি দিয়ে, এক হাতে থলির মধ্যে বই খাতা স্টিলের থালা, অন্য হাতে ধরা ছোটো ছোটো ভাইবোন। একটু বড়ো দিদির কাঁখে চড়েও আসে কেউ কেউ। ইস্কুল বসে ঠিক সকাল দশটায়। অনেকগুলো কচি গলায় সমবেত ছড়া আর নামতা পাঠের কিচিরমিচির ধ্বনি ছড়িয়ে যায় গ্রামের সীমানায়, মিশে যায় আর পাঁচটা প্রাকৃতিক ধ্বনির সঙ্গে। দুপুরে খাওয়ার সময় আবার পাথরের চাটানে অনেকগুলো থালার ঠনঠন শব্দ বাজতে থাকে। তেঁতুলগাছের নীচে ছুটোছুটি করে খেলা চলে কিছুক্ষণ। বিকেলের আগেই আবার থলি গুছিয়ে নিয়ে ঘরে ফেরা। এখন আর সারিবদ্ধভাবে পথ দিয়ে নয়, মাঠের ওপর দিয়ে এলোমেলো শুকনো পাতা মাড়িয়ে। অনেকগুলো কচি পায়ে পাতার মর্মর ধ্বনি যেন একঝাঁক পাখির ডানার মতো শব্দ হয়। আশ্রমটা হঠাৎ নিঝুম হয়ে পড়ে। তারপর দিন ফুরোলে ফের সেই চালাঘরে চাটাই বিছিয়ে লণ্ঠনের আলোর চারপাশে জড়ো হওয়া। চা-মুড়ির মিটিং, সঙ্গে বেগুনি অতিথির সুবাদে।

সব মিলিয়ে বেশ একটি নিপাট ছন্দ, যা অযোধ্যা পাহাড়ের এক নিভৃত কোণে বেজে চলছে গত তিন বছর। পড়ুয়াদের মধ্যে স্কুলছুট ছেলেমেয়েদের প্রাধান্য, তবে আনকোরারাও আসে। সকলেই আদিবাসী পরিবারের, সকলেই প্রথম প্রজন্মের বিদ্যার্থী। এখানে বছরখানেক তালিম নেবার পর তাদের পুনর্বাসন হয় কাছাকাছি দুটি প্রাথমিক স্কুলে।

কখনো তারা আবার ফিরেও আসে, কিন্তু সরকার পরিচালিত স্কুলের বিকল্প হয়ে ওঠার উদ্দেশ্য নয় বিদ্যাশ্রমের, সে সংস্থানও নেই।

*

মধ্য ত্রিশের সাবিত্রী মুণ্ডার লম্বা দোহারা চেহারা, মুখে বসন্তের দাগ। দিনের বেলা সে ক্রেস-এর শিশুদের দেখাশোনা করে, সন্ধ্যার পর রান্নাঘরে যোগাড় দেয়। কথা প্রায় বলেই না। সারাক্ষণ এক পাথুরে নীরবতা ওর টান-করে-বাঁধা মিশকালো চুলের মতো এঁটে থাকে সাবিত্রীকে। এত মিতবাক কেউ এত ছোটো বাচ্চাদের কীভাবে বশে রাখে সেটা একটা রহস্য। দুপুরে খাবার সময় একটি বড়ো গামলায় ভাত মেখে বাচ্চাগুলোকে গোল করে চারপাশে বসিয়ে খাইয়ে দিচ্ছে, এই দৃশ্য দূর থেকে দেখেছি। তখনকি ও কিছু বলছিল ওদের? গল্প কিংবা ছড়া? শুনতে পাইনি।

আড়শা ব্লকে সাবিত্রীর গ্রাম ছিল, স্বামীসংসার ছিল। কয়েক বছর আগে এক রহস্যময় অসুখ হানা দেয় ওদের গ্রামে (পরে জানা যায় সেটা ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া)। স্বামী ও দুই সন্তানকে হারায় সাবিত্রী। গ্রামে সালিশি সভা বসে। সেখানে বিচারে সাব্যস্ত হয় সাবিত্রীর জন্যই গ্রামে এই অসুখ এসেছে। ওকে ডাইনি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, মোটা অঙ্কের জরিমানা করে সকল গ্রামবাসীকে ভোজ দেবার নিদান হয়। দোষের মধ্যে সাবিত্রীর স্বামীর চার বিঘে চাষের জমি ছিল, আইন মোতাবেক সেটা তখন ওর। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার থেকেও একটি গুরুতর অপরাধ করে ফেলেছিল সে। জনগণনার লোকেরা যখন গ্রামে আসে, তখন সাবিত্রী মুণ্ডাকে সাক্ষর হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়।

একজন চিহ্নিত ডাইনি হিসেবে তিনটি বিকল্প পথ ছিল ওর সামনে— মৃত্যু, জরিমানা মিটিয়ে দেওয়া, অথবা গ্রাম ছেড়ে পালানো। সাবিত্রী তৃতীয় পথটি বেছে নেয়। এরপর ভাসতে ভাসতে একদিন সে চলে আসে এখানে, ডুমুরদি বিদ্যাশ্রমে। মাথার ওপর একটা ছাদ, একটা নিরাপদ আশ্রয়, একটা কাজ আর খাওয়া-পরা ; এছাড়াও মাস গেলে বেতন পায় সে, একটা সক্ষমতা তৈরি হয়েছে।

সাবিত্রীর গল্পটা হয়তো বেশ অন্যরকম, কিন্তু আবার তেমন অন্যরকমও নয়— অমিতাভ বলে। আদিবাসী সমাজে কিছু ক্ষেত্রে মেয়েদের বঞ্চনা অন্য সমাজের তুলনায় কম, আবার কিছু ক্ষেত্রে যথেষ্ট আছে।

সেটা আমি পাহাড়েও দেখেছি, আমি বলি। এমনিতে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ, সবকিছুতে মেয়েদের সক্রিয় ভূমিকা আছে, কিন্তু ঘরে বাইরে মিলিয়ে শ্রমের বোঝাটা একটু বেশিই হয়ে যায় বোধহয়। মাঝবয়সের পর থেকে সেটা ওদের চেহারায় ফুটে ওঠে।

হ্যাঁ, অমিতাভ মাথা নাড়ে। আসলে এগুলো আলাদা করে চোখে পড়ে না কেন জানিস তো? তার কারণ এটা অন্য বঞ্চনা আর দারিদ্র্যের মধ্যে মিশে থাকে, ধূসরের মধ্যে আরও কিছুটা ধূসর। আমাদের এখানে বামপন্থী রাজনীতিতে শ্রেণিবৈষম্য যতটা গুরুত্ব পেয়েছে, জাতি বর্ণ বা মেয়েপুরুষের বৈষম্যের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা হয়নি। অথচ এটা তো খুব পরিষ্কার যে এই বৈষম্যগুলো একটা আরেকটার ওপর কাজ করে। তাছাড়া পরিবার তো আর সমাজের বাইরে নয়।

ডুমুরদি বিদ্যাশ্রমে একাধিক কর্মীর জীবনে এমন একেকটি গল্প আছে, যা সাবিত্রীর মতো চমকপ্রদ না হলেও বিশিষ্ট, যে গল্পগুলো সাধারণত আমাদের নাগরিক সংস্কৃতির খড়ির গণ্ডির বাইরেই থেকে যায়। একটি ছোটোখাটো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সুবাদে সেই গল্পগুলো একটি সুস্পষ্ট বাঁক নিয়েছে এখানে।

কিন্তু মুশকিলটা কোথায় জানিস? অমিতাভ বলে— বহুকাল ধরে থিতু আর প্রান্তিক একটা সমাজ, যেখানে কোনোরকম সরকারি পরিষেবা চুঁইয়েও এসে পৌঁছয় না। এমন একটা জায়গায় পরিবর্তনটা ধরা পড়তে সময় লাগে, বিশেষ করে সেটা যদি হয় বুনিয়াদি শিক্ষার মতো একটা বিষয়। কিন্তু অনুদানকারী সংস্থাগুলো এই সময়টা দিতে চায় না। একটা প্রকল্পের সুফল পেতে শুরু হবার আগেই টাকা বন্ধ হয়ে যায়, কাজটা মাঝপথে ছেড়ে দিতে হয়। শহরে ঠান্ডা ঘরে বসে একটা ধারণা খাতায়কলমে ছকে তোলা হল, মাঠে নেমে সেটা হাতেকলমে রূপ দিতে গিয়ে ফাঁকফোকরগুলো ধরা পড়ে। তাই চলতে চলতেই আমাদের নতুন নতুন কৌশল খুঁজে বের করতে হয়। শেখাটা চলে। বলতে পারিস এটাই প্রাপ্তি। এইসব আয়োজন করে বাচ্চাগুলো কী শিখছে জানিনা, কিন্তু আমরা শিখছি। আমি শিখছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অমিতাভর কথাগুলো শুনতে শুনতে আমার মনে পড়ে যায় ময়ূরভঞ্জের সুরাই হেমব্রমের সেই কথা: মাস্টারকেও পড়ুয়া হতে হবে। পড়ুয়া পড়বে চোখ দিয়ে, মাস্টার পড়বে কান দিয়ে।

অন্ধকারে অমিতাভর মুখ দেখতে পাই না আমি, কেবল মাঝে মাঝে জ্বলন্ত সিগারেটের আলোয় ওর চশমার কাচ চিকচিক করে ওঠে। দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়ে মুখোমুখি বসে রাত গড়িয়েছে। আশ্রমে সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে। বাতাসে ঠান্ডা শিরশিরানি। চারদিকে পাহাড় জঙ্গল অদ্ভুত জীবন্ত হয়ে উঠেছে এখন। রাতের নৈঃশব্দ্য ফুঁড়ে অনেক দূর থেকে কর্কশ ধাতব শব্দ ভেসে আসছে, আকাশে একটি দিক আলো হয়ে আছে, মাঝে মাঝে চিকচিক করে উঠছে নীলাভ বিদ্যুতের ঝলকানি। পাম্প স্টোরেজ প্লান্ট তৈরির কাজ চলে সারা রাত ধরে, তারই শব্দ আর আলো।

আমার পুরোনো বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘদিন ধরে লেখাপড়া করেছে অমিতাভ। অর্থনীতিতে এমএ করার পর সোশাল ওয়েলফেয়ারে স্নাতকোত্তর, তারপর গবেষণা। কিছুকাল কর্পোরেট জগতে হারিয়ে গিয়েছিল, আবার ফিরে এসেছে। এই ফিরে আসার খেসারত দিতে হয়েছে ওকে। স্ত্রীর সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়েছে, ছেলে বড়ো হচ্ছে মামার বাড়ির আশ্রয়ে। ওর নিজেরও রক্তে উচ্চ চাপ, আর শর্করা। তবে এসব সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত অমিতাভ ওর প্রকৃত বৃত্তি খুঁজে পেয়েছে বলেই মনে হয়— এমন একটা কাজ যা আসলে শেখা, শিখে চলা।

এই শেখা শুরু হয়েছিল আজ থেকে অনেক বছর আগে, এই অযোধ্যা পাহাড়ের ছায়ায়, জঙ্গলের মাঝে এক তাঁবুতে, একটি কেরোসিনের টিন খোয়া যাওয়ার সূত্রে এই জঙ্গলের প্রকৃতি ও তার অদৃশ্য বাসিন্দাদের চোখ দিয়ে প্রথম দেখতে শিখেছিল সে। অনেককাল পরে আবার এই পরিবেশে মুখোমুখি হলাম আমরা। ভাবতে ইচ্ছে হয়, মাঝখানের এই এতগুলো বছর ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তা তো নয়। আমাদের পথ বেঁকে গিয়েছে, যে যার মতো অনেকটা চলে এসেছি, সরে এসেছি। একটি নিরাপদ জীবন, একটি বাঁধা মাইনের চাকরি করে আমি কল্পনাও করতে পারি না নাগরিক সমাজ পরিবার স্বাচ্ছন্দ্য থেকে দূরে দিনের পর দিন একটি ভাবনাকে সাকার করার জন্য এভাবে মাটি কামড়ে পড়ে থাকা, দৈনন্দিনের বৈচিত্রহীন খুঁটিনাটির মধ্যে দিয়ে ভেতরে ওই জানার খিদেটাকে মোমের মতো জ্বালিয়ে রাখা।

কিংবা রাতের এই বিচিত্র সজীব জঙ্গল। শুকনো ডালপাতায় বোনা দেয়াল, মাটির প্রলেপ চুঁইয়ে সেই জঙ্গলের শব্দ ঢোকে ঘরের ভেতর, অন্ধকারে শব্দের প্রতিমা তৈরি হয়। ঘুম আসে না। চোখ বন্ধ করে শুয়ে দূরাগত ধ্বনির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ছবিগুলোকে আলাদা করে চিনে নিতে চেষ্টা করি: আলগা খোয়াবিছানো পথে চাকার শব্দ, দ্বিতীয় গিয়ারে ইঞ্জিনের গুমর ভাঙছে চড়াই, লোহার রডের গোছা চলেছে, সিমেন্ট স্টোনচিপস মেশাই হচ্ছে ঘুরন্ত দানবিক পিপের ভেতর, সড়সড় করে ঢুকে যাচ্ছে ধরিত্রীর জঠরে, ইস্পাতের তীক্ষ্ণ নিস্বন— এই সবকিছু আমার ঘুমের কিনারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসে বদলে যায় ছুটন্ত খুরের জেরায়, পাশবিক হুঙ্কারে, বিকট মুখব্যাদান থেকে ঠিকরে বেরনো নীল বিদ্যুতে, তেঁতুলের ডালপালায় ঝিকিমিকি সিলুয়েটে। সারারাত ধরে ছেঁড়া ছেঁড়া ছবি ভেসে আসে অনর্গল। ভোরের আগে মাথার কাছে জানলায় দেখি আকাশটা নীলচে ধূসর ইস্পাতের মতো হয়ে এসেছে। আলো ফুটছে। আর তারপরেই একটা শব্দ পেলাম, খুব জোরে জোরে দীর্ঘশ্বাসের মতো।

শব্দটা চেনা। বিছানা ছেড়ে উঠে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি সারারাত হাওয়ায় তেঁতুল গাছের পাতা ঝরে ঢেকে গিয়েছে পাথরের চাটান, সাবিত্রী সেগুলো ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করছে। এত ভোরে কাকপক্ষীও ওঠেনি। খুব একাগ্রভাবে নীচু হয়ে ঝাঁট দিচ্ছে সে, চুলগুলো মাথার ওপর চুড়ো করে বাঁধা, শাড়িটা হাঁটুর ওপর তুলে পরেছে ওদের নিজস্ব ধরনে। ওকে ঘিরে হলুদ পাতার স্তূপে মুখর ধ্বনির বৃত্ত তৈরি হচ্ছে। আমি মোহাবিষ্টের মতো দেখি। এই এক নারী, সাক্ষর হবার অপরাধে যাকে ডাইনি হতে হয়েছে। এখানে গত দুদিনে বইখাতা শ্লেটখড়ির সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো কিছুর ধারেকাছেও ঘেঁষতে দেখিনি সাবিত্রীকে। এ ব্যাপারে সরাসরি কিছু জিজ্ঞেস করতে পারিনি, পাছে ও টের পায় আমি ওর জীবনের গল্প জেনেছি। কিন্তু ছোটো বাচ্চাদের খাওয়ানোর সময় কী বলে সেটা জানতে চাইলে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থেকেছে, পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটির ওপর আঁক কেটেছে।

একটি সমাজে সাক্ষর নারীদের এক বিরাট অংশ কীভাবে বিদ্যাচর্চার বাইরে থেকে যায়, সাক্ষরতা থেকে শিক্ষার দিকে যাত্রার কঠিন সমুদ্রে কীভাবে নিঃশব্দে হারিয়ে যায়, সেই রহস্যে বিস্মিত হন জনতত্ত্বের পণ্ডিতেরা। সেই রহস্যের সন্ধানে আমার এখানে আসা। পেয়ে গেলাম! সাবিত্রী মুণ্ডা সেই বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের হারিয়ে যাওয়া জাহাজ।

ভোরের আলো ফুটছে। পলকা তরল আলোর ভেতর একাকী জাহাজের মতো সাবিত্রী উঠোন সাফ করে গোবরছড়া দিতে থাকে। জঙ্ঘার ওপর উরুর ভর রেখে অদ্ভুত ভারসাম্যে দেহটা পায়ের আঙুলের পিভটে অর্ধবৃত্তাকার ঘুরে চলে উঠোনময়, আর মাটিতে স্বাভাবিক নকশা ফুটে ওঠে মাছের আঁশের মতো। এভাবে উঠোন দাওয়া সিঁড়ি গোবরাট হয়ে চলে যায় বিদ্যাশ্রমে ঢোকার মুখে একটেরে দেয়ালটার সামনে। জানু পেতে বসে সাবিত্রী, পিঠটা ধনুকের ছিলার মতো টান টান, বাঁ হাতে একট নারকোলের মালায় চুনের পোঁচড়া ডুবিয়ে কনুই ভাঁজ না করে ক্ষিপ্র অমোঘ টানে বুলিয়ে তোলে রোমান হরফের ওপর—

DUMURDI VIDYASHRAM
AYODHYA PAHAR
PURULIA

এক অপার্থিব নৈঃশব্দ্য চারদিকে। ভোর হচ্ছে, কিন্তু একটিও পাখির ডাক নেই। সূর্য উঠতে এখনও কিছু দেরি আছে। পশ্চিমাকাশে নকল সূর্যোদয়ের মতো সোডিয়াম ভেপারের আলো। ইস্পাতের ময়দানবগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঠের কপিকল

সাক্ষরতা থেকে শিক্ষার কঠিন যাত্রায় সাবিত্রী মুণ্ডা যদি হারিয়ে না যেত? যদি একটা দুটো পাস দিতে পারত সে? যদি জীবিকার টানে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়ত বাইরের দুনিয়ায়? তাহলে তাকে নিয়েও কি লেখা হতে পারত একটি আশ্চর্য উপন্যাস?

একটি আশ্চর্য উপন্যাস, একটি মেয়ে, গ্রামের মেয়ে...

আমাদের এই কাহিনির মেয়েটি— ধরা যাক তার নাম মিতালি টুডু— রাজধানী শহরে গিয়ে কাজ করেছে কিছুদিন, বাইরের দুনিয়া দেখেছে। গ্রামে ফিরে এসে নিজের রোজগারের টাকায় পাকা ঘর তুলেছে সে, আধুনিক গৃহসামগ্রীতে সাজিয়েছে। শিক্ষা মিতালিকে এগিয়ে দিয়েছে সক্ষমতা আর সাচ্ছল্যের দিকে। গ্রামটা কিন্তু থেমে রয়েছে একই জায়গায়। বিদ্যুৎ নেই, সড়ক যোগাযোগ নেই, একটি ইস্কুলবাড়ি নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে সম্প্রতি। সেই কাজ করতে আসা পাশের গ্রামের এক রাজমিস্ত্রির সঙ্গে সখ্য হল মিতালির। ব্যাপারটা গ্রামবাসীদের গোচরে এল। এমনিতেই এক প্রত্যন্ত অনুন্নত গ্রামে পড়া-লেখা দিল্লি-ঘোরা মেয়ের স্বাধীনতা আর সমৃদ্ধিতে চোখ টাটিয়ে ছিল অনেকের। তাতে ইন্ধন যোগ হল। এক্ষেত্রে যুবকটি ভিন্ন সমাজের, এবং বিবাহিত।

একটা সময় ছিল, যখন মিতালিদের সমাজে একধরনের সাম্য ছিল। গ্রামে প্রায় কারোর ঘরেই না থাকত দরজায় আগল, না কোনো তালা বা সিন্দুক। ওসব দেখা যেত ভূস্বামী মহাজনদের ঘরে। কিন্তু দিনকাল বদলেছে। বিদ্যুৎ কিংবা পাকা সড়ক না থাক, বাইরের দুনিয়া তার চোখধাঁধানো জৌলুস আর ক্লেদ নিয়ে আসার পথ ঠিকই খুঁজে নিয়েছে। গ্রামে বেশিরভাগ মাটির ঘর, টালিখাপরার চাল। তার মাঝে মিতালির পাকা ঘর চোখে পড়ার মতো। সেখানে ব্যাটারিচালিত টিভি সেট, ভিসিডি প্লেয়ার, মিউজিক সিস্টেম— এসবই দিল্লি থেকে আনা, নয়ডায় তৈরি সস্তা নকল ব্র্যান্ডের জিনিস। এছাড়া খাটের পাশে তাক-বসানো আয়না, তাতে সাজানো প্রসাধনসামগ্রী— গঞ্জশহরে বউবিটিদের যেমন থাকে। গ্রামে কানাকানি হয়, বিছানায় শুয়ে থাকলে নাকি আয়নায় প্রতিবিম্ব দেখা যায়।

আটঘাট বেঁধে একদিন দুপুরবেলা মিতালি ও তার প্রেমিককে ধরা হল নির্জন ঘরে। সালিশি সভা বসল। একটি শিমুলগাছে পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হল দুজনকে। সেখানে উপস্থিত গোটা গ্রামের প্রায় শ-তিনেক নারী ও পুরুষ। গ্রামের মেয়ে আর বহিরাগত পুরুষ বিবাহবহির্ভূত সংসর্গ করছে, এই অপরাধে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জরিমানা ধার্য হল একেকজনের ওপর। সারারাত গাছে বেঁধে রাখা হল দুজনকে, পালা করে পাহারা দিল গ্রামের ছেলেছোকরার দল।

পরদিন সকালে জরিমানা মিটিয়ে দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল যুবকের পরিবার। কিন্তু রাতারাতি অতগুলো টাকা মিতালিরা জোগাড় করতে পারেনি। বিচারে তাই দণ্ড হল গণধর্ষণের।

প্রৌঢ় থেকে সদ্যতরুণ, সর্বমোট তেরোজন। সকলেই গ্রামবাসী, সকলেই আজন্ম পরিচিত। মোড়লের বাড়ির উঠোনে তালপাতার নীচু ছাউনির ভেতর শান্তিপর্ব সমাধা হয়েছিল।

তেরোজন বিভিন্ন বয়সের পুরুষ ধর্ষণ করছে এক নারীকে, তারা কেউ প্রশিক্ষিত সৈনিক নয়। যুদ্ধকবলিত অঞ্চলে যেমন হয়, অর্থাৎ শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে লাইন দিয়ে তারা এই কাজ করেছে এমন নয়। প্রায় সারাদিন ধরে ঘটেছে এই ঘটনা (পুলিশের বয়ান অনুসারে ছ-ঘন্টা ধরে)। প্রথমে আর্ত চিৎকার, তারপরে অসহায় গোঙানির শব্দ শুকনো তালপাতার দেয়াল চুঁইয়ে সারাদিন ধরে ঘুরপাক খেয়েছে একটি আদিবাসী গ্রামের গলিপথে, ভিটের ধারে সবজির বাগানে, মেটে দাওয়ায় ফসলের গোলায়, মুরগিঘরের পাশে ছাঁচতলায়, ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশের মাঠে। সারাদিন বাইরে খাঁ খাঁ করেছে শীতের দুপুর, মাঠে হলুদ সর্ষের ফুল, মৌমাছির ভোঁ ভোঁ শব্দ। গ্রামের মানুষ লিপ্ত থেকেছে তাদের দৈনন্দিন কাজের ছন্দে, মাঠে জমিতে নিড়েন দিয়েছে, মেয়েরা শুকনো ডালপাতা এনে জড়ো করেছে উনুনের পাশে, রোদে পিঠ দিয়ে চাটাই বুনেছে গ্রামের আতুরি বুড়ি, খোটায় বাঁধা গরু সারাদিন ঘাস খুঁটে খেয়েছে সাঁইবাবলার ঝিরিঝিরি ছায়ায়। একটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক দিন। কেবল ওই শব্দটা— কুয়োর ওপর কাঠের কপিকলে দড়ির ঘর্ষণের মতো স্নায়বিক শব্দটা সারাদিন ধরে বেজে গিয়েছে নেপথ্যে। বেলা যত বেড়েছে, জল ক্রমশ ফুরিয়ে এসেছে কুয়োয়, আর্তস্বর ততই প্রলম্বিত হয়েছে। তারপর একসময় থেমে গিয়েছে, ডুবে গিয়েছে অতল অচৈতন্যে।

সেদিন সারাদিন বাচ্চাগুলো কী করছিল সেটা আর জানা যায়নি। ওদের ছাগল চরাতে পাঠানো হয়েছিল কি দূরের মাঠে? গ্রামে ইস্কুলটা চালু হয়নি তখনও।

ঘর জ্বালিয়ে দেবার শাসানি ছিল, তবু থানায় গিয়েছিল মিতালির পরিবার ; ঘটনার দুদিন পরে। নিরাপত্তার জন্য ওদের পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়। এরপর পুলিশ যখন গ্রামে গেল (গাড়ি যাবার মতো রাস্তা ছিল না, মাঠঘাট পায়ে হেঁটে যেতে হয়), তিরধনুক সড়কি বল্লম নিয়ে বাধা দিয়েছিল গ্রামবাসীরা। তাদের বক্তব্য ছিল— প্রকাশ্য সালিশিসভায় বিচার হয়েছে, ধর্ষকেরা কেউ অপরাধী নয়। গ্রামসমাজে প্রচলিত আইনে নাক গলাতে আসবে কেন রাষ্ট্রের আইন?

কিন্তু রোখা যায়নি, কারণ ততদিনে ঘটনাটা রাজ্য এমনকি দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক খবর হয়ে উঠেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার উপাদানও ছিল যথেষ্ট। আদিবাসী সমাজে কিছু কিছু পশ্চাৎপদ রীতিনীতি থাকলেও সাধারণভাবে এখনও নারীপুরুষে এক ধরনের সাম্য আছে, যৌন অপরাধের প্রবণতাও বিরল। সেখানে এমন একটি ঘটনায় স্বভাবতই হতবাক হয়েছিল সকলে। জানা যায়, সালিশি সভায় গ্রামের প্রবীণ মোড়ল (যিনি প্রাক্তন পঞ্চায়েতপ্রধানও বটে) বলেছিলেন— টাকা দিতে পারবে না যখন মজা লোটো সবাই মিলে! মোবাইলে গোটা ঘটনার ছবি তুলেছিল গ্রামেরই কেউ (পরে আদালতে বিচার চলাকালীন সেটি সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসেবে কাজে লাগে)।

এই হল মিতালি টুডুর আশ্চর্য উপন্যাস... বিচিত্র, হৃদয়বিদারক।

বলতে পার অপু, এই উপন্যাস আমরা কীভাবে পড়ব? বর্বরতার অন্ধকারে ডুবে থাকা এক প্রত্যন্ত জনজাতি গ্রামের কাহিনি, যেখানে আধুনিক সভ্যতা প্রবেশ করার চেষ্টা করেছিল একটি ইস্কুলের ভেতর দিয়ে? নাকি 'সভ্য' সমাজের এক ব্যাধি, যা নারীকে অর্থের সাপেক্ষে ভোগ্যপণ্য হিসেবে মূল্যায়ন করে, বিদ্যুৎ কিংবা সড়ক যোগাযোগ ছাড়াই তা কীভাবে সর্বত্রগামী হয়, কীভাবে একটি সমাজকে ভেতর থেকে বদলে দেয়? একটি মানুষ এখানে সমাজচ্যুত হল? নাকি একটি সমাজ মনুষ্যত্বচ্যুত হল? বিচারে তেরোজন ধর্ষকের শাস্তি হয়েছে। কিন্তু আস্ত একটা গ্রামসমাজকে কীভাবে শাস্তি দেওয়া যাবে, বলতে পার?

মিতালি টুডু গ্রামে ফিরতে পারেনি। একটি সরকারি হোমে ঠাঁই হয়েছে তার। হোমটি চালায় রাজ্যের নারী ও সমাজকল্যাণ দপ্তর। ভবঘুরে, মানসিক প্রতিবন্ধী, যৌনকর্মী থেকে শুরু করে সব ধরনের সমাজ-ছুট নারীদের ঠাঁই হয় সেখানে।

*

আমি যাবার কিছুকাল পরে বন্ধ হয়ে যায় ডুমুরদি বিদ্যাশ্রম। সেবার এপ্রিল মাস থেকে সাংঘাতিক জলকষ্ট শুরু হয় ওখানে। আগে প্রবল অনাবৃষ্টিতেও যে পাহাড়ি ঝর্নাগুলোয় জল থাকত, সেগুলো সব শুকিয়ে খটখটে হয়ে যায়। এছাড়া একটি নতুন সমস্যা দেখা দেয়। মাওবাদীরা প্রভাব বিস্তার করে অযোধ্যা পাহাড়ে। তারা আশ্রম বন্ধ করে দিতে বলে, কারণ এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো নাকি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের হাত শক্ত করে।

এসবই অমিতাভ ফোনে জানিয়েছে আমায়। ইতিমধ্যে ওর ঠিকানা বদল হয়েছে। সুন্দরবনে একটি জীবিকা সংক্রান্ত প্রকল্পে যুক্ত হয়েছে সে, ভাগীরথীর মোহনার কাছে কয়েকটি দ্বীপ জুড়ে ওর কাজের ক্ষেত্র। লালমাটির দেশে দারিদ্র্য আর বঞ্চনার মধ্যে ডুবে থাকা মানুষজনের থেকে এ এক সম্পূর্ণ ভিন্ন বাস্তব। এখানে ডুবে যাওয়া ব্যাপারটা প্রতীকী নয়, আক্ষরিক। সমুদ্রে জলস্তর বাড়ছে, ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে সুন্দরবনের অনেকগুলো জনবসতিপূর্ণ দ্বীপ— অমিতাভ জানিয়েছিল।

নবীন মাছোয়ারিকে এই নতুন প্রকল্পে কাজ দেওয়া গেছে, দায়িত্ব বেড়েছে তার। সাবিত্রী মুণ্ডা পুরুলিয়া শহরে একটি সরকারি হোমে পরিচারিকার কাজ পেয়েছে। হোমটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চালায় রাজ্যের নারী ও সমাজকল্যাণ দপ্তর। ভবঘুরে, মানসিক প্রতিবন্ধী, যৌনকর্মী থেকে শুরু সব ধরনের সমাজ-ছুট নারীদের ঠাঁই হয় সেখানে।

বেশ কিছুকাল ধরে আনাগোনা চলছিল। তারপর জঙ্গলমহল থেকে তাড়া খেয়ে ঝাড়খণ্ডের মাওবাদীরা এসে ঘাঁটি করল অযোধ্যা পাহাড়ের নীচে জঙ্গলে। যেন এক জটিল ম্যালেরিয়ার জ্বরে কেঁপে উঠল রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল।

সূক্ষ্ম অদৃশ্য বীজাণু, যা লোকচক্ষুর অগোচরে নিঃসাড়ে প্রবেশ করে শিরাধমনিতে, রক্তে বহমান কোষে সওয়ার হয়, বংশবিস্তার করে, ক্রমশ ছড়িয়ে যেতে থাকে কোষ থেকে কোষে দীর্ঘকালের অপুষ্টি আর রক্তাল্পতার কারণে ভেতর থেকে তেমন কোনো প্রতিরোধ থাকে না, বরং হয়তো আবাহন থাকে, সংক্রমণের জন্য জমি তৈরি হয়ে থাকে, একটি জীবন্ত সমাজদেহ তৈরি হয়ে থাকে ভেতর থেকে ফেটে পড়ার জন্য। বীজাণুগুলো ধীরে ধীরে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পৌঁছে যায়, তাদের অকেজো করে দিতে থাকে, দেহতন্ত্রের শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে। আক্রান্ত কোষেরা বিচিত্র আচরণ শুরু করে দেয়, ঝিল্লি ভেদ করে দূষিত রক্তরস জমা হতে থাকে, স্ফীত হয়ে ওঠে শিরা উপশিরা। তারপর একসময় ফেঁসে যায়, রক্তক্ষরণ ঘটে।

দূষিত থকথকে রক্ত গলগল করে বেরিয়ে আসছে, টিভির পর্দা চুঁইয়ে জমে উঠছে আমাদের শৌখিন নাগরিক ড্রয়িংরুমে, সেগুনের কার্পেটে, গ্রামে গ্রামে টহল দিচ্ছে আধাসেনা, পুকুরপাড় বাঁশবন নারকোলগাছের সারির পাশ দিয়ে, পাকা ইস্কুলবাড়িগুলো হয়ে উঠছে সেনাছাউনি, প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাতারাতি জাদুবলে তৈরি হয়ে যাচ্ছে ঝাঁ-চকচকে পাকা সড়ক, তার ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে মাইননিরোধী সাঁজোয়া গাড়ির কনভয়, আকাশে উড়ছে হেলিকপ্টার, তার থেকে ঝরছে গোছা গোছা লিফলেট, বাংলা আর অলচিকি হরফে লেখা, শুনশান গ্রাম, গাছ কেটে রাস্তার ওপর আড়াআড়ি ফেলে রাখা, লালমাটির দেয়ালে সাঁটা খবরের কাগজে আলতা দিয়ে লেখা পোস্টার, দর্মার ফাঁকে সন্ত্রস্ত চোখ।

দেশের পেটের ভেতর থেকে ফেটে বেরিয়ে আসা এ এক অচেনা দেশ, অপু। এই দেশ তুমি দেখনি।

*

বেশ কিছুকাল পরে আবার গেলাম অযোধ্যা পাহাড়ে। ততদিনে ওই অঞ্চলে পরিস্থিতি যাকে বলে 'স্বাভাবিক' হয়ে আসছে। গ্রামের ইস্কুল থেকে আধাসেনার দল ফিরে গিয়েছে, ঘুম ফিরে এসেছে জল-শুকনো চোখে, ভাতের-দলা-পাকানো মুঠি ফিরেছে অভুক্ত মুখে, মানুষগুলো ফিরে এসেছে ছেড়ে-যাওয়া গ্রামে, আগাছা-ছাওয়া ফসলের মাঠে, বাথানে ফিরেছে চরুয়ারা। কেবল একটি গ্রামের ধারে পলাশবনের মাঝে একটি তেঁতুল গাছের ছায়ায় কয়েকটি খড়ের ঘর পোড়ো হয়ে পড়ে আছে। মাটির দেয়ালগুলো উইয়ের ঢিপি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে উঠেছে, ভেতরে লতাপাতার বাঁধন ফোঁপরা। গ্রামের বাচ্চারা কেউ আর এদিকপানে আসে না। মাঠের ওপর দিয়ে পায়ে-চলা পথগুলো ঘাসের নীচে হারিয়ে গিয়েছে। পাথরের চাতালে সারাদিন ধরে উড়ে এসে জমে একরাশ বাদামি ঝরা পাতা, চৈতালি হাওয়ায় ঘূর্ণিতে পাক খেয়ে ওড়ে লাট্টুর মতো, একটা গিরগিটি লাফ দিয়ে সরে যায়, তেঁতুলের পাতার আড়ালে দাঁড়কাক ডেকে ওঠে। অনেক দূর থেকে কাঠের কপিকলে দড়ি টানার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ ভেসে আসে।

অযোধ্যা পাহাড়ে পর্যটকেরা ফিরতে শুরু করেছে আবার। দুচারটে দোকানপাট ফের খুলেছে। আমরাও গেলাম পর্যটকের মতো, পুরুলিয়া শহর থেকে গাড়ি ভাড়া করে। টুর্গা ফলস বামনী ফলস আর ময়ূর পাহাড়ের সঙ্গে পর্যটনের নতুন পয়েন্ট তৈরি হয়েছে—পাম্প অ্যান্ড স্টোরেজ প্রজেক্টের আপার ড্যাম। পাহাড়ের মাথায় বিস্তীর্ণ লেকের মতো টলটলে জলাশয়, তার বুকে প্রতিফলিত পাহাড়টা ন্যাড়া বাদামি।

মাঝরাতে বনবাংলোয় কুকুরের ডাকে ঘুম ভেঙে যায়। মনে হয় যেন বিভিন্ন দিক থেকে একসঙ্গে অনেকগুলো কুকুর ডাকছে, পাহাড় থেকে পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়ছে ধ্বনি প্রতিধ্বনি। আধাসেনার একটি নাগা ব্যাটালিয়ান ঘাঁটি গেড়েছে বাঘমুণ্ডিতে, এখানে এসে শুনলাম জওয়ানরা নাকি রাস্তার কুকুর ধরে ধরে শিকার করছে। খবরটা রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছে কুকুরদের পাড়ায় আর ওই অঞ্চলের যত বেওয়ারিশ পথের কুকুর ঝেঁটিয়ে পালিয়ে গিয়েছে জঙ্গলে। ওরা আবার বন্য হয়ে পড়েছে কি? কে জানে! গভীর রাতে কুকুরের কোরাস আর বাংলোর দেয়ালে ছোঁয়ের মুখোশ বিস্ফারিত চোখ জ্বেলে পাহারা দেয় অনিদ্রার প্রহর।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় অধ্যায়

ম্যাটিনি শোয়ের বেল

আমি জন্মানোর আগেই নাকি আমার নাম ঠিক করে রেখেছিলেন আমার মা— অপু। সেই নামটা আমায় দেওয়া হয়নি।

ওই নামটা বড়ো অলক্ষুণে, আমার ঠাকুমা নাকি বলেছিলেন। ওই নামের ছেলেরা জীবনে দুঃখী হয়।

অপুর কাহিনি তিনি পড়েছিলেন কিংবা দেখেছিলেন কী না জানা যায় না। তবে দাদুর মৃত্যুর পর আমাদের বাড়িতে ছিল ঠাকুমার একচ্ছত্র দাপট। মা ছিলেন সংসারে নীরব ছায়ার মতো। তবু তারই মধ্যে নিজস্ব একটা জগৎ বানিয়ে নিয়েছিলেন। সেই জগৎটা ছিল বই, নবকল্লোল পত্রিকা আর একটি মারফি রেডিয়ো দিয়ে তৈরি। একটু বড়ো হবার পর সপ্তাহে তিনদিন আমার কাজ ছিল পাড়ার লাইব্রেরি থেকে মায়ের জন্য বই নিয়ে আসা। অপু নামটা যে তাঁর সেই পাঠজগৎ থেকে এসেছিল, সেটা সেই বয়সেই বুঝতে পেরেছিলাম।

মায়ের সাহিত্যপ্রীতির উৎসাহী সমর্থক ছিলেন দাদু। স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বের সংঘাত ছিল আজীবন। হয়তো সেই কারণে ঠাকুমা এই বই পড়ার নেশাকে সন্দেহের চোখে দেখতেন ; অপু নামটা শোনামাত্রই খারিজ করে দিয়েছিলেন।

অপু নামটা হয়নি, তবু আড়ালে কখনোসখনো আমায় অপু বলে ডাকতেন মা। হয়তো শীতের ঘুমবিজড়িত সকালে বিছানার ওম থেকে ডেকে তোলার সময়, কিংবা খেলতে গিয়ে ছড়ে যাওয়া হাঁটুতে ওষুধ লাগিয়ে দিয়ে, হাতে জ্বরের পথ্যর বাটি ধরিয়ে চুল এলোমেলো করে দেওয়া আদরে... এসবই ছিল মা-ছেলের পরম একান্ত মুহূর্ত, পালকের মতো হালকা আর অনির্বচনীয় আলোয় ভরা।

গোরা, শ্রীকান্ত কিংবা দেবদাসকে পেছনে ফেলে অপু আবহমান বাংলা সংস্কৃতির সবচেয়ে জনপ্রিয় চরিত্র, কিন্তু অপু নামটা কখনোই সেভাবে জনপ্রিয় হয়নি। সেটা বোধহয় তার সকরুণ জীবনসংগ্রামের জন্যই। যুগে যুগে বাঙালি জপ করে এসেছে একটিই মন্ত্র— আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।

দুধ আর ভাত। আমরা দেখি, ছটফটে বালক অপুর পিছু পিছু দুধমাখা ভাতের থালা নিয়ে ছুটছে মা সর্বজয়া। বিফল হয়ে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিতে দিতে বলছে— মণ্ডা না মেঠাই না, দুটো দুধ আর ভাত! তাও খাবিনে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবুও গরিব ব্রাহ্মণগৃহে দুধ অতি মহার্ঘ বস্তু, হয়তো সেই বৈদিক যুগ থেকেই। সম্পন্ন শিষ্য লক্ষ্মণ মহাজনের বাড়ি যাবার সময় হরিহর অপুকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। বাড়িতে থেকে কিছু খেতে পায় না ছেলেটা, বাইরে বেরোলে তবু দুধটা ঘি-টা পাবে। নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে কাশীতে আসার পর একটু সুদিনের মুখ দেখার ছবি স্মরণীয় হয়ে আছে হরিহরের দুধ পানের দৃশ্যে। সর্বজয়ার নির্দেশে রান্নাঘরে ঢুকে উবু হয়ে বসে গদগদ মুখে দুধের বাটি তুলে নেয় সে, ওপরের সরটুকু আঙুল ঘুরিয়ে তুলে মুখে পুরে পরম তৃপ্তিতে বাটিতে চুমুক দিয়ে শেষ করে, তারপর উঠোনের কলে বাটি ধুয়ে জল পান করে ধুতির খুঁটে ঠোঁট মোছে।

এই সুদিনের সম্ভাবনা নিশ্চিন্দিপুরেও ছিল। অপু জন্মাবার পর রাঙী গাই এসেছিল গোয়ালঘরে। জীবনে প্রথম পাঠশালায় যাবার দিন বাটি উপুড় করে দুধ খায় অপু। কষ বেয়ে কয়েক ফোঁটা দুধ গড়িয়ে পড়ে, ঠোঁটের ওপর ফোটে দুধের গোঁফ। দুর্গাকে আমরা দুধ পান করতে দেখিনি, তবে ধলা বাছুরের গলা আগলে ধরা কিশোরী দুর্গার ছবি ভোলবার নয়।

দুর্গাকে দুধপান করতে দেখিনি, পাঠশালায় যেতেও দেখিনি। দুর্গা কি নিরক্ষর ছিল? কে জানে। ইন্দির ঠাকরুনের কাছ থেকে মুখে মুখে ছড়া কাটতে শিখেছিল সে। এছাড়া সামান্য গণিতের জ্ঞানও নিশ্চয়ই ছিল। যখন সে খুব ছোটো, সদ্যোজাত অপু দোলনায় দুলছে আর দড়িতে টান দিতে দিতে ঝিমধরা গলায় গান গাইছে বুড়ি ইন্দির, দুর্গাকে পা ছড়িয়ে বসে তেঁতুলবিচি গুনে খেলা করতে দেখেছি। এক কালবৈশাখীর দুপুরে আম কুড়োতে গিয়ে বৃষ্টিতে ঝুপুস ভিজল ভাইবোন। জ্বরে পড়ল দুর্গা। অপুর কিছু হয়নি। দুর্গা মারা গেল।

সারাদিন এর ওর বাগান থেকে চুরি করে কুড়িয়ে আনা পিয়ারা নোনা কাঁচা আম থেকে যদি আরেকটু ভিটামিন পেত দুর্গা, যদি ম্যালেরিয়ার প্রকোপ থেকে সেরে উঠতে পারত সে, তাহলে সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে পরের ফাল্গুনেই হয়তো ওর বিয়ে হয়ে যেত। যেমন হতো, যেমন হয়। আর তারপর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই মা হতে পারত দুর্গা। যেমন হয়ে থাকে। সেই ভবিতব্যর জন্য অপেক্ষা না করে খসে গেল সে, সলতেখাগীতলায় ঝড়ে পড়া কাঁচা আমের মতো।

একদিন ওদের রাঙী গাইয়ের বাছুরটা হারিয়ে গেল। তাকে খুঁজতে খুঁজতে দক্ষিণের মাঠে ধু-ধু কাশের বনে জীবনে প্রথম রেলগাড়ি দেখল অপু। দুর্গা দেখতে পায়নি। সে রয়ে গেল কাশবনের আড়ালে, রয়ে যাবে, যেখানে গ্রামের পথ বেঁকে এসে সোনাডাঙার মাঠে গিয়ে উঠেছে, সেখানে পথের মোড়ে বুড়ো জামগাছটার তলায় দাঁড়িয়েই থাকবে অনন্তকাল।

খুব ছেলেবেলায়, তখনও ইস্কুলে যেতে শুরু করিনি, মা-পিসি-কাকিমাদের সঙ্গে ম্যাটিনি শোয়ে সিনেমা হল-এ গিয়ে রুপোলি কাশের বন চিরে রেলগাড়ি ছুটে যাবার সেই বিখ্যাত দৃশ্য আমি প্রথম দেখি। আমাদের মফস্‌সল শহরের সিনেমা হল-এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেডিজ গ্যালারিতে আমার টিকিট থাকত না। মা পিসিদের কোল থেকে কোলে স্থানান্তরিত হতে হতে, কখনো বা সিটের মাঝে দাঁড়িয়ে সামনে মাথার জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে ছায়া আর ছবিগুলো জুড়ে জুড়ে একটি কাহিনি গেঁথে তুলতে পারতাম না আমি তখনও। কিন্তু দৃশ্যগুলো স্মৃতিতে খোদাই হয়ে যেত। সেই স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে যেত জর্দার সুগন্ধ। কেবল সিনেমা দেখতে আসার সময় জর্দাপান খেতেন মা। এই পান খাওয়া, ঠাকুমার ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে ননদ-জায়ের সঙ্গে ম্যাটিনি শোয়ে সিনেমা দেখতে আসার মধ্যে কোথাও একটি অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ ছিল। সেই অ্যাডভেঞ্চারে শামিল হতাম আমি। স্কুলে যেতে শুরু করার পর সেটা বন্ধ হয়ে গেল।

আর তার কিছুদিনের মধ্যে শৈশবের সেই আম আঁটির ভেঁপু বইয়ে অক্ষরগুলো সবাক হয়ে উঠল, আর কাশবনে ছুটন্ত সেই বালকবালিকা, সেই দিগন্ত ঝেঁপে ছুটে আসা রেলগাড়ি, তার মাথায় উড়ন্ত ধোঁয়ার নিশান খোঁজার দিন শুরু হল আমার।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নোনা জল, আঁশটে বাতাস

বাদাবনে তখন আলো কমে এসেছে, সন্ধ্যা হয় হয়, ভাটা চলছে। একটা দ্বীপে এসে আটকে পড়েছিলাম আমরা। আমাদের নৌকোটা জল থেকে প্রায় দশ হাত ওপরে কাত হয়ে গিঁথে আছে। এক হাঁটু দঁক কাদা ঠেলে গলুইয়ে উঠে জোয়ার আসার জন্য অপেক্ষা করছি আমরা কয়েকজন। দুপাশে খাঁড়ির গভীর দেহ বেরিয়ে এসেছে ঘন শিকড়ের নীচে। মাটির গায়ে জল সরে যাবার দাগ অনেকটা যেন পেলব চামড়ায় আঁটো অন্তর্বাসের ছাপের মতো। তার ওপর দিয়ে পীতবর্ণ কাঁকড়ার ছোটাছুটিতে শিহরিত হচ্ছে দ্বীপভূমির নোনা ত্বক, আঁশটে বুনো গন্ধ উঠছে। গোটা জঙ্গলটাই জীবন্ত হয়ে উঠেছে বুঝি, দমবন্ধ করে অপেক্ষা করছে ভাটা শেষ হয়ে আসার জন্য। মনে হয় যেন পৃথিবীর শুরুর প্রহর, সৃষ্টির আঁতুড় ঘরে বসে আছি আমরা, অপেক্ষা করছি। আমাদের কথা ফুরিয়ে আসে। গাছপালা নিথর নিশ্চুপ।

আর তখনই দেখতে পেলাম তাকে। সরু পাশখালে, যেদিকটায় জঙ্গল ঘন হয়ে ঝুঁকে এসেছে জলের ওপর, একটা ছোট ডিঙি নৌকোয় এক বালক, গলুইয়ের ওপর পা ছড়িয়ে বসে তন্ময় হয়ে সরু নাইলনের জাল থেকে কী যেন বেছে হাঁড়িতে তুলছে। সম্পূর্ণ একা, যেন এক অচেনা গ্রহের একমাত্র অধিবাসী সে।

হয়তো আমাদের বিস্মিত চাহনি তরঙ্গের মতো ওর ইন্দ্রিয় স্পর্শ করেছিল, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে দেখতে পেল আমাদের। আর আচমকা যেন খুব ভয় পেয়ে গেল সে। জাল ফেলে রেখে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল ছইয়ের ভেতর, দর্মার ফুটো দিয়ে একটি বিস্ফারিত চোখ দেখতে লাগল আমাদের।

আমার চিনতে ভুল হয়নি, এই চোখ আমি আগে দেখেছি। ছেঁড়া কাঁথার ফাঁক দিয়ে এভাবেই তুমি তাকিয়েছিলে অপু, রুপোলি পর্দা জুড়ে ভেসে উঠেছিল সুকুমার চক্ষু। সেটা ছিল প্রথম পাঠশালায় যাবার দিন। কাচা পোশাক পরিয়ে পরিপাটি করে চুল আঁচড়ে দিয়েছিল সর্বজয়া, তারপর দুর্গা হাত ধরে গ্রামের পথে পৌঁছে দিয়েছিল প্রসন্ন গুরুমশাইয়ের পাঠশালায়। দুর্গা নিজে কোনোদিন পাঠশালায় যায়নি।

তার কিছুকাল আগে জাতিসঙ্ঘের একটি প্রতিবেদনে বের হয়েছিল এক বিচিত্র তথ্য: সুন্দরবনের অনেকগুলো ব্লকে স্কুলের উঁচু ক্লাসে ছাত্রের তুলনায় ছাত্রীর সংখ্যা দ্বিগুণ।* সাধারণভাবে এদেশে সর্বত্রই ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের স্কুল-ছুটের হার

---

* West Bengal Human Development Report 2004, United Nations Development Programme, পৃষ্ঠা ৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশি, উঁচু ক্লাসে সেটা বেড়ে যায় কয়েকগুণ। তার কারণগুলো অজানা নয়। তাহলে সুন্দরবনের মতো অনুন্নত প্রান্তিক অঞ্চলে ভিন্ন ছবি কেন? এর কোনো বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে পারেননি বিশেষজ্ঞরা। সুন্দরবনের অপার প্রাকৃতিক ভূতাত্ত্বিক রহস্যের মাঝে এও যেন এক রহস্য, ভেসে থাকে একখণ্ড সবুজ অনাবিষ্কৃত দ্বীপের মতো।

সুন্দরবনের অপুরা যায় কোথায়?

*

সেই রহস্যের টানে একদিন যাত্রা করলাম সেখানে। সঙ্গী আমার এক সহকর্মী দুলাল মণ্ডল।

তখন মার্চের শুরু, শীত চলে যাচ্ছে। বেরিয়ে পড়ার জন্য প্রায়শই এই সময়টা বেছে নিয়েছি আমি। তার কতকগুলো ব্যবহারিক কারণ ছিল, তবে মূল কারণটা ভেতরের। আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এই সময়টা চিরকালই একরাশ খারাপ লাগার সঙ্গে একটা পলকা মন-কেমন-করা ভালো লাগা নিয়ে আসে। সকালগুলো শুরু হয় অজস্র পাখির ডাকে, এমনকি শহরেও। শহর ছাড়িয়ে বেরিয়ে পড়লে বাতাসে শুকনো পাতা আর ধুলোর গন্ধের ভেতর থেকে আচমকা সজনে বাতাবি ভাঁট ফুলের সুবাস, বাদামি বাকল ফাটিয়ে ঝেঁপে আসা রক্তলাল শিমুল মাদার পলাশের কুসুম। হাওয়ায় শুকনো টান, পাকা খড়ের মতো হলদে সর্ষেলোক ন্যাড়া গাছপালার জানলা দিয়ে চলে আসে উত্তরায়ণে। গাছগুলো নিষ্পত্র হয়ে পড়ায় কোকিলের ডাক কেমন যেন ফাঁপা প্রতিধ্বনির মতো বাজে, বেজেই চলে।

ধর্মতলা থেকে ভোরবেলায় ধামাখালির বাস ধরলাম আমরা। আমাদের গন্তব্য দুলালদের গ্রাম, সুন্দরবনের পূর্বপ্রান্তে শেষ আবাদভূমি। প্রতি সপ্তাহে না হোক, দু-সপ্তাহ অন্তর একবার করে বাড়ি ফেরে দুলাল, সঙ্গে কিছু না কিছু থাকে। এবার মেডিকেল কলেজের সামনে দোকান থেকে একটি ফোল্ডিং কমোড সিট কিনেছে ওর অশীতিপর দিদার জন্য। এছাড়া টুকিটাকি ঘরকন্নার জিনিস, রং আর আবীর। আর কয়েকদিন পরেই দোল, তখন যেতে পারবে না।

ফাঁকা বাসে আমি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে দুলাল হাতের জিনিসগুলো ডানদিকে সিটের নীচে চালান করে দিতে দিতে বলে:

আসুন এদিকটায় বসি, বাঁদিকে পুরো রাস্তায় রোদটা মুখে পড়বে।

অনেক প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমার নামের শেষে '-দা' যোগ করে আপনি বলে সম্বোধন করে দুলাল, যদিও সে আমারই বয়সি। কর্মক্ষেত্রেও সতীর্থ। আমাদের বাড়িও একই জেলায়, উত্তর চব্বিশ পরগনায়; আমার উত্তরে ওর একেবারে দক্ষিণে। একদিনে যাওয়া খুব কঠিন। তার কারণটা অবশ্য দূরত্ব নয়, প্রান্তিকতা। জীবনে অনেকটা পথ এসেছে দুলাল। আশেপাশে বেশ কয়েকটি গ্রাম মিলিয়ে ওই একমাত্র এমএসসি পিএইচডি এবং এডুকেশান সার্ভিসে গেজেটেড অফিসার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকালের যানজটহীন মহানগরের হৃৎকেন্দ্র ছাড়িয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস ধরে বাস ছোটে। পূর্বদিকে খোপকাটা সবুজ মাঠে নীচু হয়ে কাজ করছে নারীপুরুষ, বহুদূরে জঞ্জালের টিলার নীচে আবর্জনা খালাস করছে ডাম্পার ট্রাক, পিঁপড়ের মতো ছায়াবালকের দল, আকাশে চক্কর দিচ্ছে কাক চিল— মার্চের সকালের পাতলা কুয়াশামাখা আলোয় টার্নারের আঁকা ছবির মতো দীপ্যমান হয়ে আছে সবকিছু।

জানো অপু, এককালে এখানে রেলের লাইন পাতা ছিল। প্রতিদিন একটা ছোট্ট রেলগাড়ি কু ঝিকঝিক করে এখানে আসত গোটা শহরের আবর্জনা বয়ে নিয়ে। আন্তর্জাতিক বাস্তুতন্ত্রের তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে এই জলাভূমি, তবে তোমার স্বপ্নের কলকাতার ভ্রমণসূচিতে ছিল না চিড়িয়াখানা জাদুঘর কিংবা বায়োস্কোপের মতো। যদি সেইসময় কখনো তুমি এখানে আসতে, তাহলে হয়তো দেখতে পেতে সেই কুঝিকঝিক রেলগাড়ির পেছনে ছুটছে অপুদুর্গার দল। এখনও তারা ছোটে, ডাম্পার ট্রাকের পিছুপিছু। জঞ্জালের পাহাড় থেকে কাচ প্লাস্টিক ধাতু কুড়িয়ে নেয় ওরা, তারপর সেই জঞ্জাল থেকে হয় জৈব সার। এছাড়া শহরবাসীর তরল বর্জ্য জমা হয় পুকুরে। পুকুর থেকে পুকুরে পরিস্রুত হতে হতে ময়লা কালো জল ক্রমশ স্বচ্ছ সুপেয় হয়ে ওঠে। আর এই ক্লেদ থেকে টন টন পুষ্টিকর মাছ আর সবজি ফলিয়ে শহরকে দুহাতে ফিরিয়ে দেয় কয়েক হাজার মানুষ, দেয় অক্সিজেন। এ এক অনন্যোপম বাস্তুতন্ত্র, যার জুড়ি বিশ্বে আর কোনো শহরে নেই। এক আশ্চর্য বিজ্ঞান, এই নিরক্ষর মানুষগুলোর হাতে সৃষ্টি, যা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে নেই, অক্সফোর্ডের হেডমাস্টারমশাইয়ের আলমারিতেও নেই।

বাইপাস ছেড়ে আমাদের বাসটা চলে বাসন্তী রোড ধরে, পার হয়ে যায় বানতলা ভাঙড় ঘটকপুকুর। বড়ো বড়ো ইটভাটা আর একটা নোংরা জলের খাল চলেছে রাস্তার পাশে পাশে।

ওই হল কুলটি গাঙ, দুলাল বলে। এককালে নদী ছিল, এখন কলকাতা শহরের সবথেকে বড়ো নিকাশি নালা। স্লুইস গেট আছে, জোয়ারের নোনা জল ভেড়িতে ঢুকিয়ে চিংড়ির চাষ হয়।

রাস্তার দুধারে দেখা যায় আদিগন্ত মাছের ভেড়ি— জলে প্রতিফলিত আকাশ, দূরে দূরে রাতপাহারার ছাউনি, মোটরসাইকেল, বাঁশের ডগায় স্থির মাছরাঙা। বাতাসে ভ্যাপসা দুর্গন্ধটা মন থেকে সরিয়ে নিতে পারলে একটা পলকা সৌন্দর্য ফুটে উঠতে পারে রোমান্টিক মনে। কিন্তু তাকে বাস্তবের মাটিতে টেনে নামায় দুলাল।

এই যত ভেড়ি আর ইটভাটা দেখছেন, এসব চালায় মাফিয়ার দল। গ্যাংওয়ার লেগেই থাকে, দিনেদুপুরে বোমা বন্দুক বেরোয়। খুন এখানে জলভাত। মেরে পায়ে ইঁট বেঁধে ভেড়িতে ফেলে দিলে কাকপক্ষীও টের পাবে না।

মেঘের আড়ালে বিদ্যুচ্চমকের মতো বানতলা নামটা স্মৃতিতে আবছা ঝিকিয়ে ওঠে। কিন্তু ছুটন্ত বাসের জানলা থেকে দেখে বোঝা যায় না কিছু। খিন্ন দারিদ্র্যের পাশাপাশি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখে পড়ে মানুষের উদ্যম আর উদ্ভাবনী প্রতিভার ছবি। তবু খালি চোখে সবটা নিশ্চয়ই ধরা পড়ে না। এইসব ইটভাটায় ভেড়িতে বাইরে থেকে লোক আসে কাজ করতে, অনামা নাগরিকতা আর গ্রাম্য পরিচিতির পরিসর বদল হয়। বরফের বাক্সে চিংড়ি চলে যায় বিদেশে, ইঁটবোঝাই ট্রাক যায় শহরে। সেই ইটে তৈরি মহানগরের গগনচুম্বী আকাশরেখা যেন গিলতে আসে এইসব ভুঁইফোঁড় হতশ্রী জনপদগুলোকে। মনে হয় কলকাতা মহানগরী এগিয়ে আসতে আসতে একদিন ঠিক গিলে নেবে এই প্রান্তভূমিগুলো। কিন্তু তা হয় না, উপরন্তু নতুন নতুন প্রান্তভূমির জন্ম দিয়ে চলে। নতুন নতুন হিংসার জন্ম হয়।

সরবেড়িয়া থেকে রাস্তা চিরে দুভাগ হয়েছে। একটি গিয়েছে সোনাখালি, নদীর ওপারে বাসন্তী, অন্যটি শেষ হয়েছে ধামাখালিতে। ধামাখালি থেকে নৌকোয় অনেকগুলো নদী খাল পেরিয়ে আমরা যাব দুলালের দেশে, সুন্দরবনে।

সুন্দরবন ঠিক কোথা থেকে শুরু হয়? এল এস এস ও'ম্যালি জেলার গেজেটিয়ারে লিখছেন, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যবে বাংলার দেওয়ানি পেল, তখন কলকাতার পূর্বদিকে সাত কিলোমিটারের মধ্যেই ছিল সুন্দরবন। সেইকালে কলকাতার ভূগোলটা মাথায় রেখে বলা যেতে পারে শহরের পূর্ব ও দক্ষিণ অংশের প্রায় পুরোটাই ছিল সুন্দরবনের এলাকা। ব্যাপারটা কষ্টকল্পনা নয়। সেকালে বাঘ বেরোত কলকাতায়, এন্টালি অঞ্চলে ছিল হেঁতালের বন। হেঁতাল থেকেই সাহেবদের জিভ ঘুরে এন্টালি কথাটি এসেছে। শিয়ালদহ অঞ্চলে মাটি খুঁড়তে গিয়ে পাওয়া গিয়েছিল সুন্দরী গাছের কালো চটচটে হাড়মাস। সুন্দরী গাছের বন, সুন্দরবন। এখন সুন্দরবনে আর সুন্দরী গাছ প্রায় দেখা যায় না। অর্ধেকেরও বেশি দ্বীপে মানুষ রয়েছে, সেখানে কোনোরকম বনের অস্তিত্ব নেই। এমনকি অনেক জায়গায় বাদা অঞ্চলের গাছও নেই। তবুও সুন্দরবন।

তাহলে ঠিক কোথা থেকে শুরু হচ্ছে সুন্দরবন?

ভাটির দেশের অভিজ্ঞ প্রবীণেরা বলেন, হাওয়ার মেজাজ আর গন্ধ থেকে চেনা যায় সুন্দরবন। বাতাস শুঁকে নাকি তাঁরা বলে দিতে পারেন সুন্দরবন আর কত দূরে।

*

ধামাখালির খেয়াঘাটে যে হাওয়া বয় তাতে আঁশটে গন্ধ ছাড়া আর কিছু টের পাই না আমি। ছোটো কালগাছিয়া নদীর পাড়ে বাঁশের ওপর ঝুলন্ত গোলপাতার ছাউনির হোটেল, সেখানে ট্যাংরামাছের ঝাল দিয়ে ভাত খেয়ে ভুটভুটি নৌকোয় চেপে বসা গেল। ছোটো নৌকোয় ডজনখানেক যাত্রী ছাড়াও সাইকেল ও লটবহর চলেছে; বাথরুমের স্যানিটারি সামগ্রী থেকে শুরু করে জীবন্ত মুরগিও আছে। কাঠের পাটার ওপর পা মুড়ে বসে পড়ি আমরা। সামনে ঘণ্টা চারেকের জলযাত্রা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের মুখোমুখি জানু পেতে বসেছেন এক বৃদ্ধ মুসলমান— শাদা চুল দাড়ি, সৌম্য চেহারা, অনেকটা ছবিতে দেখা সুফি সন্তের মতো। তাঁর কোলের ওপর একটি বড়সড় বর্ণময় মোরগ, টুকটুকে ঝুঁটি নাড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে যাত্রীদের মাপে। নৌকো চলতে শুরু করার পর সে সহজ হয়ে আসে, পায়ের দড়িটা গলুইয়ের খুঁটিতে বেঁধে দেন বৃদ্ধ।

সরু নদী কালগাছিয়া, খানিকদূর এঁকেবেঁকে গিয়ে মিশেছে ব্যাপ্ত রায়মঙ্গলে। দুপুর রোদের নীচে শান্ত দিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে আছে ইস্পাত রঙের রায়মঙ্গল।

এখন এই রূপ দেখছেন তো? দুলাল বলে। আর মাসখানেক বাদে গরম পড়লে ঢেউ শুরু হবে দু-তিন হাত উঁচু, নৌকোটা মনে হবে বুঝি মোচার খোলা। পারাপার হতে রীতিমতো বুক কাঁপে তখন।

মস্ত নদীর ওপর দিয়ে কোনাকুনি এপার ওপার ছুঁয়ে এগিয়ে চলে আমাদের ভুটভুটি। এই ভাটির দেশে গ্রামের মানুষের বাস ভ্যান ট্রেকার সবই এই অকিঞ্চিৎকর জলযান। উঁচু বাঁধের আড়ালে বসতি, জল থেকে ঘরের চালগুলো শুধু দেখা যায়, কংক্রিটের গভীর ঘাট নেমে এসেছে নদীতে। মানুষ মালপত্র ছাগল মুরগি ওঠানামা করে। এভাবে পাঠানখালি নারায়ণপুর হেমনগর ছাড়িয়ে কুমিরমারি বেশ বড়োসড়ো দ্বীপ।

স্যানিটারিওয়্যার নামানো হয় কুমিরমারিতে। নৌকোয় ওঠে এক নবদম্পতি। টিয়াসবুজ জর্জেটের শাড়ি পরা প্রায় বালিকা বধূটির একগলা ঘোমটা, স্বামীর হাতে ফুল-আঁকা টিনের সুটকেস, যা আজকাল শহরে বিশেষ দেখা যায় না।

কুমিরমারি ছাড়াতে দূরে দৃশ্যমান মরিচঝাঁপি দ্বীপের নীলচে রেখা। তারপরেই শুরু হয় বাদাবনের লাট। আকাশে একখণ্ড মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যের রশ্মি ঘনীভূত হয়েছে মাঝনদীর বুকে। সেখানে জলের ওপর ভাসমান একঝাঁক কালো কালো হাঁসের মতো পাখি। কী পাখি কে জানে, দুলালও বলতে পারে না। তবে সম্ভবত পরিযায়ী দল, শীতের শেষে যাই যাই করছে। ঢেউয়ে বিচূর্ণ আলোর ঝিকিমিকিতে মিশে রয়েছে।

বাংলার সাম্প্রতিক ইতিহাসে মরিচঝাঁপি এক কালো অধ্যায়, যার সাক্ষী নও তুমি অপু। এক দুঃস্বপ্নের চর, বহুকাল হারিয়েছিল বিস্মৃতির অতলে। সম্প্রতি স্রোতের মুখ ফিরেছে, চেতনায় ফের জেগে উঠেছে মরিচঝাঁপির চর। এতদূর থেকে বনের রেখা দেখে অবশ্য সুন্দরবনের যেকোনো বিজন দ্বীপের থেকে আলাদা করে কিছু বোঝার উপায় নেই।

এখন আর ওখানে কিছুই নেই, দুলাল জানায়। মানুষগুলো যে কলোনি গড়ে তুলেছিল সেখানে এত বছরে ফের জঙ্গল গজিয়ে উঠে ঢেকে গিয়েছে সবকিছু।

ঠিক কী কারণে জানি না, কিন্তু দিগন্তে ওই চরের রেখা দেখা যাবার পর থেকেই নৌকোর যাত্রীদের অল্পস্বল্প কথাবার্তা থেমে গিয়েছে। পালে হাওয়া মরে গেলে যেমন আচমকা নিঝুম হয়ে ওঠে, অনেকটা তেমনই। ইঞ্জিনের একটানা ধ্বনির ভেতর দিয়ে জলের শব্দ শোনা যায়। অনেকেই তাকিয়ে থাকে দূরে নীল রেখাটির দিকে। আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিলেন সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ, তাঁরও মুখ ফেরানো ওদিকে। জলে প্রতিফলিত আলোয় ওঁর কপালের রেখা মনে হয় যেন ছুরি দিয়ে কেটে তোলা।

মরিচঝাঁপি ছাড়িয়ে বাঁদিকে নদীর পাড় ধরে শুরু হচ্ছে বাদাবনের অরণ্য, লট নম্বর আট।

জানো অপু, অরণ্য শব্দটা মনের চোখে যে ছবি ফুটিয়ে তোলে— উঁচু উঁচু মহীরুহের পাতার ফাঁক দিয়ে আসা আলোর রশ্মি, পাখির কূজন, কৃচিৎ বন্যজন্তুর ডাকে চমকিত বনচ্ছায়া— এই ভাটির দেশে কল্পনার সেই ছবি চোখের থেকে সরিয়ে তাকাতে হবে। এখানে দৃশ্য আর দ্রষ্টার মাঝে কেবলই জল, ঘন সবুজের একটানা দেয়ালে চোখ আটকে যায়। পায়ে হেঁটে প্রবেশ অসম্ভব, বড়ো বড়ো শিকড় আর শ্বাসমূলের কঠিন দুর্গ ভেদ করে দৃষ্টিও বেশিদূর যেতে পারে না। মাঝে মাঝে পাখি আর পাড়ে কৃচিৎ মেছো কুমির দেখা যায়।

রায়মঙ্গল ছেড়ে সরু নদী কোড়েখালিতে ঢোকার পর জঙ্গলটা নাগালের মধ্যে চলে আসে, গাছগুলোকে আলাদা করে চিনে নেওয়া যায়। রায়মঙ্গল থেকে বেরিয়ে কালিন্দিতে গিয়ে পড়েছে কোড়েখালি, অর্থাৎ স্থানীয় পরিভাষায় দোয়ানি নদী। নামেই নদী, আসলে খালের মতোই। তার গা থেকে বেরিয়েছে আরও বেশ কিছু সরু সরু পাশি খাল। একদিকে বসতি, অন্যদিকে ছেদহীন বন, বেঁচে ক্যাওড়া গরান আর কাঁকড়া গাছের জঙ্গল। ছঘণ্টা অন্তর জোয়ারে দুই মুখ দিয়ে জল ঢুকে ফুলে ওঠে কোড়েখালি। কিন্তু পড়ন্ত বিকেলে ভাটা পড়েছে তখন, কাদায় সবুজ কাদায় গাঁথা রাক্ষুসে আঙুলের মতো শিকড় বেরিয়ে এসেছে, মোটা মোটা গজালের মতো শ্বাসমূল, এখানকার লোকেরা বলে শুলো।

বনের দিকটায় পার বরাবর টেনিস কোর্টের মতো পাতলা সুতোর জাল টাঙানো। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে লাগিয়ে রেখেছে, যাতে বাঘ নদী পেরিয়ে এপারে আসতে না পারে।

এত পাতলা জাল বাঘ ছিঁড়ে আসতে পারে না? আমি জানতে চাই।

পারে তো। তবে সুন্দরবনের বাঘের একটা অদ্ভুত ব্যাপার কী জানেন? কোনো বাধা থাকলে, সে যত পলকাই হোক, এড়িয়ে চলে। গ্রামে চলুন, দেখবেন সবার বাড়িতে ঘরের দাওয়ায় হালকা খুঁটির বেড়া দেওয়া। বাঘ চাইলে অনায়াসে ভেঙে ঢুকতে পারে, কিন্তু সেটা করে না।

মানুষখেকো হয়ে পড়লে অবশ্যি করে। বৃদ্ধ মুসলমান এতক্ষণ মুখ খোলেন। বড়োমিয়ার মতো সেয়ানা জীব আর দুটি নেই। ঘুরে ঘুরে ঠিক ফাঁক খুঁজে বের করবে।

শীতের বিকেল মরে এসেছে। চারদিক অদ্ভুত স্থির, থমথমে। পাশিখালের সরু সরু গোলকধাঁধা ঢুকে গিয়েছে অরণ্যের গহীন সবুজ শব্দহীন হৃদয়ে। আলো কমে আসছে দ্রুত, মাথার ওপর দিয়ে সূর্যাস্তের আলো পাখায় মেখে উড়ে যাচ্ছে একসারি বক। জলও কমে এসেছে নদীতে। মাঝি ইঞ্জিন বন্ধ করে লগি ঠেলতে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এভাবে বেশ কিছুক্ষণ চলার পর কালীতলায় এসে পৌঁছতে দিন ফুরিয়ে এল। এখানে প্রথম দেখা মিলল বনবিভাগের টহলদারি পিটেল (পেট্রোল) বোটের, গরানের সরু খুঁটি বোঝাই দুটি নৌকো আটক করেছে। জল থেকে দেখা যায় উঁচু পাড়ের ওপর গোটাদুই বিবর্ণ হলুদ সরকারি পাকাবাড়ি। তাদের দেয়ালে অনেক কিছু লেখা, আবছা আলোয় পড়া যায় না, প্রসূতি ও শিশুর ছবি। উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র, পঞ্চায়েত অফিস। সব জনমনিষ্যিহীন। দেখে মনে হয় যেন মানুষের পা পড়েনি অনেকদিন, যেন সভ্যতার শেষ জনপদে এসে পৌঁছেছি আমরা। নৌকোর যাত্রীরা নেমে পড়ে যে যার মতো হাঁটা দেয় গ্রামের দিকে, কিছুক্ষণের মধ্যেই গাছপালার আড়ালে মিলিয়ে যায়। আমাদের এখনও কয়েক কিলোমিটার উজিয়ে যেতে হবে। সমসেরনগর ছাড়িয়ে শেষেরপাড়ায় দুলালের বাড়ি।

কিন্তু নৌকো আর যেতে পারবে না, লগি ঠেলার মতো গভীরতাও নেই ; কাদায় ইঞ্জিনের পাখা গিঁথে যাবে।

চলুন দেখি একটা ভ্যানরিক্সা মেলে কি না— ঘাটের ধারে একটি মাত্র চায়ের দোকানের দিকে পা চালিয়ে দুলাল বলে। আসুন এখানে চা খেয়ে নেওয়া যাক, এর পরে আর কোথাও কোনো চায়ের দোকান নেই।

দোকানে সদ্য-আসা সকালের বর্তমান উচ্চারণ করে পড়ছে এক রোগামতো খদ্দের, মাথায় পশমি টুপি, তার পাশে বসা মানুষটির চোখে কালো ছানিকাটা চশমা। বাখারির বেঞ্চিতে বসে হাত পা টানটান করে গাঁটের খিল ছাড়াই আমি। একগাদা গোল গোল পাউরুটি কেনে দুলাল।

আমাদের গ্রামের দিকে এসব পাওয়া যায় না, কেউ খায় না। চাও খায় না, সঙ্গে করে চা পাতা নিয়ে যাচ্ছি।

পাউরুটি কী হবে? জিজ্ঞেস করি আমি।

বা রে, টিফিন করতে হবে না? দুলাল হেসে বলে।

চা, পাউরুটি, টিফিন। ভিন্ন এক দুনিয়ার আচার নিয়ে চলেছি আমরা।

*

জানো অপু, অজন্তার বিশাল গুহার সারিতে কয়েকটি অসম্পূর্ণ গুহা আছে। তাদের দেয়ালে কোনোরকম ছবি আঁকা নেই, এমনকি পাথরের গা পুরোপুরি কুঁদে তোলার আগেই পরিত্যক্ত হয়েছে সেগুলি। হয়তো নকশায় কিংবা পাথরে কোনো বড়োসড় ত্রুটি দেখা গিয়েছিল কাজ শুরু করার পর। এখন আর সেটা জানার উপায় নেই, অনুমান করা যায় কেবল। এখন কেবল দেখা যায় সুড়ঙ্গের মতো কতকগুলি গর্ত, অসম্পূর্ণ, পাথরের জঠরে এঁকেবেঁকে গিয়ে শেষ হয়ে গিয়েছে। বাসাল্টের গায়ে অগণন ছেনির দাগ আর অস্পষ্ট আকার দেখে কোথায় চৈত্য থাম বুদ্ধ বোধিসত্ত্বের মূর্তি কিংবা শ্রমণদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তপস্যাকুঠুরি হবার কথা ছিল তার একটা আভাসমাত্র পাওয়া যায়। কিন্তু ওইটুকুই। দেড় হাজার বছর আগে নীরেট পাথরের দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে স্থপতির মাথার ভেতরে ঠিক কোন ছবি ছিল হদিশ পাবার কোনো উপায় নেই। বোবা জিহ্বাহীন মুখগহ্বরের মতো ওই গুহাগুলোর ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালে এক অদ্ভুত বিহ্বলতা গ্রাস করে। এমনকি একফোঁটা আতঙ্কও।

ঠিক তেমনই এক বিহ্বলতা আর অবসাদ আমার মনে ছেয়ে এল সেই দিনফুরোনো কালীতলার খেয়াঘাটে। ঠিক কী মনে হচ্ছিল তোমায় হয়তো আমি বোঝাতে পারব না। যে অচেনা পরিসরের ভেতর, জটিল জীবনযাত্রার ভেতর প্রবেশ করছিলাম, তার একটা চাপ ভেতরে তৈরি হয়েছিল। মনে হচ্ছিল এটা নিতে পারার মতো প্রস্তুত নই আমি ; একটা আগাম ব্যর্থতার বোধ আর নৈরাশ্য গ্রাস করেছিল আমায়। সাংবাদিকের মতো চোখ নিয়ে যে জীবনধারা খুঁড়ে দেখতে চলেছি, যে জীবনধারা অসংখ্য অচেনা চোখ দিয়ে সারাক্ষণ খুঁড়ে দেখবে আমায়, এই পারস্পরিক খোঁড়াখুঁড়ির ভেতর দিয়ে বড়োজোর একটা সত্যের খোলস পাব আমি। তার বেশি কিছু সম্ভব নয়।

অজন্তার বোবা গুহার সেই ছমছমে আতঙ্ক ফিরে আসছিল আবার। মনে হচ্ছিল ফিরা-খেয়ায় চেপে ফিরে যাই, যদিও সেদিনের মতো ফেরার খেয়া আর ছিল না। ওভাবে ফেরা সম্ভবও ছিল না।

ইতিমধ্যে গ্রামের এক চেনা ভ্যানচালককে পেয়ে যায় দুলাল। লোকটা মাছ নিয়ে এসেছিল যোগেশগঞ্জের আড়তে। আমরা চালকের সিটের দুপাশে পা ঝুলিয়ে পাটাতনে বসি, বাঁধের ওপর এবড়োখেবড়ো শক্ত মাটির রাস্তা দিয়ে ছাগলছানার মতো লাফাতে লাফাতে ভ্যানরিকশা চলে। ডানদিকে ঝিঙেখালি বিটের ঘন বনে সন্ধ্যা নামছে, এদিকে বাঁধের ধারে দর্মার শূন্য হাটচালা, হোগলার ছাউনি দেওয়া বনবিবির থান, বাঁধ বরাবর রাস্তা চলে গিয়েছে সমসেরনগরের দিকে।

সুন্দরবনের শেষতম দ্বীপ যেখানে মানুষ বাস করে, তার নামের শেষে নগর কথাটা বেশ একটা মেঠো রসিকতার মতোই মনে হয়।

*

আমি দুলালদের বাড়ি যাবার ঠিক তিন মাসের মাথায় হল আয়লার ঝড়। ওদের গ্রামটা কোর ফরেস্টের ধারে হাওয়ার কারণে বঙ্গোপসাগর থেকে ধেয়ে আসা সাইক্লোনের প্রথম ধাক্কা এসে পড়ে। আস্ত একটা জনপদ বেশ কিছুদিনের জন্য মুছে গিয়েছিল ত্রাণের মানচিত্র থেকে। এক পক্ষকাল পরে প্রথম উদ্ধারকারী দল গিয়ে দেখে এক সামূহিক ধ্বংসের ছবি: ঘরবাড়ি তছনছ হয়ে গিয়েছে, বাঁধ ভেঙে জল ঢুকে নদী আর দ্বীপ একাকার, তার ওপরে জেগে-থাকা গাছের ডালে নারকীয় ফলের মতো ঝুলে আছে পচাগলা মানুষ আর গবাদি পশুর শব। তারপর বেশ কয়েক বছর কেটে গিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতকাল পরেও স্বাভাবিক জীবনছন্দ আর ফিরে আসেনি শেষেরপাড়ায়। বাঁধ ভেঙে নোনা জল ঢুকে চাষের জমিগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছে পাকাপাকিভাবে, মানুষজন হারিয়ে গিয়েছে, ছড়িয়ে গিয়েছে। দুলালদের যৌথ পরিবারটাও ভেঙে গিয়েছে।

এরপরেও সুন্দরবনে গিয়েছি। কিন্তু সুযোগ থাকা স্বত্বেও সমসেরনগরের দিকে আর যাইনি কখনো। গেলে আগের সেই গ্রামটা না হোক, জায়গাটা অন্তত দেখতে পেতাম, সেই মানুষদেরও কাউকে কাউকে দেখতে পেতাম হয়তো। কিন্তু ইচ্ছে করেনি। স্মৃতি আর নাড়াঘাঁটা করতে চাইনি বললে ভুল বলা হবে। এক অপয়া অতিথির মতো গিয়েছিলাম দুলালদের দেশে, সত্যি বলতে কি এই ভাবনাটা মন থেকে তাড়াতে পারিনি।

আমার কাছে রয়েছে কেবল কিছু স্মৃতি: একটি জনপদের টুকরো টুকরো ছবি, মানুষের মুখ, কথা, প্রকৃতির দৃশ্য, অন্ধকারে জোনাকির নাচ— সময়ের লাভাস্তর খুঁড়ে তোলা ফ্রেস্কোর মতো, তার অসংলগ্ন খণ্ডদৃশ্য ফুটে ওঠে এদিক সেদিক, একটি হারিয়ে-যাওয়া জীবনধারার কয়েকটি দৈনন্দিন মুহূর্ত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গরানছিটের ডোরা

কালিন্দীর বাঁধের ধারে দুলালদের বাড়িটা আশেপাশের বাড়িগুলোর তুলনায় কিছুটা বড়ো। তিনটে মাটির ঘর খড় আর গোলপাতায় ছাওয়া, বড়ো ঘরটির লাগোয়া একটি প্রশস্ত ছাউনি যার দুদিক খোলা। এখানেই খাওয়াদাওয়া হয়। পাড়ায় বিয়েপার্বণ হলে পনেরো-বিশজন মানুষ অনায়াসে শুতে পারে এখানে। ঘরগুলোর উঁচু দাওয়ায় ঘন ছিটের গরাদ বাদাবনের মূর্তিমান মৃত্যুর কথা মনে পড়িয়ে দেয়। রান্নাঘর বলতে সেভাবে কিছু নেই, উঠোনে একটি ছোট্ট ছাউনির নীচে রান্না হয়। উঠোনের একপাশে গোলাঘর— দর্মার তৈরি বড়ো পিপের আকারে, ওপরে খড়ের চাল, নীচে লক্ষ্মীর কুলুঙ্গি। দুটি পুকুর— ছোটোটি ভিটের সামনে, ডোবা বলা যায়, অপেক্ষাকৃত বড়োটি উঠোনের শেষে। তার পেছনে একফালি শাকসবজির বাগান, আম নারকোল সুপুরি সবেদা খেজুর, বিঘে দেড়েক চাষের জমি, চিংড়ির ঘের। তারপরেই সরু কোড়েখালি, ওপারে বন। এছাড়া একটি গোয়ালঘর, হাঁসমুরগির ঘর, কুঁড়েঘরের আকারে সাজানো খড় ও একটি পাকা পায়খানা রয়েছে। শেষোক্তটি গ্রামে আর মাত্র একজনের বাড়িতেই আছে। তিনি স্থানীয় প্রভাবশালী নেতা ও চিংড়ি রপ্তানিকারী।

দুলালদের বাড়িতে বিলাসসামগ্রী বলতে আমার গোচরে এসেছে একটি দড়ির দোলনা, ওর বাবার নিজে হাতে বোনা, দাওয়ায় চালের বাতা থেকে ঝুলছে মাটির এক হাত ওপরে। বাড়িতে অতিথি এলে খাতির করে ওখানেই বসতে দেওয়া হয়। কখনো দিনভর হাড়ভাঙা কাজের ফাঁকে দুলালের বাবা কিংবা ভাই দুয়েক দণ্ড বসে জিরোয়। তারপরেই কিছু-না-কিছু হাতের কাজ খুঁজে নেয়। গোয়ালে গরুর জন্য খড় কাটা, নারকোলপাতা দিয়ে আসন বোনা, জাল মেরামত করা— টুকিটাকি কাজের অন্ত নেই। সরু লম্বাটে দাওয়াটা চলে গিয়েছে হোগলার বড়ো ছাউনি পর্যন্ত। ওদিকে মাটি দুহাত উঁচু করে ছিটের গরাদ দেওয়া। সেখানে একফালি তক্তপোশে কফিনের মতো ছোট্ট মশারির ভেতর দিবারাত্র শুয়ে থাকেন দুলালের প্রায় চলচ্ছক্তিহীন ঠাকুমা। লাগোয়া ঘরটিতে মাটির দেয়ালে গবাক্ষের আকারে জানলা, ভেতরটা দিনের বেলাতেও অন্ধকার। কয়েক মিনিট পরে চোখ সয়ে গেলে দেখা যায় একটি তক্তপোশ, কাঠের আলমারি, চালে ঝুলন্ত বাঁশের আলনা, এককোণে নীচু জলচৌকির ওপর একঝাঁক দেবদেবীর মূর্তি ও ছবি। এছাড়া ঘরের মাঝখানে কাঠের খুঁটিতে ঝোলানো ফ্রেমবন্দি শেষবয়সের রবীন্দ্রনাথ— অবিন্যস্ত চুলদাড়ি, বিহ্বল— বড়ো বড়ো চোখ মেলে চেয়ে আছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্যাঁতসেঁতে ছায়ায়। তক্তপোশের নীচে ছড়ানো খেতের আলু আর আদা। মাথার কাছ একটি বড়ো গোবর-লেপা বাঁশের বাস্কেট, চাল রাখা থাকে।

এই বাস্কেটটি দুলালের সমবয়সি, জানালেন ওর মা। বয়স্কা গ্রাম্য নারীর চেহারায় কঠোর শ্রমের চিহ্ন সত্ত্বেও একটা আলগা লাবণ্য রয়েছে, মুখটি দুলালের মুখে বসানো। তুলনায় ওর দুই ভাইকে অনেকটাই ওদের বাবার মতো দেখতে— ছোটোখাটো দড়িপাকানো চেহারা। দুজনেই বিবাহিত, একটি করে সন্তান রয়েছে।

কাঁধের গামছাটা মাথায় জড়ালে দুলালের মেজো ভাই গৌর আপাদমস্তক হেলে চাষি। সদ্য মাঠ থেকে ফিরেছে, পায়ে কাদা। একটিও কথা না বলে বহিরাগতকে ঠারেঠোরে দেখে, চোখেমুখে আড়ষ্ট সংকোচ। ছোটোভাই মানিক বরং চটপটে ও সপ্রতিভ। ওদের একটি ডিজেল পাম্পসেট ও পাওয়ারটিলার আছে, সেগুলির দেখভাল করে সে, অন্যের জমিতে চাষ দেওয়া আর জল বেচার কাজ করে। নিজেদের জমিতে চাষে কায়িক শ্রমটা গৌরের। বয়স হয়ে গিয়ে দুলালের বাবা আর এসব দেখতে পারেন না। ভিটের পেছনদিকে চিংড়ির ঘেরে ছিটেবেড়ার খুপরি ঘরে রাতে থাকেন তিনি। পাশেই সরু কোড়েখালি, তার ওপারে ঘন জঙ্গল, হাত দশেকের মধ্যেই।

ভয় করে না? জিজ্ঞেস করি আমি। ঘাড়ের কাছেই তো দখিন রায়ের বসত।

ত্যানার দেশে বাস, ভয় কল্লি চলে বাবা? দুলালের মা হেসে মাথার ঘোমটা পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে বলেন। তা বাদে এখন জঙ্গল আর আছে কি?

উনিশশো পঞ্চাশে খুলনার দাঙ্গায় উৎখাত হয়ে ওঁরা যখন এই সমসেরনগরে আসেন, তখন চারিদিকে ছিল ভয়াবহ বন, দিনেদুপুরে বাঘ বেরোত। হরিণও ছিল প্রচুর। গ্রামের লোকেরা বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া নেড়ি কুকুর নিয়ে বনে ঢুকে হরিণ মারত।

দুলালের বাবা নাকি ছিলেন পাকা শিকারি। এমনও হয়েছে, পুকুরে স্নান করতে যাবার সময় ভাত বাড়তে বলে কাঁধে শিঙেল হরিণ ঝুলিয়ে এনে দাওয়ায় ফেলেছেন।

লাজুক হেসে লম্ফর পলতে উসকে তোলেন বৃদ্ধ, চোখদুটো চিকচিক করে ওঠে। সেই দিকে তাকিয়ে খানিকটা স্বীকারোক্তির স্বরে বলেন—

তখন তো আমাদের এখানে কিছুই ছিল না। একখানা টিউবওয়েলের জন্যে হিঙ্গলগঞ্জে গিয়ে ব্লকবাবুদের কাছে দরবার করতে হতো। হরিণের মাংস খাইয়ে কত কাজ হাসিল করেছি। বাঁধ মেরামতি থেকে শুরু করে ছাইক্রোন শেল্টার...

স্থানীয় কৃষক সভার মেম্বার ছিলেন তিনি, একবার পঞ্চায়েতপ্রধানও হয়েছেন।

তখন আর এখন দিনকাল অনেক ফারাক হয়ে গিয়েছে, দুলালের বাবা বলেন। দুটো জিনিস আসার পর গ্রামে কাঁচা পয়সা ঢুকেছে— ঘের বেঁধে চিংড়ির চাষ আর ভুটভুটি নৌকো। বাদাবনের ভেতরদিকে গ্রামগুলোতেও এই চাষ হচ্ছে এখন, ভুটভুটিতে চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছে হেমনগরের আড়তে।

তিননম্বর জিনিসটা হল বিএসএফ, মানিক যোগ করে। এখানে ভুটভুটি যে ডিজেলে চলে, সেটা বিক্রি করে বিএসএফের লোকেরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন তো তবু বাঁধের ওপর ইটপাতা রাস্তা দেখলেন, দুলাল বলে। আমাদের ছেলেবেলায় ছিল মাটির। বর্ষাকালে গামছা পরে জামাপ্যান্ট-বইখাতা পুঁটলি বেঁধে মাথায় নিয়ে ইস্কুলে যেতাম।

আগে কষ্ট ঢের বেশি ছিল, তবে এসব আমাদের গা সওয়া। দুলালের মা সস্নেহে বলেন। তোমরা শহরে থাকো, তোমাদের কষ্ট। ইলেকটিরি নেই, রাস্তাঘাট নেই, পানের জল নোনা। তবু তো যেবার শুচিস্মিতাদিদি এল, তার আগে দুলাল পায়খানাটা পাকা করে।

এসব কষ্টের জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছি, কিন্তু নোনা জলের ব্যাপারটা সত্যিই ধারণা ছিল না। পঞ্চায়েত থেকে গ্রামে বিভিন্ন জায়গায় টিউবওয়েল বসিয়েছে, সেখান থেকে দিবারাত্র অনর্গল ধারায় ভুস ভুস করে নির্গত হয় এক বিচিত্র ফেনিল নোনা জল, তার রং অবিকল বিয়ারের মতো। টিউবওয়েলের মুখে জ্বলন্ত দেশলাইকাঠি ধরলে দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে, জ্বলতেই থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এই জল পান করে গ্রামের সবাই, বিকল্প পুকুরের দূষিত জল। তবে এই বিচিত্র ভৌম জল গরুছাগলে স্পর্শ করে না, চাষের জমিতে গেলে ফসল নষ্ট হয়ে যায়। নলকূপগুলো তাই বসানো হয়েছে বাঁধের ধারে, উপচে পড়া জল নালি কেটে খাঁড়িতে ফেলা হয়।

মাটির নীচে তেল-টেল আছে নাকি? আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

জলের নমুনা যাদবপুরে ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়েছিলাম একবার, দুলাল জানাল। ওরা জলে প্রচুর মিথেন পেয়েছে, শরীরের পক্ষে সেটা কিছু ক্ষতিকর নয়।

তা হয়তো নয়, কিন্তু ওই লাল্চে নোনা জল আকণ্ঠ পান করলেও তৃষ্ণা না মেটার অনুভূতিটা থেকেই যায়। যে পাঁচদিন শেষেরপাড়ায় ছিলাম, এই একটি কষ্টকর অনুভূতির সঙ্গে পুরোপুরি জুঝে উঠতে পারিনি।

গোটা দ্বীপ জুড়ে হামের প্রকোপ চলেছে তখন ; মানিকের সাত বছরের মেয়েটা আক্রান্ত। মায়ের কোলে নয়তো বুড়িঠাকুমার মশারির ভেতর শুয়ে থাকত সে সারাটা দিন। মাঝে মাঝে জ্বর আসত, সঙ্গে শুকনো কাশি। গ্রাম্য সংস্কারে ওষুধ দেবার বিধি নেই এই রোগে। দুলালদের বাড়িতে থার্মোমিটার কিংবা প্যারাসিটামলও নেই।

গৌরের বছর বারোর ছেলেটা ইস্কুলে যায়। বাড়ির কাছ প্রাইমারিটা হাইস্কুল হয়েছে সম্প্রতি, দুলালদের সময়ে ছিল না। ছেলেটির কদমছাঁট চুল, দাঁতে হলদে ছোপ, সম্ভবত জলের কারণে। বহিরাগত অতিথির গতিবিধি নজর করে গভীর কৌতূহলভরে, কিন্তু কাছে ডেকে কথা বলতে গেলেই পালিয়ে যায়। অন্ধকার উঠোনে বাড়ির পোষা কুকুরের সঙ্গে হুটোপুটি করে খেলা করে সে, অব্যক্ত খুশিতে চনমন করে দুটি প্রাণী। তার কারণ হয়তো রাতে একটু ভালো খাওয়াদাওয়া হবে। উঠোনের একপাশে উনুনের দিক থেকে মশলার গন্ধ আসে। রান্না করে বাড়ির দুই বউ। কমলা আগুনের শিখায় তাদের ছায়াগুলো দোলে গোলাঘরের দেয়ালে। যে বিশেষ প্রশিক্ষিত কুকুরদের নিয়ে বনে হরিণ শিকারে যেতেন দুলালের বাবা, এই কুকুরটি তাদেরই বংশধর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্ধ্যা আটটাতেই চারিদিক নিঝুম, মনে হয় যেন গভীর রাত। গোলপাতার ছাউনিতে কাঁথার আসন বিছিয়ে পাত পড়ে পুরুষদের। লালচে গোল চালের ভাত আর তিন চার রকমের শাকসবজি মেশানো বিভিন্ন আকারের চিংড়ি আমোদি ভাঙন ইত্যাদি মাছের ঝোল। ডালের পাট নেই। দুলালের দুই ভাইবউ একগলা ঘোমটা দিয়ে খুঁটির আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে, থালায় ভাত কমে এলে চকিতে এসে ফের ভাত ঢেলে দিয়ে দ্রুত কবজির মোচড়ে উপুড় করে দিয়ে যায় ঝোলের বাটি। সারাদিন ঘরের কাজে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে দেখা যায় ওদের, কিন্তু ছায়ার মতো নিরুচ্চার আর অলীক। বাড়ির পুরুষেরা প্রশ্ন করলে উত্তর দেয় নীচু ক্লান্ত স্বরে, মাথাটা এককোণে বাঁকিয়ে। ঘোমটার আড়ালে ওদের মুখগুলো মনে পড়ে না আমার, কণ্ঠস্বরও না। কিন্তু দুই নারীর মধ্যে শ্রমে ও ক্ষমতায় যে একটা সুস্পষ্ট বিভাজন ছিল সেটা টের পেয়েছি।

মেজোভাইটার লেখাপড়ায় মাথা ছিল না, ফোর অব্দি পড়ে পড়া ছেড়ে দেয়। মানিকটার বুদ্ধি ছিল, চেষ্টা করলে হতো। কিন্তু সেবার বাঁধ ভেঙে নোনা জল ঢুকে চাষজমি পতিত হয়ে গেল। মাইলো খেয়ে ইস্কুলে যেতে হতো। পেট ফাঁপত, কাঁদত। একদিন যাওয়া ছেড়ে দিল। দুলাল বলে।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর আমরা দুজনে সিগারেট খেতে এসে দাঁড়িয়েছি ওদের ভিটের সামনে বাঁধের ওপর, বাড়ির কুকুরটা আমাদের পিছু পিছু এসেছে।

খিদের সঙ্গে লড়াই করে মানিক পেরেছে। দুলাল পেরেছে। সুন্দরবনের এই প্রান্তিক বসতি থেকে ইস্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পেরিয়ে অনেকখানি পথ এসেছে সে। ঠিক কতখানি এসেছে সেটা আমাদের কর্মস্থলে নাগরিক পরিসরে অন্যান্য সতীর্থদের ভিড়ে কিছুতেই বোঝা সম্ভব নয়। সেটা বোঝার জন্য এতদূর আসতে হল আমায়, এখানে এসে দাঁড়াতে হল।

আমরা তরুণ নই আর, সেই রেললাইনও নেই। আমরা দাঁড়িয়ে আছি উঁচু বাঁধের ওপর। ঠান্ডা জোলো হাওয়া দিচ্ছে বিস্তীর্ণ কালিন্দীর পেট ছুঁয়ে। বাঁধের ঠিক নীচেই বনকমিটির সৃজন করা গেঁয়ো বায়েন ইত্যাদি গাছের ঝোপ হয়ে আছে। সেখানে বাঁধা দুটি শূন্য ডিঙি ঢেউয়ের দোলায় গাছের গায়ে ঘষা লেগে শব্দ হচ্ছে। ওপারে বাংলাদেশ রাইফেলস-এর চৌকিতে আলো দেখা যায়। এপাশে দেখা যায় দুলালদের গ্রামটা। ওপর থেকে মনে হচ্ছে গোটা বসতিটা অন্ধকারের কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে যেন। দুলালদের দাওয়ার প্রান্তে একটা কুপি জ্বলছে, বেড়ার চৌখুপি ছায়া পড়েছে উঠোনে। মশারির ভেতর থেকে কাশির শব্দ আসছে। সেটা শিশু না বৃদ্ধার, দূর থেকে বুঝে ওঠা যায় না। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার। কোড়েখালির দিকে টানা জঙ্গলশীর্ষ তারায় ভরা আকাশের নীচে চাপ বেঁধে আছে।

সিগারেটের আলোয় দুলালের মুখটা থেকে থেকে উদ্ভাসিত হয়, আমি দেখি। কোনো আশ্চর্য উপন্যাসের প্লট বলে না আমায় ; ও নিজেই একটি আশ্চর্য উপন্যাস।

*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনসাপোতা থেকে দু-ক্রোশ পথ হেঁটে আড়বোয়ালের ইস্কুলে পড়তে যেতে তুমি অপু। পথে পড়ত বট, ঢ্যাঙা তাল-খেজুরের গাছ, তুঁতের ছায়া, ঝোপঝাপ, মাঠ, পিড়িং পিড়িং পাখির ডাক, অনেকখানি ফাঁকা আকাশ আর হুহু মাঠের হাওয়ায় পাকা ফসলের গন্ধ। দুলাল ইস্কুলে যেত খাঁড়ি দিয়ে ডিঙি নৌকোয় চেপে। সরু জলপথের একদিকে বসতি, অন্যদিকে ঝিঙেখালি বিটের জঙ্গল। ওর গ্রামের সব পড়োরা ওইভাবেই যেত, খেয়াঘাটে ফেরির আমলে কেউ কেউ নিজেরাই শালতি বেয়ে চলে যেত। তখন আরও গভীর ছিল এই ঝিঙেখালির বন। বাঘের ডাক শোনা যেত প্রায়ই, তবে ওরা দেখেনি কখনো। বাঘ মানুষ তুলে নিয়ে গেছে এমন জায়গায় সাদা কাপড় দিয়ে টাটকা নিশানা করা রয়েছে দেখেছে। বাদা অঞ্চলের মানুষেরা, বিশেষত এই সমসেরনগরের মতো জায়গায়, বাঘের শ্বাসপ্রশ্বাসের আওতার মধ্যে বাঁচে। তবে শিকারি কাঠুরে কিংবা মউলে না হলে খোলা জায়গায় বাঘ দেখা হয়ে ওঠে না সচরাচর। কেউ দেখতে চায়ও না। যে দেখে ফেলে, সে আর সেই অভিজ্ঞতা বলার জন্য ফিরে আসে না সাধারণত।

এইসব গল্প শুনতে শুনতে নৌকো পাড়ে এসে লাগে, আমরা ইটবাঁধানো বাঁধের রাস্তা ধরি। আমাদের পাশ দিয়ে সাইকেল চালিয়ে কলকল করতে করতে ইস্কুলে চলেছে একদল মেয়ে, সকলের পরনে সাদা-নীল সালোয়ার-কামিজ। তাদের কারোর পিঠে ওড়না গিঁট দিয়ে বাঁধা, কেউ বা ওড়াচ্ছে ডানার মতো। শীত সকালের মধুমাখা আলোয় দূর থেকে মনে হয় যেন একঝাঁক পরিযায়ী পাখি চলেছে নতুন দেশের খোঁজে।

আমরা যখন পড়তাম ইস্কুলে মেয়ে খুব কম ছিল, দুলাল বলে। নীচু ক্লাসে বড়োজোর পাঁচ-ছটা, সেভেন-এইটে ওঠার পর তারা আর প্রায় কেউই থাকত না।

দৃশ্যতই ছবিটা বদলে গিয়েছে। এবং জাতিসঙ্ঘের রিপোর্টে যে পরিসংখ্যান রয়েছে, তাকে সত্যি প্রমাণ করবার জন্যই যেন ওপর দিকের ক্লাসগুলোয় মেয়েদের সংখ্যা ছেলেদের থেকে বেশি, কোথাও অনেকটাই বেশি।

ছেলেগুলো সব যায় কোথায়?

কোথায় আবার? সোজাসাপ্টা ভাষায় রহস্যটা ফাঁস করে দিলেন প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষক অনন্ত ঘোষাল। কোড়েখালির ধারে যান না একবার, দেখতে পাবেন। নাইলনের জাল দিয়ে সারাদিন ধরে মীন ধরছে ছোঁড়াগুলো!

মীন হল চিংড়ির লার্ভা, যা জোয়ারের সময় ভেসে আসে; জলে ভাসমান অ্যালগি আর পাতার গায়ে অনুপরিমাণ ছত্রাক খায় তারা। মীনের আকারও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, জল ছেঁচে ছেঁচে গভীর ধৈর্যে ঝিনুক দিয়ে বেছে তুলতে হয়। সারাদিন জলে কাটাতে পারলে বিশ-তিরিশ টাকা পর্যন্ত আয় হয়।

বাপ-মা কেন খামোকা ইস্কুলে পাঠাবে বলেন দিকি?

যদি সত্যিই ইস্কুলে পাঠাত, তাহলে অবশ্য সকলকে বসতে দেওয়ার জায়গা হতো না অনন্ত মাস্টারের এই প্রাইমারি সেকশনে। পড়ুয়াদের ছবিটা বদলেছে, ইস্কুলবাড়িটা একই আছে। বাঁধ ছাড়িয়ে মাঠের ধারে জানলাবিহীন দোতলা বাড়িতে হাইস্কুলের ক্লাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সেটাই আবার হয়ে যায় গ্রামের মানুষের আশ্রয়। নগ্ন ইটের দেয়ালে পলেস্তারা পড়েনি কোনোকালে, পুরু কালচে-সবুজ শ্যাওলা ছেয়ে আছে। প্রাইমারি সেকশনটা এই বাড়ির লাগোয়া একতলার অংশে। চারটি শ্রেণির জন্য দুটি মাত্র ঘর, আলাদা শৌচালয় নেই। তবে সর্বশিক্ষা অভিযানের টাকায় মিড-ডে মিলের জন্য একটি রান্নাঘর হয়েছে সম্প্রতি। সেখান থেকে ভেসে-আসা ফোড়নের গন্ধে খলবল করছে দুই ঘরে ভর্তি বিভিন্ন বয়সের কচিকাঁচারা।

রান্না করছে গ্রামেরই এক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর চারজন মহিলা ; সকলেই বিবাহিতা, খুবই সপ্রতিভ আর কর্মঠ। আমাদের দেখে যথারীতি সাংবাদিক ভেবে ভুল করে। সরকার থেকে মিড-ডে মিলের চাল আসে ব্লক অফিস ঘুরে, এছাড়া প্রতিদিন মাথাপিছু একটাকা পঞ্চাশ পয়সা করে বরাদ্দ।

ডাল তেল মশলা সবজি— সবকিছু ওই টাকার মধ্যে। আজকের দিনে দেড়টাকায় কী হয় বলুন তো ?

গাছকোমর বেঁধে কুড়ুল হাতে জ্বালানি কাঠ চ্যালা করছিল একজন, সে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে। সে-ই শোনায় অভিযোগের ফিরিস্তি: ডাল ভাত আর একটা তরকারি রোজ হয়, সপ্তাহে একদিন মাছ কিংবা ডিম, মাংস হয় মাসে একবার। টাকা আসতে বড্ড দেরি হয়, মুদির দোকানে ধার জমে। অনেক সময় নিজেদের ঘর থেকে টাকা বের করে সামাল দিতে হয়।

কিন্তু কী করব বলেন, এরা তো আমাদের ঘরের ছেলেমেয়ের মতোই। তবু বাগান থেকে বেগুনটা কুমড়োটা চেয়েচিন্তে এনে তরকারি একটা যাহোক হয়ে যায়।

উনুনের সামনে দাঁড়িয়ে ডাল সাঁতলাচ্ছিল যে মেয়েটি, সে আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে বলে—

এসব কাগজে লিখবেন তো ? তাহলে এই কথাটাও লিখে দেবেন একটু— এখানে জলের বড্ড অসুবিধে।

উঠোনের একপাশে একটি সিমেন্টের ট্যাঙ্ক আছে, তার গায়ে একসারি লোহার কল, মরচে ধরা। জল আসার কথা ছিল সৌরশক্তিচালিত পাম্প থেকে, সরকারের খাতায় তেমনটাই নথিবদ্ধ হয়ে আছে। কিন্তু সেই পাম্প কোনোকালে চালুই হয়নি। এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকায় স্থানীয় বিধায়কের ঔদার্যের কথা অবশ্য খোদাই করা আছে মার্বেলের ফলকে।

ইস্কুলবাড়িটার পেছনদিকে একটি ছোটো ডোবার মতো পুকুর। তার জল পান করে ছেলেমেয়েরা, এমনকি খাবারের থালাও ধোয়। বাঁধের প্রান্তে রয়েছে বিএসএফ-এর চৌকি, কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। সেখানে উঁচু কাঠের মাচার ওপর সবুজ-মেরুন ডোরাকাটা জলের ট্যাঙ্কগুলো অনেক দূর থেকে দেখা যায়। জানা গেল, একদিন অন্তর ট্যাঙ্কার-বোটে ওখানে মিষ্টি জল আসে দূরের দ্বীপ থেকে। কিন্তু রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ দেশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে খুদে নাগরিকরা, যাদের সুরক্ষার জন্য এত আয়োজন, তাদের জন্য এই ডোবার জলই ভরসা।

জলের সমস্যার ব্যাপারটা ওপরতলায় জানানো হয়নি? দুলাল জিজ্ঞেস করে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের। একজন করে মাস্টারমশাই তো শুনি রোজই পালা করে অফিসিয়াল কাজে বাইরে থাকেন।

'অফিসিয়াল' শব্দটায় উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠে ওরা, বারবার উচ্চারণ করে। গলার স্বর নামিয়ে বলে—

কখনো দুজন মাস্টারমশাইয়ের একজনও এল না এমনও হয়।

তখন কী হয়? ইস্কুল ছুটি? আমি জিজ্ঞেস করি।

ছুটি হবে কেন? আমরাই পড়িয়ে দিই।

গাছকোমর নারী কুড়ুলটা মাটিতে রেখে কব্জি দিয়ে কপালের চুল ঠেলে সরিয়ে সগর্বে বলে।

তোমরা? বল কি? দুলাল বিস্ময়ের মুখভঙ্গি করে।

ওই যে ওই শিখা পড়ায়। ও এইট পাস। এই শিখা, এনাদের বল না কি পড়াস?

গামলায় গরম জলে সয়াবিনের বড়ি ভিজিয়ে মুছিল শিখা, নীচের ঠোঁট কামড়ে ফিক করে হেসে ফেলে।

কাজের ছন্দে একটা অদ্ভুত খুশির মেজাজ সকলের। চারজনে একত্রে মাসে তিনশো টাকা আয় করে, কাজ সপ্তাহে ছদিন। এতগুলো শিশুর জন্য রোজ গরম খাবারের আয়োজন করা মুখের কথা নয়, কিন্তু এই কাজটা যে ওদের মধ্যে একটা আত্মমর্যাদার বোধ এনে দিয়েছে, সেটা হাবেভাবেই স্পষ্ট। এখানে ওরা যে কাজগুলো করছে— কুটনো কোটা, বাটনা বাটা, রান্না করা— এই কাজটাই প্রতিদিন দুবেলা নিজেদের বাড়িতে করে। কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় এখানে এরা এটা বেশ উপভোগ করছে।

সে কথা জানাতে ঘর্মাক্ত মুখগুলো হাসিতে ঝিকমিক করে।

একটু থেকে যান না, তরকারিটা নামলে পাত পড়বে। আদিবাসীপাড়ার ছেলেমেয়েগুলোর খাওয়া যদি একবার দেখেন, মন ভরে যাবে।

ঝড় হোক জল হোক, কোনোদিন ইস্কুল কামাই করে না ওরা— শিখা বলে।

আদিবাসীপাড়ার ছেলেমেয়েরা বেশিরভাগই প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়া, ওদের নিয়মিত ইস্কুলে আসাটা তাই খুবই জরুরি। এতগুলো শিশু এই চারজন নারীর শ্রমে যেটা পাচ্ছে, সেটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। তাতে একবেলা পেট ভরে, হয়তো দেহে পুষ্টির একটা ভারসাম্য আসে। সেই তুলনায় ক্লাসঘরের ভেতরে ঠিক কী পাচ্ছে সে ব্যাপারে খুব একটা নিশ্চিত নন শিক্ষক স্বয়ং। তবু মিড-ডে মিলের ব্যাপারে খুব একটা ভরসা নেই তাঁর। বরং অভিযোগ আর অভিমান আছে।

পড়াশোনাটা হবে কখন বলুন দিকি? অনন্তবাবু বললেন। মুদির মতো রোজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চালডালের হিসেব রাখতে গিয়ে মাথা খারাপ হয়ে যায়। তারপর ধরুন গিয়ে ভাত নামতে একটু দেরি হল, বাচ্চাগুলো থালা বাজিয়ে বাজিয়ে এমন অস্থির করে মারবে। তারপরে আছে মুখ ধোয়া, থালা ধোয়া। এইসব করতে করতেই তো দিন কাবার হয়ে যায়। পড়াব কখন? খাওয়া হয়ে যাবার পর আবার ওদের ধরে রাখাটাই এক কঠিন সমস্যা।

তবু মিড-ডে মিলের জন্য ছেলেমেয়েদের নিয়মিত উপস্থিতির হার যে বেড়েছে, সেটা কুণ্ঠার সঙ্গে স্বীকার করলেন। একটু ইতস্তত করে বললেন—

দেখুন, একটা ব্যাপার কি জানেন? আপনাদের বললে বুঝবেন— ছেলেমেয়েগুলো থালা বগলে নিয়ে ইস্কুলে আসে ভিখিরির বাচ্চার মতো। ব্যাপারটা ঠিক... ভাল্লাগে না!

অনন্ত ঘোষাল কালিন্দির ওপার থেকে এসেছেন একাত্তরের পর। লেখাপড়া করেছেন খুলনায়। এর আগে এখানে এক গৃহস্থের বাড়িতে থাকতেন, ওদের ছেলেকে কোচিং দিতেন। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের বেতনকাঠামো উন্নতির পর বাস উঠিয়ে চলে গিয়েছেন হেমনগরে। সেখানে এখন পরিবার নিয়ে থাকেন, রোজ এতটা পথ যাওয়া আসা করেন। বাড়ি থেকে বোতল ভর্তি করে পানীয় জল আনেন অনন্তবাবু।

প্রাথমিকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ছেলেমেয়ের সঠিক অনুপাতটা জানতে চাইছিলাম, জানা হল না। হাজিরার খাতা থাকে আলমারিতে, চাবি থাকে হেডমাস্টারের কাছে। তিনি সেদিন আসেননি, সার্কেল ইন্সপেক্টারের অফিসে গিয়েছিলেন 'অফিসিয়াল' কাজে। দুটি ঘরের মাঝখানে দরজার চৌকাঠে একটি হাতলভাঙা কাঠের চেয়ারে বসে একসঙ্গে চারটি ক্লাস ম্যানেজ দিচ্ছিলেন অনন্ত ঘোষাল।

ঘরের ভেতর ইটপাতা মেঝেয় ছিটিয়ে ছিটিয়ে বসেছিল চারটি শ্রেণির প্রায় পঞ্চাশটি ছেলেমেয়ে। খোশগল্প, ঝিমুনি, খুনসুটি, আঁক কেটে খেলা, দুষ্টুমি আর পরস্পরে মান-অভিমানের প্রবাহ চলছিল দুটি ঘর জুড়ে। তারই মধ্যে কেউ কেউ বই দেখে খাতায় লিখছিল কিছু, একে অপরকে সাহায্য করছিল। দরজার পাশে একটি ছোট্ট বালক ফাটা শ্লেট ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে মুছেই যাচ্ছিল মুছেই যাচ্ছিল। বাইরে থেকে দুজন অচেনা মানুষ এসে পড়ায় যে একটা উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল ওদের মধ্যে, সেটা কিছুক্ষণ পর কেটে গিয়ে আবার স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে এসেছিল। রান্না হয়ে এলে গরম ভাতের গন্ধে একটা চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছিল। দু-চারজন জানলার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিচ্ছিল রান্নাঘরের চালায়।

আমি যাবার কিছুদিনের মধ্যেই আয়লার ঝড় হল। জানি না ওই ছেলেমেয়েগুলো এখন কেমন আছে, কোথায় আছে। আজ এতদিন পরে যখন ওই মুখগুলো মনে করতে যাই, যেন কুয়াশার ভেতর ঝাপসা হয়ে আসে, ওদের মুখে মিশে যায় আরও অসংখ্য মুখ, যা দেখেছি শেখপাড়ায় ময়ূরভঞ্জে অযোধ্যা পাহাড়ে। কেবল ওই কালোমতো ছোট্ট ছেলেটা, দরজার পাশে একলা বসে যে ফাটা শ্লেট মুছছিল আর আড়ে আড়ে সঙ্কোচভরে তাকাচ্ছিল আমাদের দিকে, ওকে মাঝে মাঝে মনে পড়ে। ছেলেটির ঘর ছিল আদিবাসীপাড়ায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদিবাসীপাড়াটা শেষেরপাড়ারও শেষে, প্রান্তেরও প্রান্তে, যদি সত্যিই সেরকম কিছু থেকে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে, যেখানে বদ্বীপভূমি ফেটে চৌচির হয়ে মাছের আঁশের মতো ঝুলে আছে সুনীল বঙ্গোপসাগরের ওপরে, যেখানে আকাশি রঙের শিরাতন্তুজালের মতো নদী আর খাঁড়ি বেঁধে রেখেছে সুন্দরবনের দ্বীপগুলোকে, মনুষ্যবসতির হলদেটে সবুজ যেখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে বনের ঘন সবুজে (মানচিত্রে সাধারণত বাংলাদেশের সুন্দরবনের সবুজ রঙটা একটু বেশি ঘন, যদিও খালি চোখে কিছু বোঝা যায় না), সেখানে একেবারে শেষ হলুদ রঙের সূচিমুখ বিন্দু অথবা পিঙ্গেলটি হবে আদিবাসীপাড়া। যদিও আমি জানিনা আয়লার পর সেটা আদৌ আছে নাকি হরিদ্রাভ আঁশের রেখা খসে মিশে গিয়েছে ঘন সবুজে। স্থানীয় লোকমুখে বসতিটির নাম ছিল আদিবাসীপাড়া, কিন্তু তার বাসিন্দারা নিজেরা কী বলে ডাকত জানা হয়ে ওঠেনি। যদি ভিন্ন কোনো নিজস্ব নামে বসতিটা টিকেও থাকে, আমি চিনতে পারব না।

দুটো ইস্কুল ঘোরার পর সেদিন আমরা গিয়েছিলাম সেখানে, দুলালের বাল্যবন্ধু দিবস কোটালের সঙ্গে দেখা করতে। শেষেরপাড়ায় আমরা আসার দিন সকালে দুলালের বাড়িতে এসে খোঁজ করে গিয়েছিল সে, বলে এসেছিল, এদিকে এলে যেন অবশ্যই একবার দেখা করে যায় দুলাল। দিবস শবর জনজাতির, দুলালের সঙ্গে একই ইস্কুলে পড়েছে, উচ্চমাধ্যমিক পাস।

আদিবাসীপাড়ায় কয়েক ঘর শবরের বাস। আজ থেকে দুশো বছর আগে এদের পূর্বপুরুষেরা এই বন কেটে আবাদ করেছিল। সুন্দরবনের প্রত্যেকটি দ্বীপে এমন একেকটি বসতি ছিল। সুদূর ছোটোনাগপুর থেকে তাদের এখানে এনে বসিয়েছিল ব্রিটিশ এজেন্ট ও স্থানীয় ভূস্বামীরা। তারপর ক্রমশ দ্বীপগুলো ঘিরে বাঁধ দিয়ে হাসিল করে দক্ষিণবঙ্গের মানুষ এসে বসবাস করতে শুরু করল, এই শবর মুণ্ডা জনজাতির মানুষরাও উৎখাত হয়ে হঠে যেতে লাগল। কেউ কেউ কোথাও কোথাও টিকে রইল একটুকরো জমি আঁকড়ে, শেষেরও প্রান্তে, আক্ষরিক অর্থেই।

খাঁড়ির ধার দিয়ে বাঁধের রাস্তা চলে গিয়েছে আদিবাসীপাড়ার দিকে। ভাটা পড়েছে তখন। পাতলা দইয়ের মতো দঁকে একসারি নৌকো গিঁথে রয়েছে, কয়েকটি প্রাচীন ক্যাওড়া গাছ ঝুঁকে পড়েছে তাদের ওপর। দুজন লোক কাঠের পাতলা ফালি দিয়ে ছই বানাচ্ছে, হাতুড়ির শব্দ খাঁড়ির ওপারে বনে চাপা প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরছে। ওদিকটায় জলের ধারে হেঁতালের ঘন ঝোপ। কড়া আর্দ্র গন্ধ এপারে টের পাওয়া যায় শ্বাসের মতো। সূর্য হেলে গিয়েছে বনের আড়ালে। আদিবাসীপাড়ার গোলপাতায় ছাওয়া ঘরগুলো দ্বীপের নমশূদ্রদের ঘরের তুলনায় অনেক পরিচ্ছন্ন, তকতকে। প্রায় প্রতিটি ঘরেই উঠোনের ধারে কিছু-না-কিছু ফুলের গাছ, শীতের গাঁদা গোলাপ, চালে লতিয়ে উঠেছে লাউ কুমড়ো।

প্রতিটি ভিটেয় একটি করে জানলাবিহীন ইটের পাকা ঘর রয়েছে। জানা গেল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৮৮ সালে বিধ্বংসী বন্যার পর সরকারি জনস্বাস্থ্য দপ্তর থেকে বানিয়ে দিয়েছে। ঠিকাদারির বরাত পেয়েছিল দুলালের গ্রামের সেই নেতার ভাই। সরকারি নথিতে আদিবাসীপাড়ার প্রতিটি বাসিন্দা পাকা ঘরে থাকে। দিবস কোটালের ঘরে গিয়ে দেখা গেল ইটের খুপরিতে ডাঁই করা জ্বালানি কাঠ, ঘুঁটে, মাছ ধরার সরঞ্জাম, সদ্যসমাপ্ত টুসু পরবের রাংতা জরির সাজ।

আলোবাতাস নেই তো, ভেতরে গরুও থাকতে চায় না। একবার রাখার চেষ্টা করেছিলাম বুঝলে, তা সে খোঁটা উপড়ে-টুপড়ে এক কাণ্ড! দিবস হাসতে হাসতে বলে।

আমাদের এদিকে আসার খবরটা আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। চোখে চশমা এঁটে কাঁকড়া ধরার কাঠির বাক্স মেরামত করছিল দিবস। আমাদের দেখতে পেয়ে চশমা খুলে ভাঁজ করতে করতে হাঁক পাড়ে— সুরমা, সুরমা!

ওর স্ত্রী ঘর থেকে ছুটে এসে গোলপাতায় বোনা মাদুর পেতে দেয় উঠোনে।

দুলালের বন্ধু দিবসের পাতলা একহারা চেহারা, মাথায় ঘন কোঁকড়া চুলে পাক ধরেছে, গালে দিনকয়েকের না-কাটা দাড়ি। স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বছর তিনেক চুক্তিভিত্তিক পড়িয়েছে দিবস। জেলা থেকে পুরোদস্তুর শিক্ষক নিয়োগের পর কাজটা খোয়া যায়। তখন দুলাল ওকে পরামর্শ দিয়েছিল তফশিলি কমিশনে চিঠি লিখতে, লিখেওছিল দিবস। আদিবাসী ঘরের ছেলেমেয়ে পড়ে যে ইস্কুলে, সেখানে অন্তত একজন আদিবাসী শিক্ষকের পদ সংরক্ষণ করতে হবে— এই ছিল আর্জি। সেই চিঠির কথা চাউর হয়ে যেতে পার্টির নেতারা এসে বলে গেছে এসব সাম্প্রদায়িক কথাবার্তা! এখন চিঠি প্রত্যাহার করে নেবার জন্য চাপ দিচ্ছে ওকে।

কী আশ্চর্য! দাবিটা তো আর অন্যায্য নয়— দুলাল বলে— সংবিধানেই আছে। এখানে সাম্প্রদায়িকতা আসছে কোথা থেকে?

নেতারা বলে, আইন মোতাবেক আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষণ আট পারসেন্ট। ইস্কুলে মাস্টারের পোস্ট তিনখানা। বলে, তুমি তো লেখাপড়া জানো, হিসেব করে বল দিকি তিনটে মানুষের আট পারসেন্ট কত হয়? এই সব বলছে, বুঝলে।

আরও অনেক চ্যাটাং চ্যাটাং শুনিয়েছে জানেন দাদা, শবরের পো বলে!

সুরমা যোগ করে। দিবস হাত নেড়ে থামায় ওকে, মুখে ব্যথাতুর হাসি ফোটে।

আমাদের কথাবার্তার মধ্যে যোগ দিয়েছিল দিবসের স্ত্রী। সপ্রতিভ, আত্মপ্রত্যয়ী সুরমা দুলালের বাড়ির ঘোমটা-ঢাকা বউদের মতো নয়। ওদের বড়ো ছেলে বারুইপুরে ওর দাদার কাছে থেকে পড়াশোনা করে। দাদা রেলের গ্যাংম্যান, কোয়ার্টারে থাকে। ছোটো ছেলেটা পাঁচ বছরের, এখানেই থাকে। এখানকার বাস উঠিয়ে ওদের চলে আসতে বলে সুরমার দাদা। লিখতে পড়তে জানে দিবস, শহরে গেলে কিছু একটা কাজ ঠিক জুটে যাবে। কত মানুষ তো করে খাচ্ছে। সুরমারও তাই ইচ্ছে।

এখানে তো কিছু নেই আমাদের জন্য, সুরমা বলে। আসছে বছর ছোটোটা ইস্কুলে যেতে শুরু করবে। শুনছি এই দুপুরের খাবারের ইস্কিমটা নাকি উঠে যাবে। আমি বলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটিবার তো চলো, দেখে আসি। কিন্তু ও কানে নেয় না। আপনি একটু বুঝিয়ে বলেন তো দাদা।

দিবস ফের হাসে, ক্লান্ত ম্লান হাসি ; গালে হাত বুলোয়।

যাব বললেই কি যাওয়া যায় ? একটা সিজন জমি ফেলে রাখলে বন হয়ে যাবে। তারপর ফের তাকে বাগে আনা...

একটু খুব শান্ত সমাহিত ভঙ্গি দেখেছিলাম দিবসের। সেটা কোথা থেকে আসে ? ভাগ্যের হাতে প্রতারিত হবার থেকেই কি ? ঠিক বুঝতে পারিনি। আদিবাসীপাড়ায় ওর প্রজন্মে শিক্ষার যা হার, সেখানে দিবস কোটালও একটি আশ্চর্য উপন্যাস হয়ে উঠতে পারত। হয়নি।

ওদের বাড়ি থেকে ফিরে আসছি যখন সূর্য ডুবে গিয়েছে। হেঁতালের ঝোপ থেকে অন্ধকার পাক খেয়ে উঠছে। গোধূলির সিপিয়া আলোয় শান্ত কালিন্দির বিস্তার টলটলে পারদের মতো। জলের ভেতর থেকে একটা অদ্ভুত প্রভা উঠে আসছে ঠিক যেন নদীর তলদেশে কোনো রহস্যময় আলোর উৎস থেকে। বাঁধের ওপর রাস্তার বাঁকে দাঁড়িয়ে আদিবাসীপাড়াটা এক লপ্তে দেখা যায়— মানুষের বসত, চাষের জমি, বাগান, মাছের ঘের... ঠিক যেন কানাতোলা নৈবেদ্যর থালায় সাজানো। আজ থেকে কত কত বছর আগে দিবস কোটালের পূর্বপুরুষ প্রথম এসে বাস হাসিল করেছিল, গভীর বন কেটে চাষের উপযোগী করে তুলেছিল এই মাটি, প্রাণে ধরে সেই মাটি বনকে ফের ফিরিয়ে দিতে পারবে না দিবস।

খালপাড়ে এসে দেখি আমাদের নৌকোটা জল থেকে প্রায় দশ হাত ওপরে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুপুরে জোয়ারের সময় এসেছি, ইতিমধ্যে ভাটা পড়ে গিয়েছে। বোটের তরুণ মাঝি ইঞ্জিনের অন্ধিসন্ধি জানে, কিন্তু বাদাবনের অভিজ্ঞ দাঁড়িমাঝির মতো জোয়ার ভাটার হিসেব জানে না।

হাঁটুডোবা চটচটে কাদা ঠেলে গলুইয়ে উঠে বসে থাকি। জোয়ারের জল উঠে নৌকো ভাসবে আরও প্রায় ঘন্টাখানেক পরে। কেউ কোনো কথা বলি না। ইতিমধ্যে আলো খুব কমে এসেছে। সামনে প্রায় হাতের নাগালে ঘন বন, বনের ভ্যাপসা বুনো শ্বাস, স্থবির সময়।

দিবস কোটালের কথা ভাবি। চরৈবতি নেই ওর জীবনে। পথের দেবতা ওর কপালে অদৃশ্য তিলক পরিয়ে দিয়ে ঘরছাড়া করেনি, বলেনি— চলো এগিয়ে যাই। সেজন্য উপন্যাসের নায়ক হতে পারবে না সে, লোককাহিনির চরিত্র হয়েই থেকে যাবে। ভাবতে ভাবতে চোখ চলে যায় খালের পাশে একটি সরু খাঁড়ির মুখে। একটা নৌকো বাঁধা রয়েছে সেখানে, তার ওপরে একটা মানুষ।

আর তখনই দেখতে পেলাম আমি: প্রায়ান্ধকার ছায়ায় এক বালক, সরু ডিঙির ওপর পা ছড়িয়ে বসে নীল জালের থেকে কী যেন খুঁটে তুলে হাঁড়িতে ভরছে, ওর সুকুমার গ্রীবায় কী অপূর্ব নিবিষ্টতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহসা ওর চোখ পড়ল এদিকে, ভীষণ চমকে গিয়ে জালটা রেখে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল ছইয়ের ভেতর। ছেঁড়া দর্মার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল উজ্জ্বল বিস্ফারিত একটি চোখ।

আমার চিনতে ভুল হয়নি! এই যে তুমি, তোমায় খুঁজে চলেছি আমি কতকাল। খুঁজতে খুঁজতে চলে এসেছি এখানে। কিন্তু তুমি পালিয়েই চলেছ। ইস্কুলের খাতা থেকে পিছলে বেরিয়ে যাও তুমি, রাষ্ট্রের সব খাতা থেকে সরে যাও, হারিয়ে যাও। রাষ্ট্রসঙ্ঘ তোমার হদিশ পায় না।

*

সন্ধ্যাবেলা দুলালের বাড়িতে অপেক্ষা করছিল গ্রামের কয়েকজন মানুষ। তাদের কারোর আবেদনপত্র লিখে দিতে হবে সরকারি দপ্তরে, কিংবা পেনশনের জন্য লাইফ সার্টিফিকেট, কিছু পড়ে মর্মোদ্ধার করে দিতে হবে, নথির ফটোকপি অ্যাটেস্ট করে দিতে হবে— এইসব। গৌরের ছেলে পচা জ্যেঠুর কাছ ঘেঁষে বসে বিপুল উৎসাহে খুঁটিয়ে দেখে সব কিছু, কলম স্ট্যাম্পপ্যাড এগিয়ে দেয়। ওরা চলে গেলে একটি চৌকোনা সাবেকি পেতলের বাক্স নিয়ে আসেন দুলালের মা। মানিককে ডেকে নেন। বাক্সের ভেতর থেকে বের হয় পুরোনো দলিলপত্র, পোস্টাপিসে আমানতের পাশবই ইত্যাদি। আমি কিছুটা দূরে দাওয়ায় দড়ির দোলনায় বসে বসে দেখি। অন্ধকারে লণ্ঠনের আলো ঘিরে পরিবারের তিন প্রাণী, তাদের গম্ভীর মুখগুলো শুধু আলোকিত। লোন, পাম্পসেট, সুদের কিস্তি, মর্টগেজ, আমমোক্তারনামা... শব্দগুলো বাতাসে ভাসে। বাড়ির খুব গুরুত্বপূর্ণ সময় এটা, অন্যদের চটুই হাবভাব চলাফেরা থেকে সেটা বোঝা যায়।

দুলালের বাবা ও মেজভাই গৌর এই বৃত্তের বাইরে খোলা উঠোনে বসে থাকে। মানিকের শ্বশুর এসেছেন পাথরপ্রতিমা থেকে, কুটুমকে সঙ্গ দেয় ওরা। কেউই কোনো কথা বলে না। ছাউনিঘরে কুপি জ্বেলে বসে দুলে দুলে উচ্চারণ করে পড়ে পচা ; পড়া মুখস্ত ও মশা তাড়ানো দুইই চলে একসঙ্গে। বাদাবনের বিখ্যাত মশা— সূর্য ডুবে যাবার পরেই ধোঁয়ার মতো চাপ বেঁধে আসে, গবাদি পশুও মশারির মধ্যে রাখতে হয়। কৃষ্ণপক্ষের রাত যত গড়ায়, অন্ধকারটা ততই গুটিয়ে আসে আলোর চারপাশে, সলতের শিখার টুঁটি টিপে ধরে। কেরোসিন কুপিতে তেল কমে গিয়ে দপ দপ করতে থাকে। লেখাপড়ায় ইতি হয়ে যায়।

দাওয়া থেকে লাফ দিয়ে নেমে পচা চলে আসে পুরুষদের বৃত্তে। কথা বিশেষ বলে না কেউ। উনুনের ধারে দুই বউ রান্না করে। আরেকটি দিন শেষ হয়েছে, এখন রাতের খাবার তৈরি হয়ে ওঠার অপেক্ষা। তারপরেই দিনটা ফুরিয়ে যাবে, কাঁথার ভেতর সেঁধিয়ে যাবে। মানিকের মেয়েটা আজ অনেকদিন পরে ভাত খাবে, ওর শ্বশুর ফিরে যাবেন কাল ভোরবেলা। ঘরের মোরগ জবাই হয়েছে আজ।

শুচিস্মিতাদিদি যেবার এল, কত যে মাছ পড়েছিল। এবার ঘেরে মাছই নেই। আক্ষেপ করেন দুলালের মা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানিকের শ্বশুর বিঘেখানেক জমিতে উচ্ছে বুনেছেন, চারাগুলো সবে এক-দেড় হাত লতিয়েছে। এসময় জমি ছেড়ে কোথাও গিয়ে একবেলার ওপর থাকার উপায় নেই।

আগে তবু জমির জিরেন ছিল, মানুষ দল বেঁধে তীর্থ করতে যেত, এখন ডিজেল পাম্পসেট এসে গিয়ে তিনটে চাষ হচ্ছে বাদার জমিতে। দুলালের বাবা বলেন।

পাশাপাশি দুই বেহাই, শক্ত মাটির উঠোনে পাছা পেতে হাঁটুতে হাতের বেড় দিয়ে বসা, থেকে থেকেই দেহ দোলে মশা তাড়ানোর জন্য। কিছুটা তফাতে বসেছে গৌর। নৈঃশব্দ্যের পুরু আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে বসে আছে যেন সকলে। সেই নৈঃশব্দ্য খুঁচিয়ে কথা টেনে বের করতে হয়, যেভাব বীজধানের গোলা খুঁচিয়ে বের করা হয় ধান। একেকটি কথা, একেকটি বীজ। একেকটি বীজে ঘুমিয়ে থাকে একেকটি ইমেজ। কখনো আবার লাফ দিয়ে ওঠে বাঘের মতো।

এ হল বাঘের দেশ। এখানে প্রতিটি ঘরেই বাঘ পড়ার গল্প আছে। গল্পগুলো শুধু স্মৃতিতে নয়, গেঁথে রয়েছে স্থানে— উঠোন, পুকুরঘাট, সজনেতলা, গোয়াল, খড়গাদা— অদৃশ্য রিলিফের কাজের মতো। বহিরাগতের চোখে সেসব ধরা পড়ে না। শেষবার দুলালদের ভিটেয় বাঘ পড়েছিল বছর পাঁচেক আগে, ওদের গরুটা বিয়োনোর পর। গোয়ালের পেছনদিকে দরমার ফাঁক গলে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছিল। বাড়ির কুকুর চীৎকার করে ডাকাডাকি করে ক্ষতি সামলে দেয়, কিন্তু নিজে থাবার আঘাতে প্রাণ হারায়। সে ছিল এখনকার এই কুকুরটির মা।

সুন্দরবনের সব বাঘই যে মানুষখেকো এমন নয়, তবে এখানে সব মানুষ সম্ভাব্য বাঘমার। চিটে গুড় বাঘের প্রিয় খাদ্য। গুড়ে কীটনাশক মিশিয়ে জঙ্গলে গাছের গায়ে মাখিয়ে রেখে বাঘ মারা তেমন কিছু কঠিন ব্যাপার ছিল না কিছুকাল আগেও। মরা বাঘের ছাল ছাড়িয়ে, দাঁত-নখ উপড়ে পুঁতে দিত গ্রাম্য শিকারিরা। তারপর সেই গর্ত খুঁড়ে হাড়গোড় থেকে ওষুধ বানাবার লোকও ছিল।

কিছুই ফেলা যায় না, মানিক জানায়। ঠিকমতো খদ্দের ধরা থাকলে তা ধরেন পেরায় দু-তিন লাখ টাকার জিনিস আছে একেকটার শরীলে। তবে আজকাল ধরপাকড় সাজা বেড়ে গিয়েছে, আমাদের এদিকে ওসব কাজ আর কেউ করে না।

আগে মানুষ বড়ো বাগানে ঢুকে বাঘ মারত, এখন বাঘ গ্রামে ঢুকে পড়ছে। টিভিতে দেখায় না? মানিকের শ্বশুরমশাই বলেন।

এই ভাটির দেশে লোকেরা অভয়ারণ্যকে বলে বাগান; বড়ো বাগান, কিংবা সরকারি বাগান।

তবে আগে সম্পর্কটা এমন ছিল না, দুলালের বাবা বলেন। এসব হয়েছে মরিচঝাঁপির পর। তার আগের বছর প্রজেক্ট টাইগার হল, বনের ভেতরে ভেতরে অনেকগুলো গাঁ জোর করে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। ওরা টের পেয়ে গেল এই বাদাবনটা ওদের, মানুষের নয়। মরিচঝাঁপির পরে নোলাটা বেড়ে যায়।

চিংড়ির ঘেরে গরানছিটের ঘরের আশেপাশে বাঘের আনাগোনা দুলালের বাবার গা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সওয়া। কিন্তু লক্ষ করি, এই প্রসঙ্গে ওঁর কথার ভঙ্গিতে একধরনের সূক্ষ্ম সম্ভ্রম রয়েছে, যা মানিকের কথায় নেই। একটি শূন্যস্থানের মতো, অনুচ্চারিত মেটাফোরের মতো বাঘের দৃশ্যকল্প জমাট অন্ধকারে ক্রমশ বিস্ফারিত হতে থাকে, হতে হতে গোটা উঠোনটা গিলে নেয়। তার ভেতরে গৌরের বউয়ের মুখটা শুধুমাত্র ভেসে থাকে উনুনের কাঁপা কাঁপা আভায়। দাওয়ার ওপর দিয়ে একটা লণ্ঠন চলে যায়, গরাদের ডোরাকাটা ছায়া মাটির দেয়ালে সরে যায়।

কুকুরটা ডাকছিল বেশ কিছুক্ষণ ধরে। বাঁধের ওপর রাস্তা দিয়ে ডাকটা চলে যাচ্ছিল দূরে, আবার ফিরে আসছিল। সকলে সচকিত হয়ে ওঠে, কথা থেমে যায়। কেবল ভাত ফোটার খদবদ শব্দে ভরে ওঠে উঠোন। হয়তো কয়েক মিনিট, কিন্তু মনে হয় যেন কয়েক যুগ, গাছপালার নীচু ডালে আলো সরে যেতে থাকে। আলোটা এদিকেই আসছে। কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করতে করতে উঠোনে চলে আসে। কয়েকজন মানুষ, তাদের হাতে লণ্ঠন।

দুলালের বাবাকে নিয়ে যেতে এসেছে ওরা। গ্রামে একটি মেয়েকে সাপে কামড়েছে। ওঝা আসছে, কিন্তু ওঝার একার কাজ নয় এটা। হাত চালতে হবে। দুলালের বাবা হাত চালা জানেন। বিষটা ঠিক কোথায় কতদূর গিয়েছে সেটা জানা দরকার।

মুহূর্তের মধ্যে উঠোনের অন্ধকার আর মৌনশব্দ ফর্দাফাঁই হয়ে যায় লণ্ঠন টর্চের আলোয়, মানুষের কণ্ঠস্বরে। আলোছায়ার মধ্যে আগন্তুকের দলটা চতুর্গুণ হয়ে যায়।

সাপে কামড়েছে তো হাসপাতালে না পাঠিয়ে এসব কী হচ্ছে? আমি জানতে চাই।

হাসপাতাল হাসনাবাদে, জেলার ছঘণ্টার পথ। সেখানে গেলেও সিরাম পাওয়া যাবে কিনা কেউ জানে না। দলের মধ্যে থেকে একজন জানায়। দলাপাকানো ছায়ার মধ্যে থেকে তাকে আলাদা করতে পারি না আমি।

মিনিট খানেকের মধ্যেই দুলালের বাবাকে সঙ্গে নিয়ে চলে যায় দলটা। আলোগুলো সরে যেতে অন্ধকারটা যেন আরও ঘন হয়ে আসে। ভাতফোটার শব্দ থেমে গিয়েছে, বাতাসে সোঁদা সুবাস। কয়েক মুহূর্ত আগের ব্যাপারটা অলীক মনে হয়। মাথার ওপর স্বচ্ছ আকাশের গায়ে তারা খসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মউলের মুখোশ

কোমর থেকে দেহের ঊর্ধ্বাংশ সামনে বাঁকিয়ে দ্রুত হাঁটেন দুলালের বাবা, হাতদুটো পিছনে জড়ো করা, দুটো পা কোনাকুনি চলে কাঁচির ফলার মতো। চিংড়ির ঘেরে বাঁধ দেওয়া এবড়োখেবড়ো পথে আমায় ঘুরিয়ে দেখালেন সকালবেলা। আগের দিন ফিরতে অনেক রাত হয়েছে, বাড়ি না গিয়ে সোজা এখানেই চলে এসেছেন। মেয়েটি বেঁচে গিয়েছে, সাপটা বিষধর ছিল না।

ছোট্ট ঘেরের ঘরে বেশিরভাগটাই কাঠের খুঁটি পুঁতে মাচা করে বিছানা, নীচে মাছ ধরার সরঞ্জাম রাখা থাকে। চালের বাতায় ঝুলছে একটি থেলো হুঁকো। একজন মানুষ কোনোক্রমে ভেতরে থাকতে পারে, লম্বা মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়াতে গেলে চালে মাথা ঠেকে যায়। বাইরে বাঁশের মাচায় এসে বসি আমি ও দুলালের বাবা। চারপাশে জনমনিষ্যি দেখা যায় না। সামনে হাতকয়েক দূরত্বে কোড়েখালি, ওপারে বন। কিছুক্ষণ আগে জোয়ার এসেছে। সস্ত্রীক গৌর এসে পাইপ ফেলে সাইফোন করে দিয়ে গিয়েছে বাঁধের ওপর দিয়ে, কলকল করে ঘেরে জল ঢোকার শব্দ হচ্ছে। বসন্তের সকালের উজ্জ্বল আলোয় ভেসে যাচ্ছে চারদিক। বিগত রাতের ঘন তমসাময় রহস্যের ছিটেফোঁটাও নেই কোথাও। স্নিগ্ধ ঝিরিঝিরি হাওয়া দিচ্ছে, কাঁকড়া গাছের তৈলাক্ত পাতাগুলো ঝিকমিক করছে। বনে সবুজের বিভিন্ন বর্ণাভা, তাতে আতঙ্কের রেশ নেই। কিছুটা দূরে গাছগাছালির ছায়ায় একসার মৌমাছির বাক্স পাতা আছে। পাড়ে বাঁধা ডিঙি। মানুষের নিবিড় ঘরগেরস্থালি।

ওপার বাংলা থেকে পঞ্চাশের দাঙ্গায় বিতাড়িত হয়ে দুলালের বাবা যখন আসেন, এই দ্বীপের চেহারা এমন ছিল না। সমসের নামে এক হাজি সাহেবের ইজারা নেওয়া চর ছিল এটা। ওপারে তখন খুব হানাহানি চলছে। সবকিছু ফেলে রেখে একবস্ত্রে চলে আসতে হয়েছিল। গ্রাম থেকে ছোটো ছোটো কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে ওঁরা দেশ ছাড়েন রাতের অন্ধকারে, নিঃশব্দে, যেভাবে নদীর পাড় ভাঙে। গ্রামের অদূরে ছিল মিয়াদের পাড়া, মধ্যিখানে মাঠ। বাড়ির সকলে চলে যাবার দিন সন্ধ্যায় নিয়ম করে শাঁখ বাজিয়েছিলেন দুলালের বাবা, প্রদীপ জ্বেলেছিলেন, ঘরে ঘরে লণ্ঠন, তারপর ভোরবেলা একটি পেতলের ঘটি হাতে নিয়ে মাঠ সারতে যাবার অছিলায় বেরিয়ে চলে আসেন। হিঙ্গলগঞ্জে এসে গ্রামবাসীদের নৌকাগুলোর দেখা মিলল।

অনেকে ভাগ্যের সন্ধানে হাসনাবাদ হয়ে কলকাতায় যাবার জন্য জোয়ারের অপেক্ষা করছিল। হাসনাবাদ থেকে কলকাতা মাটিন-বার্নের ছোটো রেল চলত সেকালে। কেউ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ দিশাহারা ছিল। গ্রামের মানুষ তারা, জীবনে কখনো বড়ো শহর দেখেনি। দুলালের বাবা তাদের বুঝিয়েসুঝিয়ে রাজি করিয়ে ভাটার মুখে নৌকো ছেড়ে দেন। আজন্ম ভাটির দেশে বাস, সেই টান অগ্রাহ্য করা এক জীবনের কর্ম তো নয়।

পুরোনো দিনের কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে থেমে যান বৃদ্ধ, দূরে অন্যমনস্ক চেয়ে থেকে হাতের চেটো দুটো হাঁটুর নীচে ঘষতে থাকেন। ঘেরে জলের শব্দ অবিরল।

একাত্তরে যুদ্ধ হল, কালিন্দির পাড় বরাবর গোলাগুলি চলল। সমসেরনগরে মিলিটারি ছাউনি পড়েছিল। গ্রামসুদ্ধু সবাই দুয়েকজন করে ভিটে পাহারায় রেখে পালিয়ে গিয়েছিল কুমিরমারির দিকে। কুঁড়েঘরের মেঝেয় দশহাত গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে আঠেরো দিন কাটিয়েছেন তাঁর মা, দুলালের ঠাকুমা। দিনরাত কেবল বোমারু বিমানের গোঁ গোঁ শব্দ আর চারিদিকে গরুর দাপাদাপি আর আর্ত রব শুনেছেন। তারপরে তো উদ্বাস্তুর ঢল নামল।

খাবারদাবার, বাচ্চার জন্য দুধ, গোয়ালঘরে একটু আশ্রয়ের বিনিময়ে ওদের কাছ থেকে গয়নাগাটি, বাসনকোসন হাতিয়েছে শেষেরপাড়ার সবাই। দুলালের বাবা এসব করেননি। বিশবছর আগে নিজেরা ছিন্নমূল হয়ে আসার ঘা শুকোয়নি তাঁর মনে। শুধু একবার একটি পরিবার ভিটে থেকে উপড়ে-আনা জানলা-দরোজার কাঠ কেটে উনুন ধরানোর আয়োজন করছে দেখে জ্বালানি কাঠের বিনিময়ে সেগুলো কিনে নিয়েছিলেন দুলালের মা ; ভেবেছিলেন পাকা ঘর উঠলে কাজে লাগবে। পাকা ঘর ওঠেনি। দাওয়ার চালে ফ্রেমগুলো মাচার মতো করে হাঁড়িপাতিল রাখা আছে দেখেছি।

ঝুপড়ির ভেতর থেকে সঙ্গে আনা সেই ঘটিটা বের করে এনে আমায় দেখালেন দুলালের বাবা। এই ঘটিতে জল পান করেন তিনি, শুধুমাত্র এই ঘটিতেই ; তা না হলে নাকি ঠিক তৃপ্তি হয় না। পেতলের ঘটি সম্ভবত জলে মিথেনের বিক্রিয়ায় ব্রোঞ্জের মতো লালচে রং হয়েছে। ঘটিটি তাঁর সঙ্গে থাকে সর্বক্ষণ।

জানো অপু, অতীত এখনও সাজানো স্মারক নয়, বহমান দৈনন্দিন। কিংবা মাটির গর্ভে হারানো অরণ্যের জীবাশ্ম, বিস্মৃতি পলি খুঁড়লে উঠে আসে, বিচিত্র ইতিহাস আর মিথে ঠাসা। একটা আশ্চর্য উপন্যাস...

একটি ছেলে নয়, একটি জনগোষ্ঠী আর এক দ্বীপের কাহিনি।

ইতিহাসের ফেরে স্বদেশভূমি থেকে উৎখাত হয়েছিল তারা, তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল সুজলাং সুফলাং বাংলা থেকে অনেক দূরে, মধ্যভারতের অরণ্যপ্রদেশে। সেখানে প্রকৃতি উষর, মাটি পাথুরে, রোষকষায়িত চোখের মতো লাল। তার বেশ কিছুকাল পরে দেশের ভেতর থেকে আবার জন্ম নিল এক দেশ, আবার ছিন্নমূল কিছু মানুষ। বহু বছর অপেক্ষার পর তারা এসেছিল এক বিজন দ্বীপে, বন কেটে বসত গড়তে। সুন্দরবনে দুশো বছরের প্রবহমান ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচনা করবে বলে এসেছিল তারা। ভাটির দেশের বাসিন্দাদের মতোই তারা ছিল সমাজে নিম্নবর্গের, উদ্যমী আর কৃষিপটু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং সংগঠিত। আসার পর মাস কয়েকের মধ্যেই বন কেটে বসত আবাদ করতে শুরু করে দিল। নদীতে বাঁধ দিল, এছাড়া রাস্তাঘাট, নর্দমা, বাজার, তাঁত, নৌকো তৈরির কারখানা, ডিসপেনসারি, ইস্কুল... হ্যাঁ, ইস্কুলও— সবই নিজেদের শ্রম আর সামর্থ্য দিয়ে। আশেপাশে দ্বীপের বাসিন্দারা নৌকো করে গিয়ে দেখত কীভাবে শূন্য থেকে একটি দেশ গড়ে তুলছে একদল মানুষ। সেই দৃশ্য দেখে ওদের মনে পড়ে যেত বাপঠাকুর্দার মুখে শোনা পুরোনো দিনের গল্পকথা। সেখানে রাষ্ট্র ছিল না, অনুদান যোজনা বিপিএল কার্ড রেশন কার্ড কেরোসিনের কোটা কিছুই ছিল না। কিন্তু দিনকাল বদলেছে, রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে বাদাবনের মানুষেরাও। রাষ্ট্র মানে সরকার, কিছুকাল আগে রাজ্যে এক নতুন সরকার এসেছে তখন। আর ঠিক সেইসময় সুন্দরবনে বাঘের সংরক্ষণের জন্য ঘোষণা হয়েছে প্রকল্প, বিভিন্ন দ্বীপ থেকে মানুষকে সরিয়ে বাঘের জন্য সংরক্ষিত হয়েছে বন। আমাদের কাহিনির এই দ্বীপটা ছিল তার মধ্যে একটি। আইনের হাতিয়ার ছিলই, কিন্তু তার থেকেও বড়ো কথা, রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেদের উদ্যমে ভাগ্য গড়ে নিচ্ছে একদল মানুষ, নিজেদের গা থেকে রাষ্ট্রীয় গলগ্রহের (পার্মানেন্ট লায়েবিলিটি) তকমাটা মুছে ফেলছে।

রাষ্ট্র ভয় পেয়েছিল।

প্রথমে ভয় দেখিয়ে তুলে দেবার, মধ্যভারতের সেই উষর অরণ্যে ফের ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা শুরু হল। তাতে কাজ হয়নি। বারবার উচ্ছেদ হতে হতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল মানুষগুলোর। সঙ্ঘবদ্ধ ছিলই, এবার আন্দোলনের পথে নামল তারা। মিটিং জমায়েত জনমত তৈরি, বেঁধে-বেঁধে থাকা— নদীবাঁধে ফাটল দেখা দিলে বাদাবনের মানুষ ফাটলের মুখে পরস্পরে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আক্ষরিক অর্থেই যেভাবে বেঁধে-বেঁধে থাকে। ওরা এমনকি কলকাতা থেকে লেখক-সাংবাদিকদের নিমন্ত্রণ করে এনে দেখাল নিজেদের হাতে গড়া ছোট্ট উপনিবেশ। তখনও সুশীল সমাজ কথাটা চালু হয়নি, এদিকে সদ্য শেষ হয়েছে কালো অস্থির রক্তঝরা দিন। রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে নতুন দল বিপুল আশা আর জনসমর্থন নিয়ে। একটি দ্বীপ আর এক জনগোষ্ঠীর এই আশ্চর্য উপন্যাসের মুখবন্ধ পৌঁছল না দেশের কানে।

তারপর নেমে এল রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। পুলিশ লঞ্চের সাহায্যে কর্ডন করে ঘিরে ফেলা হল দ্বীপটিকে— মধ্যযুগীয় রণকৌশলের বেড়াজাল। খাবার নেই, ওষুধ নেই। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র বাহন ওদের নৌকোগুলোকে ডুবিয়ে দেওয়া হল। চিকিৎসার অভাবে রোগী মরল, সন্তান প্রসব হল। তারপর একদিন মধ্যরাতের অন্ধকারে নেমে এল শয়ে শয়ে পুলিশ আর ভাড়াকরা ঠ্যাঙাড়ে বাহিনি। নারী পুরুষ বৃদ্ধ শিশু নির্বিশেষে চলল ধরপাকড়, লঞ্চে তারপর ট্রাকে বোঝাই করে গণপাচার। মা হারাল কোলের শিশুকে, ছেলে হারাল বৃদ্ধ বাবা-মাকে, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল অনেক পরিবার।

অনেকেই মাটি কামড়ে পড়ে রইল। নোনা রক্তের জান, দেশভাগ দাঙ্গা সব সয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাটি কামড়ে স্বদেশে থেকেছে কতকাল। আবার মধ্যভারতের অরণ্যভূমি থেকে ঘটিবাটি বেচে কতটা পথ পেরিয়ে এখানে এসেছে। সহজে ছাড়ে? ছাড়েনি। তারপর গুলি চলেছে নির্বিচারে। লাশগুলো নিয়ে গিয়ে ফেলা হয়েছে নদীর মোহনায়। ঠিক কতজন হত্যা হয়েছে, কতজন নিরুদ্দেশ হয়েছে, তার কোনো হিসেব কোথাও নেই। কতগুলো লাশ কুমির কামটের খাদ্য হয়েছে, কতগুলো জোয়ারে ভেসে ভেসে ছড়িয়ে পড়েছে খাঁড়িতে বিজন দ্বীপে, তারও কোনো হিসেব নেই। পচা আধপচা মানুষের মাংসে সুন্দরবনের বাঘেদের প্রথম গণভোজ হল সেবার।

তখন তো এত ভুটভুটি বোট ছিল না, দুলালের বাবা বলেন। কিছু কিছু ট্রলার ছিল, আর লঞ্চ। সব তুলে নেয়। মরা আধমরা বডিগুলো রায়মঙ্গল হেড়োভাঙার মুখে নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল। আধমরা কিছু কিছু ভেসে ভেসে ডাঙা পেয়ে গাছের ডালে লটকে বেঁচেও যায়। তারা আর ফিরতে পারেনি নিজের লোকদের মধ্যে। ভিখমাঙা ভবঘুরে হয়ে দ্বীপে দ্বীপে ঘুরে বেড়াত। এখনও তাদের কেউ কেউ আছে। ভাটির দেশে লোকেরা ওদের চেনে, ভিখ মাঙতে এলে ফেরায় না।

ফাল্গুনের স্নিগ্ধ সকাল, উজ্জ্বল রোদ, সবুজ বনানী আর জলের কলকল ধ্বনির ভেতর বুঝি জেগে থাকে এক বিচিত্র প্রেতচ্ছায়া, অন্ধকারের গল্প বলে।

এখানে বনে মধু সংগ্রহ করতে যায় যে মউলেরা, বনদপ্তর থেকে তাদের এক ধরনের মুখোশ দেয়। মাথার পিছনে পরে নিতে হয় সেটি। দেখলে মনে হবে যেন পিছন দিকে চেয়ে আছে দুই মুখওয়ালা মানুষ। এতে নাকি বাঘ বিভ্রান্ত হয়, আক্রমণ করতে পারে না। দুলালের বাবাও যেন সেইরকম, তাঁর একটি মুখ ফেরানো আছে অতীতে, সময়ের খাঁড়ি দিয়ে একলা ডিঙি বেয়ে চলেছেন। বিস্মৃতির বাঘ তাঁকে কোনোদিন খেতে পারবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্লেটরঙের ছায়া

দুলালের বাড়িতে এসে ওর মায়ের মুখে বারেবারেই শুনছিলাম এক শুচিস্মিতাদিদির কথা। নামটা উচ্চারণ করার সময় প্রতিবার ওঁর মুখে একটা কোমল অভিব্যক্তি ফুটে উঠছিল।

কে এই শুচিস্মিতাদিদি ? দুলালকে জিজ্ঞেস করায় একটু যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়ল।

আমার সঙ্গে রিসার্চ করত আইএসআই-তে। এখন আমেরিকায় সেটলড। বছর কয়েক আগে একবার বেড়াতে এসেছিল আমাদের বাড়ি।

তখন আর কিছু বলেনি। পরদিন সমসেরনগরে একটি স্কুলে যাওয়ার ছিল আমার, ফিরে এসেছিলাম দুপুরের আগে। সেদিন বাড়িতে কেউ বিশেষ ছিল না। মানিক গিয়েছিল কালীতলায় পোস্টাপিসে ; গৌর ছিল মাঠে ধান কাটার কাজে, ওর বউ তাকে সাহায্য করছিল। ওদের বাবা ছিলেন যথারীতি ঘেরের ঘরে, ছোটোরা ইস্কুলে। দাওয়ায় মশারির ভেতর থেকে বৃদ্ধা ঠাকুমার ঘোঁসফোঁসে শ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। দুপুরে খাবার পর অলস প্রহরে আমায় নিয়ে বাড়ির ছোট্ট ডিঙি নৌকো বেয়ে বেরিয়ে পড়েছিল দুলাল, সঙ্গে ওদের কুকুরটা।

AMARBOI.COM

সুন্দরবনের ছেলে, নৌকো চালানোর অভ্যাসটা যে এতকাল নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত হবার পরেও চলে যায়নি সেটা ওর দাঁড় চালনার ভঙ্গিতেই বোঝা গিয়েছিল। কোড়েখালির দোয়ানি খালে দুদিক থেকে বিপরীতধর্মী জোয়ারের টানে খুব দক্ষভাবে ঝাঁঝি টেনে ঢুকে পড়ল একটা সরু পাশিখালে। হাত তিনেক চওড়া খাল, ভাঁটায় নৌকো ঢোকে না। তখন জোয়ারের জল দুপাশে গাছের শ্বাসমূল ঢেকে দিয়েছে। লগি ঠেলে খানিকদূর যাবার পর দুদিক থেকে গাছের সরু ডালপালা ঘন হয়ে এল নৌকোর দুপাশে। ঠিক যেন সবুজ সুড়ঙ্গের মতো ; ভেতরে অদ্ভুত নৈঃশব্দ্য। মাথার ওপরে সূর্য ঢাকা পড়েছে পাতার আড়ালে, কৃচিৎ তার রশ্মি পড়েছে জলে। তরল মুক্তোর সবুজাভ আলোয় গোটা বন দীপ্যমান হয়ে আছে ক্যালিডোস্কোপের মতো ; দৃষ্টি এদিক ওদিক সামান্য ঘোরালে সবুজের নকশা বদলে যায়। জলের ওপর জেগে থাকা নাম-না-জানা গাছের শাখায় অসংখ্য ছোটো ছোটো ফুল ফুটে আছে, তাতে ভনভন করছে মৌমাছি, কয়ারের দলের মতো জঙ্গলটাকে এক সজীব ক্যাথিড্রাল করে তুলছে। কোথাও আবার টুপটুপ করে ফুল ঝরে পড়ছে জলে, ক্ষীণ স্রোতে ভেসে চলেছে ফুলের লম্বা বিনুনি, ওপরে উড়ন্ত মৌমাছি। কুকুরটা গলুইয়ের ডগায় বসে আছে স্থির হয়ে, সামনের পায়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝুঁকে, যেন নৌকোরই অংশ, নাকটা মাঝে মাঝে ঘোরাচ্ছে এদিক ওদিক। বিপদের গন্ধ পাচ্ছে কি? আঁশটে নোনা জল আর ফুলের ক্ষীণ সোঁদাল গন্ধ ছাড়া আর কিছু ধরা পড়ে না আমাদের নাকে।

এখানে এসে দুলাল নিজে থেকেই শুচিস্মিতার প্রসঙ্গ তুলল। ওর মতোই বিশুদ্ধ অঙ্কের একটি দুরূহ এলাকা নিয়ে কাজ করছিল সে। উত্তর কলকাতার বনেদি পরিবারের মেয়ে, সচ্ছল। মূলত শুচিস্মিতার উদ্যোগে উচ্চতর গবেষণার জন্য আমেরিকার মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেলোশিপের ব্যবস্থা প্রায় পাকা হয়ে এসেছিল। ক্লিভল্যান্ডে ওর এক মামা থাকতেন। কথা ছিল শুচিস্মিতা প্রথমে যাবে, ওখানে সব বন্দোবস্ত হয়ে গেলে তারপর দুলাল যাবে। যাবার আগে সে এসেছিল দুলালের বাড়িতে।

দুলাল আমেরিকা যায়নি। তখন ইমেল-মোবাইলের যুগ শুরু হয়নি, তবু শুচিস্মিতা বার বার যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছে। দুলালের জন্য একটা টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ জোগাড় করে ফেলেছিস সে; ভিসাও মঞ্জুর হয়েছিল। দুলাল কিন্তু যায়নি।

সেদিন দুপুরে ওই নিথর সবুজ বনে নৌকোয় মুখোমুখি বসে না যাওয়ার যে কারণটা ও আমায় বলেছিল, সেটা আমার মনে হয়েছিল আংশিক।

এমন একটা সুযোগ জীবনে খুব একটা আসে না সেটা জানতাম। কিন্তু এটাও জানতাম যে যা নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছিলাম, পিওর ম্যাথেমেটিক্সের ওই এরিয়াটায় বেশিদূর যাওয়া হবে না আমার। গেলে শুচিস্মিতার জন্যই যাওয়া হতো।

আরও কিছু কথা সেদিন আমায় বলেছিল দুলাল। আপাতভাবে অপ্রাসঙ্গিক, খণ্ডিত, দীর্ঘ নীরবতায় ভরা। কথাগুলো এখন আর স্পষ্ট মনে নেই আমার। কিন্তু সম্ভবত যে কথাটা দুলাল বলতে চেয়েছিল, সরাসরি বলেনি, তা হল— শুচিস্মিতার পিছু পিছু যে জীবনটায় গিয়ে পড়ত সে, তার জন্য এই জীবনটা ছাড়তে হতো। এই দুটো জীবন যে কোনো বিন্দুতে এসে মেলে না, সেটা গোড়া থেকেই জানত সে। জানাটা বদ্ধমূল হল শুচিস্মিতা ওদের বাড়িতে আসার পর।

না, শুচিস্মিতার তরফে কোনো খামতি ছিল না। এখানে এসে চারদিন ছিল, দুর্গাপুজোর আগে ভ্যাপসা গরমের সময় ছিল সেটা। আজন্ম শহরের মেয়ে বাদাবনের গ্রাম্য জীবনে যেভাবে মানিয়ে নিয়েছিল, যে সহজ আন্তরিকতায় সবাইকে আপন করে নিয়েছিল, তাতে বিমুগ্ধ হয়েছিল দুলালের গোটা পরিবার। কিন্তু মুগ্ধতা ছাড়াও আরও কিছু ছিল, বিশেষত দুলালের মায়ের মুখে। সাইক্লোন আসার ঠিক আগে যেমন একটা অবর্ণনীয় ছায়া শ্লেটরঙা আকাশ থেকে নেমে সুন্দরবনের এই শেষ বসতির মানুষদের চোখে এসে পড়ে, সেই চেনা ছায়া সে দেখেছিল ওর মায়ের চোখে।

চেনা ছায়া। চেনা কাহিনি। হিঙ্গলগঞ্জ থেকে ভাটির টানে নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন দুলালের বাবা। সেই জীবনের টান ওর রক্তে। দুলাল অপু নয়, দিবস কোটালের বন্ধু। অপুর ঠিকানা ছিল পথ, দুলালের সপ্তাহান্তে একটা গন্তব্য ছিল। তবু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকটা পথ হেঁটেছে সে। অন্ত্যজ পরিবারের সন্তান, পড়েছে বিজ্ঞান নিয়ে ; বিশুদ্ধ গণিতশাস্ত্র— মেধাই যার একমাত্র উপজীব্য, নাগরিক সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। অক্ষরের অপু কলেজে হিউম্যানিটিজ নিয়েছিল।

শুচিস্মিতাও লীলা নয়। এক তামিল অধ্যাপককে বিয়ে করে এখন সিয়্যাটলে থাকে, একটি সফটওয়্যার কোম্পানিতে কাজ করে। দু-বছর অন্তর শীতে কলকাতায় বাপের বাড়ি আসে। দুলালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়। দেখা হয়নি, তবে ফোনে কথা হয়েছে কয়েকবার। একটি কন্যাসন্তান আছে ওর। দুলালের জীবনে আর কোনো নারী আসেনি।

*

আয়লার ঝড়ে তছনছ হয়ে গিয়েছিল দুলালের পৃথিবী। ঘরের চাল উড়ে গিয়েছিল, বাঁধ ভেঙে জল উঠে এসেছিল ভিটের ওপর। ওর পরিবারে কোনো প্রাণহানি হয়নি, তবে একটি গরু ভেসে যায়। আটদিন ভাঙা বাঁধের ওপর অবর্ণনীয় অবস্থার মধ্যে কাটায় বাড়ির সকলে, যতদিন না উদ্ধারকারী দল আসে। তার আগে উদ্ধারকারী সেজে ডাকাতের দল এসেছিল। যার যা কিছু অবশিষ্ট ছিল লুঠপাট করে নিয়ে যায়, মানুষগুলোকে প্রাণে মারেনি। তবে আদিবাসীপাড়াটা সত্যিই খসে গিয়েছে মানচিত্র থেকে, সেখানকার মানুষগুলোও। দিবস ও তার পরিবারের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি আর। শেষেরপাড়া টিকে আছে বটে, কিন্তু আর আগের মতো নেই। বাঁধ ভেঙে জল ঢুকে এসেছিল চাষের জমিতে, বেশিরভাগ জমিতেই নুন জমে পতিত হয়ে পড়েছে।

ইতিমধ্যে আমাদের কর্মস্থল আলাদা হয়ে যায়। দুলাল বদলি হয় জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। এক শীতের মরা বিকেলে ওর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল কলেজ স্ট্রিটে। বছর পাঁচেক পরে দেখা, কিন্তু খুবই ধ্বস্ত দেখায় ওকে ; চুলগুলো সব পেকে গিয়েছে, চোখের দুপাশে বলিরেখা। কিছু বই কিনতে এসেছে, এখান থেকেই সোজা শিয়ালদায় গিয়ে উত্তরবঙ্গের ট্রেন ধরবে। হাতে কিছুটা সময় ছিল, কফিহাউসে অনেকদিন পর মুখোমুখি বসে ওর পরিবারের খবর পেলাম। আয়লার পরে-পরেই টাইফয়েডে মারা যান দুলালের মা, ছোটোভাই মানিক এখন সপরিবারে থাকে পাথরপ্রতিমায়, শ্বশুরের থেকে পাওয়া জমিতে চাষবাস করে। ওদের বাবাও বেশিরভাগ সময় ওখানে গিয়ে থাকেন। শেষেরপাড়ায় ভিটেয় নতুন ঘর তোলা হয়েছে, সেখানে সস্ত্রীক গৌর অথর্ব ঠাকুমাকে নিয়ে থাকে। জীবনে এত যুদ্ধ দাঙ্গা প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখেছেন যে নারী, একটা সাইক্লোন তাঁকে শেষ করতে পারেনি। তবে ওদের পরিবারটা ছত্রখান হয়ে গিয়েছে।

গোটা গ্রামে বেশিরভাগ পরিবারেরই ছবি এটা। নুন জমে জমির চরিত্র বদলে গিয়েছে, চাষ আর বিশেষ কিছু হয় না। অনেক মানুষ গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছে ভাগ্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্ধানে, বিশেষত পুরুষেরা। গ্রামে নারীপাচারকারীদের আনাগোনা বেড়েছে, অনেক মেয়ে হারিয়ে গিয়েছে। একটা গোটা প্রজন্ম স্কুল-ছুট হয়ে পড়েছে। তবু এর মধ্যে একটুকরো ভালো খবর: গৌরের ছেলে পচা দুলালের কাছে থাকে এখন, জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলে পড়ে, সামনের বছর উচ্চমাধ্যমিক দেবে। ওর জন্য বই কিনতেই কলেজ স্ট্রিটে এসেছিল দুলাল।

শুচিস্মিতাও ভালো আছে। আরেকটি সন্তান হয়েছে ওর, পুত্র। গত শীতে সপরিবারে ডুয়ার্সের জঙ্গলে বেড়াতে গিয়েছিল, দুলালই সব বন্দোবস্ত করে দেয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ অধ্যায়

হেয়ার সাহেবের পালকি

ইস্কুলে সাজো সাজো রব। সর্দার প'ড়োরা সকালবেলা এসে উঠোন ঝাঁট দিয়ে ঘোড়ানিম গাছটা থেকে ঝরে পড়া পাতা সাফ করেছে। সবকিছু টিপটপ, ধোপদুরস্ত। এমনকি অঙ্কের বিধুমাস্টারও রোজকার তাপ্পিমারা ফতুয়াটা ছেড়ে একটা গলাবন্ধ সার্জের মেরজাই পরে এসেছেন। ফাগুন মাস, গায়ে সার্জ চাপাবার মতো ঠান্ডা আর নেই। কিন্তু ভদ্রসমাজে পরবার মতো বিধুমাস্টারের ওই একখানিই আছে, অবরেসবরে তোরঙ্গ থেকে বের হয়। তাঁর কপালে বিনবিনে ঘাম জমেছে। তবে সেটা ঠিক মেরজাইয়ের জন্য নয়। সদর থেকে ইন্সপেক্টার সাহেব আসছেন ইস্কুল পরিদর্শনে। বিধুমাস্টারের বুকে দুরুদুরু আশা, ওঁর পদটা যদি ইন্সপেক্টার সাহেব অনুমোদন করে দেন। মাসে গেলে যা পাওয়া যায়, তাতে ঠিকমতো সংসার চলে না। এদিকে ইস্কুলে ছেলে ঠ্যাঙানোর ঝক্কি কম নয়, সেইসঙ্গে রয়েছে জমিদারবাড়ির তিনটি উপোগুকে সকাল-বিকেল প্রাইভেট কোচিং। কিন্তু আর কীই বা করার আছে ? বলতে গেলে ওদেরই স্কুল। হুজুরদের দয়ায় ভাত-কাপড়টা যা হোক কোনোমতে হয়। বাকিটা এখন ইন্সপেক্টার সাহেবের মর্জি।

সাহেব অবশ্য প্রকৃতপ্রস্তাবে সাহেব নন। তাঁর আপ্যায়নের জন্য ডাব-সন্দেশের ব্যবস্থা হয়েছে। সেকেন্ড পণ্ডিত নিজে বসিরহাট থেকে কাঁচাগোল্লা এনেছেন খোদ শ্যালকের দোকান থেকে, হেডমাস্টারমশাই সকাল থেকে অফিসে খাতাপত্র গুছিয়েছেন। তাঁর গোঁফজোড়া আজ যেন একটু বেশিই মিশমিশে আর ছুঁচলো দেখাচ্ছে ; বুকপকেট থেকে ঘড়ি বের করে দেখছেন ঘনঘন। একবার রাউন্ড দিয়ে হেঁকে গেলেন— ওনলি হাফ অ্যান আওয়ার ! হাফ অ্যান আওয়ার ! করিডোরে একটি দলাপাকানো কাগজ কুড়োলেন, দেয়ালে একটি ফচকে ব্যঙ্গচিত্র মোছালেন, উঠোনে গরু ঢুকে পড়েছে দেখে হাতে তালি দিতে দিতে— গেট আউট ! গেট আউট ! করে তাড়ালেন। বাইরে মাঠে এক্কা গাড়ির টুংটুং শব্দ হতেই কোণের ঘরে থার্ড পণ্ডিতের হুঁকোর গুড়গুড় শব্দ থেমে গেল, বিধুমাস্টার ইলেকট্রিক শক-লাগা ব্যাঙের মতো কেঁপে উঠে তারস্বরে দ্রব পদার্থের সংজ্ঞা পড়াতে শুরু করে দিলেন।

বড়ো মাঠের ওপর দিয়ে ইস্কুলে আসার পথ। একপাশে শিবমন্দির, পুকুর, মন্দিরের দেবোত্তর জমি। এসবই গ্রামের জমিদারদের খাস সম্পত্তি। ইস্কুলবাড়িটাও তাঁদেরই জমিতে, বর্তমান জমিদারের পিতামহীর নামে ইস্কুল। তাঁদের আত্মীয়স্বজন ও বশংবদরাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বংশানুক্রমে স্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতির পদটি অলংকৃত করে থাকেন। জেলা বোর্ড অনুমোদিত স্কুল, যাকে বলে গ্রান্ট-ইন-এইড। তিনটি শিক্ষক পদের বেতন দেয় সরকার, বাদবাকি শিক্ষক দারোয়ান ও বেয়ারাদের মাসোহারা হয় ছাত্রদের কাছ থেকে আদায় হওয়া অর্থে।

সরকারি ইস্কুল একটা আছে বটে সেই জেলাসদরে। তবে আশেপাশের চার-পাঁচটি গাঁয়ের ছেলেমেয়ে এই ইস্কুলেই পড়তে আসে। দু-তিন ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে আসে তারা। তার আগে কিছুকাল গ্রামের পাঠশালায় যায়। সেই পাঠশালা কখনো বসে সম্পন্ন গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপে কিংবা মেটে দাওয়ায়। গুরুমশাই খুঁটিতে হেলান দিয়ে বেত হাতে বসেন। কোনো কোনো উদ্যমী পণ্ডিত পাশাপাশি মুদির দোকানও চালান। সর্দার প'ড়োরা কচিকাঁচাদের শাসনে রাখে। বেশি গোল বাঁধলে গুরুমশাই ছানাবড়ার মতো চোখ পাকিয়ে হাঁক পাড়েন— এটা কি নাট্যশালা? শাস্তি দেবার দরকার হলে হাতছড়ি, নাড়ুগোপাল, ত্রিভঙ্গমুরারি ইত্যাদি আছে। ছেলের দল মাটিতে মাদুরের পাততাড়ি বিছিয়ে বসে। প্রথমে শক্ত মাটির ওপর খড়ি দিয়ে বর্ণ লিখতে শেখে, তারপর তালপাতায় যুক্তবর্ণ, কড়াকিয়া, বুড়িকিয়া। তারপরে আছে কলাপাতায় জমাখরচ, শুভঙ্করী, কাঠাকালি বিঘাকালি। এরপর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তানেরা টোলে চলে যায় ব্যাকরণ শিখতে, কেউবা যায় ফারসি শিখতে। জমিদারি সেরেস্তায় কাজ করবে যারা, তেমন দু-চারজন থেকে যায়। তারা সত্যিকারের কাগজে চিঠিপত্র লিখতে শেখে।

এসবই তুমি জানো, অপু। এই ধারা বঙ্গদেশে চলে আসছিল বহুকাল। গোড়ার দিকে পাশ্চাত্য প্রথার ইস্কুল ছিল না। কালে কালে কোম্পানির বাণিজ্য বিস্তার হল, বিপুল সংখ্যায় ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির চাহিদা তৈরি হল। উনিশ শতকে কলকাতার রাস্তায় যে বালকের দল ডেভিড হেয়ারের পালকির পিছু পিছু ছুটেছিল কাতর চীৎকার করতে করতে— মি পুয়োর বয়! হ্যাভ পিটি! টেক মি ইন ইয়োর স্কুল!— তাদের ছিল ঠিক পেটের খিদে নয়, ভাগ্য পরিবর্তনের খিদে, নতুন সমাজব্যবস্থার তরীতে চেপে বসার খিদে। এই খিদের টানেই একদিন বগলে বাক্সবেডিং আর গ্লোব হাতে নিয়ে কলকাতায় এসে পৌঁছবে তুমি।

কিন্তু সেইকালে এই বিপুল খিদে মেটাবার সামর্থ্য ক্রিশ্চান মিশনারি বা সরকার বাহাদুর কারোরই ছিল না। তাই ইংরেজদের আদলে মফস্সলে গ্রামেগঞ্জে ইস্কুল গড়ে তুলতে লাগল স্থানীয় ভূস্বামীরা। ততদিনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবাদে জমিদারিতে ভোগসত্ত্ব কায়েম হয়েছে। এই ইস্কুলগুলো হয়ে উঠল সরকার ও সমাজের উচ্চশ্রেণির পারস্পরিক স্বার্থসিদ্ধির সোপান। জেলা বোর্ডের স্বীকৃতি আর অনুদান পাওয়া গেল সহজেই। অবিভক্ত বাংলা জুড়ে সর্বত্র তৈরি হল স্কুল, বিশেষ করে কৃষিতে সমৃদ্ধ অঞ্চলে। আর এসবের ফলে শিক্ষার প্রসার হল বটে, কিন্তু তা অনুভূমিক। উল্লম্ব হল না। শিক্ষা সমাজে নিম্নবর্গের নাগালের বাইরেই রয়ে গেল।

নিম্নবর্গের ছেলেপুলেরা ইস্কুলে গেলে গরু চরাবে কে? মাঠে কাজ করবে কে? মাছ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরা, নৌকো বাওয়া, কামার কুমোর ক্ষৌরকারের কাজগুলো তাহলে করবে কারা? জমিদারের অট্টালিকায় খিদমদ্গারই বা হবে কারা?

অতএব বিদ্যাচর্চার ব্যাপারটা হিন্দু নগরমুখী উচ্চবর্ণের একচেটিয়া হয়েই রইল, রয়ে যাবে আবহমানকাল। যে সামন্তব্যবস্থার হাত ধরে শিক্ষার বিস্তার হল, সেই ব্যবস্থা পরগাছার মতো সমাজের একটি বিরাট শ্রেণির শ্রম শুষে পুষ্ট। জমিদারি হর্ম্যের মোটা থাম, চকমিলানো বারান্দা, মেহগনি আসবাব, দেউড়ি ভাঁড়ার আর রসুইঘর পেরিয়ে পাঁশতলার ওধারে দাসদাসীদের আলোবাতাসহীন স্যাঁতসেঁতে ঘরে নিঃশব্দ ছায়ার মতো লেপটে থাকে তারা, প্রজন্মের পর প্রজন্ম।

সেই ছায়া তুমি দেখেছ। হরিহরের মৃত্যুর পর কাশীতে তেমন এক প্রায়ান্ধকার খুপরিতে ঠাঁই পেয়েছিল সর্বজয়া। ওরা ছিল বর্ধমানের জমিদার। রাঁধুনি বামনী হয়ে ওদের দেশের বাড়ি নিয়ে যাবার কথাবার্তাও পাকা হয়ে যায়। তুমি তখন নেহাতই বালক— অনাবিল, অরক্ষিত। ইস্কুলে যাও না। মনে পড়ে, সারাদিন নিজের মনে কাশীর অলিগলিতে ঘাটে মন্দিরে ঘুরে বেড়ানোর সেই দিনগুলো? এছাড়া টুকটাক ফাইফরমাশ খাটা, মন্থর দুপুরে বাড়ির এক কর্তার পাকা চুল বেছে দিয়ে পয়সা পেয়ে বাদামভাজা কিনে দুর্গামন্দিরের সেই বাঁদরদের সাথে ভাগ করে খাওয়ার কথা মনে আছে তোমার?

একদিন কর্তার জন্য হুঁকোর তামাক সেজে টিকেয় ফুঁ দিতে দিতে যাচ্ছিলে তুমি, সর্বজয়া সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় দেখে ফেলল। তুমি দেখতে পাওনি। হতচকিত বিভ্রান্ত সর্বজয়া, ধীর পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছে। এক অদ্ভুত ছায়া এসে পড়ল তার মুখে। চোখের সামনে থেকে চেনা প্রাত্যহিকের পর্দা ক্ষণিকের জন্য সরে গেল যেন, এক উন্মোচন ঘটে গেল। তোমার ভবিতব্য বুঝি পটচিত্রের মতো দেখতে পেল সে। কিংবা শুধু তাও নয়, এই ভদ্র সভ্য চোখধাঁধানো বৈভবের আড়ালে থাকা এক ঘোর তমসা দেখতে পেল সর্বজয়া, মানবসত্তার অপচয় আর শোষণের এক বিশাল কাঠামো, যার পায়ের কাছে নিত্যদিন শত শত অপুদের সুকুমারত্ব বলি চড়ানো হয়। সে যা দেখতে পেল, যা আমরা দেখতে পাইনি, তা হল ওই বিশাল চকমিলানো করিডোরে দেয়ালে শোভিত সারি সারি অপুর ট্যাক্সিডার্মি-করা মুণ্ড আর চামড়া। সিঁড়ির মুখে থেমে গিয়ে কালো দিশাহারা মুখটা বাঁদিকে ফেরাল সর্বজয়া।

তারপরেই আমরা দেখি ট্রেনে চেপে মাতাপুত্র ফিরছে। জানলায় ক্রমশ উত্তরভারতের রুক্ষ প্রকৃতি সরে গিয়ে ফুটে উঠেছে নদী পুকুর নারকোল সুপুরির বাগান— বাংলার সজল সবুজ মুখ। আবহে বেজে উঠল চেনা সুর।

*

একুশ শতকের প্রথম বছরে সেইসব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তভোগী ভূস্বামীদের বড়ো বড়ো প্রাসাদোপম অট্টালিকাগুলো পোড়ো হয়ে এসেছে। শহরে ফ্ল্যাটবাড়িতে উঠে গিয়েছে তাদের পরের প্রজন্ম। জমিগুলোও বিক্রি কিংবা বেহাত হয়ে গিয়েছে, বিশেষ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনিশশো সত্তরের দশকের শেষে ভূমিসংস্কারের পর। নদীর ধারে সেই রম্য অট্টালিকাগুলো ভগ্নপ্রায়, ঝাপসা হয়ে আসছে পুরোনো ফোটোগ্রাফের মতো।

একুশ শতকের প্রথম বছরে সেই বাড়িগুলোয় জল এসে ঢুকল বিস্মৃতির মতো। কিংবা স্বপ্নে দেখা ক্রীতদাস অভ্যুত্থান, এক বিকল্প ইতিহাসের পাতা থেকে যেন উঠে এল জল, সিংদরজা দেউড়ি পেরিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। চকমিলানো বারান্দায় সারি সারি ট্যাক্সিডার্মি-করা দুঃস্বপ্নের মনুষ্যমুন্ড বাদুড় হয়ে ডানা মেলে ভাঙা ভেনিসিয় খড়খড়ি গলে উড়ে গেল কোথায় কে জানে।

কোথায় আর যাবে ? নদীর ওপারের চরে আম লিচুর বাগানগুলোও ডুবে গিয়েছিল সেবার।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দারুবিগ্রহ

নৌকোয় ওঠার পর নীহারদা চোখের ওপর এমনভাবে সাঁটিয়ে রেখেছে হ্যান্ডিক্যামটা, পাশ থেকে দেখলে মনে হবে যেন এক বিকটচঞ্চু শকুন, উড়ে এসেছে খাবারের সন্ধানে। এখন গলুইয়ের আগায় হাঁটু মুড়ে বসতে সেই বিভ্রম ঘনিয়ে এল, আমাদের নৌকোটা হয়ে উঠল গৃধ্রপক্ষী জলযান, নিঃশব্দে ভেসে চলেছে জলে-ডোবা শহরের গলিঘুঁজি দিয়ে।

নিঃশব্দে ঠিক নয়। জলে বৈঠার আঘাতে প্রতিধ্বনি তৈরি হচ্ছিল দুপাশে জনমানবহীন তালাবন্ধ বাড়িগুলোয়। কুলকুল শব্দে জলস্রোত ক্ষয়িষ্ণু বাড়িগুলোর সদর পেরিয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছিল ভিতর-উঠোনে। গলির বাঁকে জলের ওপর জেগে আছে কাঠের রথ, ভেতরে ছানাপোনা সমেত এক কুকুরীর পরিবার। আমাদের মধ্যে থেকে কেউ বিস্কুটের প্যাকেট খুলে ছুঁড়ে দিল। সেই ছবি ধরা রইল ক্যামেরায়।

জলে কি টান দেখেছেন? এদিকটায় কিন্তু গঙ্গার সঙ্গে সরাসরি যোগ হয়ে গিয়েছে। এখন জোয়ার চলেছে। জানাল কাজী।

ছটফটে তরুণ কাজী, ওরফে মুশিরুল হক, চুর্ণি-জলঙ্গি বাঁচাও কমিটির সেক্রেটারি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক সাহিত্যে এমএ পাস করেছে, তবে ওর প্রকৃত ডিগ্রি নাকি জিকেবিএমটি— অর্থাৎ, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। ওর বাবার একটি ওষুধের দোকান আছে রানাঘাটে, মোষ তাড়ানো থেকে ফুরসৎ পেলে মাঝেসাঝে সেখানে বসে।

বাদামি জলস্রোতে ভেসে আসছে কচুরিপানা, দোল খাচ্ছে রেলিংঘেরা বারান্দায়, ঢুকে পড়েছে দুই বাড়ির মাঝে সরু জমাদার যাবার গলিতে। এদিকটা প্রাচীন, ততোধিক প্রাচীন এই নগর। দেড়শো-দুশো বছরের পুরোনো বাড়িগুলোর পলেস্তারা খসে উদোম হয়ে পড়েছে সরু ইটের নিখুঁত সংবদ্ধ খিলান, থামের ডৌল, ঝুলবারান্দায় রংজ্বলা বার্মাসেগুনের খড়খড়ি, রেলিঙে ঢালাই লোহার কারুকাজ। এককালের সমৃদ্ধি আর স্থাপত্যসুষমার ওপর কোথাও পড়েছে ধ্যাবড়া সিমেন্টের তাপ্পি, কোথাও বা রাক্ষুসে বট অশ্বত্থের শেকড় নেমে এসে আঁকড়ে ধরে রেখেছে ধূলিসাৎ পরিণতি থেকে। বেশ কয়েকটি বাড়ির সদর দরজায় দু-ফুট উঁচু করে ইট গাঁথা, বাৎসরিক প্লাবন ঠেকানোর জন্য।

এবারে অবশ্য তাতে সুরাহা হয়নি। রাস্তার পাশে তিন-চার ফুট উঁচু বেদির ওপর টিউবওয়েল ছুঁয়ে ফেলেছে জল। ফলে ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে এলাকার বাসিন্দারা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে আসার সময় নৌকোয় ভ্যানরিক্সায় বাক্সপ্যাটরা চাপিয়ে নিয়ে বেশ কয়েকটি মধ্যবিত্ত পরিবারকে চলে যেতে দেখেছি আমরা— মায়ের হাতে আঁকড়ে ধরা সন্তান, বাবার ট্রাউজার্স হাঁটু অব্দি গোটানো, চোখে উৎকণ্ঠা। একটানা পাঁচ-ছদিন প্লাবনবন্দি হয়ে লড়াই চালানোর পর হাল ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। শহরের উঁচু জায়গায় ইস্কুলে, মন্দিরসংলগ্ন আশ্রমে যে সব আশ্রয়-শিবির খোলা হয়েছে সেখানে থাকার রুচি নেই, জায়গাও নেই আর। সেখানে ঠাঁই নিয়েছে নিম্নবর্গের মানুষেরা। এঁরা যাচ্ছেন আত্মীয়কুটুম্বের বাড়ি। কেউ কেউ নাকি বর্ধমানে কৃষ্ণনগরে বছরভর ঘরভাড়া নিয়ে রাখে এইরকম দুর্দিনের জন্য। এভাবে অনেকেই পাকাপাকি বাস উঠিয়ে চলে যাচ্ছে, চলে গিয়েছে। শহরের এই পুরোনো পাড়াগুলো ক্রমশ জনশূন্য হয়ে পড়ছে। সেটা বাড়িগুলো দেখলেই বোঝা যায়। উঁচু ইমারতে সারি সারি ঘরগুলোয় জানলাদরোজা কবাটহীন— ছমছমে অন্ধকারের মুখব্যাদান, অথবা ছাদ ফাটিয়ে নেমেছে আলোর বল্লম। বাদুড় চামচিকের বাসা। সন্ধে নামলে ওরা ডানা ঝাপটে উড়ে যায় গঙ্গার ওপারে আম আর লিচুর বাগানে। প্রতি বছর নদীটা এগিয়ে আসছে একটু একটু করে। পাড় ভাঙছে। পলি জমে জমে ঠেলে উঠছে খাত। লক্ষ্মণ সেনের আমলের ঘাটগুলো সেঁধিয়ে যাচ্ছে পলির গর্ভে। নদী হানা দিচ্ছে শহরের গলিঘুঁজিতে। এখন তো প্রায় বুকের ওপর দিয়েই বইছে। হয়তো এইভাবে কোনো একবার, হয়তো এবারই, প্লাবন নেমে গেলেও আর পুরোনো খাতে ফিরে যাবে না। হয়তো হাজার বছরের প্রাচীন এই শহরটার ওপর দিয়েই বইবে। যেমন হয়ে থাকে। যে নদীর গর্ভ থেকে ধীরে ধীরে জন্ম নেয় একটি জনপদ, একদিন সেই নদীই আবার তাকে গিলে নেয়। অথচ ছেড়ে চলে যায় দূরে।

তবু আশায় বাঁচে মানুষ। এবছর বন্যাটা যে হবে, তার একটা পূর্বাভাস ছিল। তবু পাড়ায় পাড়ায় পুজোমণ্ডপে বাঁশ বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। এখন এই প্লাবিত পরিত্যক্ত শহরের মণ্ডপগুলো জলের ওপর জেগে আছে মৃত পশুর হাড়পাঁজরের মতো। সেই হাড়ের গায়ে লেগে থাকা মাংস খুঁটে নিতে এসেছি আমরা, ক্যামেরাচক্ষু শকুনেরা, চূর্ণি-জলঙ্গি বাঁচাও কমিটি বন্ধুদের আমন্ত্রণে। ত্রাণ আর তথ্য সংগ্রহ সমান্তরালে চলে। কিন্তু তথ্য আর তত্ত্বের রাশি রাশি মাংস চর্বি ছিঁড়ে খুবলে কোনো সত্যির দপদপে কলজে বের করে আনা যাবে? শকুন তার কীই বা জানে।

আমার সঙ্গী নীহারদা, নীহারেন্দু চক্রবর্তী, সোভিয়েত দেশ পত্রিকায় চাকরি করেছেন। সোভিয়েত রাশিয়া পতনের পর কলকাতায় পত্রিকার দপ্তর বন্ধ হয়ে যায়, নীহারদাও চাকরি খুইয়ে পত্রপত্রিকায় ফ্রিলান্স শুরু করেন। এককালের সিপিআই-পন্থী মার্কসবাদী, ইদানীং ক্রমশই অদৃষ্টবাদী হয়ে উঠছেন। তাঁর গলায় দু-তিন রকমের ক্যামেরা ছাড়াও ঝোলে স্ফটিক আর রুদ্রাক্ষের মালা, কব্জিতে অষ্টধাতুর বালা। যেকোনো ধরনের প্রাকৃতিক দুর্দৈবে ক্যামেরা নিয়ে ছুটে যান। এভাবে বিপর্যয়ের ছবির এক বিপুল মহাফেজখানা গড়ে তুলেছেন নীহারদা।

নীচে জল, ওপরে নির্মল আকাশ। তার মাঝখানে গনগনে সূর্য জলে প্রতিফলিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে এক আচ্ছন্ন আবেশ তৈরি করছে, ভাবনাগুলো ছড়িয়ে যাচ্ছে কচুরিপানার মতো, লালচে বাদামি জলে বিকীরিত আলোয় বাড়িঘর উঠোন দালানকোঠা হয়ে উঠছে ওয়াশের বিভ্রম। আমাদের ডিঙি নৌকাটা রাস্তা আর গলি ছেড়ে ঢুকে পড়ে উঠোনে বাগানে দুই বাড়ির মধ্যে এজমালি জমিতে। এখন সর্বত্রই জল। দাঁড়ে বসেছে যে ছোকরাটি, যার নাম রাঘব, আদতে সে রিক্সাওয়ালা। ধর্মের টানে আসা তীর্থযাত্রী আর সাধারণ ট্যুরিস্টদের ঘণ্টাচুক্তিতে শহর পরিক্রমা করায়। আমাদের এই জলযাত্রা শুরু হবার পরও অভ্যস্ত ঢঙে ধারাবিবরণী দিচ্ছিল রাঘব—

বড়ো আখড়া থেকে এই গলিটা দিয়ে দণ্ডপাণিতলায় মুক্তকেশী ছাড়িয়ে আমরা ফাঁসিতলা ঘাটের দিকটায় যাব। ওপাশে হরিসভা, ডানদিকে তেকড়িপাড়া। গোঁসাইগঙ্গার দিকটায় এখন ডুবনজল।

কিছুক্ষণ এইভাবে চলার পর রাঘব বুঝতে পেরেছে এখন এই নির্দেশিকার কোনো মানে নেই। জল ঢুকে এসে সম্পূর্ণ মুছে দিয়েছে ওর পরিচিত মানচিত্র। বাঁধা পথ ছেড়ে তাই আমাদের নৌকো ক্রমশ ঢুকে পড়ছে ইটকাঠের বাদাবনে, জলের গভীরতা আর চলার নিজস্ব ঢঙে তৈরি করে নিচ্ছে খাঁড়িপথ।

প্রায় একঘণ্টা এভাবে চলার পর (যদিও মনে হচ্ছে আরও অনেক বেশি সময়, জলের ভাপ আর প্রতিফলিত আলোয় সময়ের বোধটাই টাল খেয়ে গিয়েছে) বিপর্যয়ের একটা সম্পূর্ণ ছবি ফুটে উঠল ক্রমশ। যা ভাবা গিয়েছিল, অবস্থা তার থেকেও বেশ খারাপ। গত দুদিনে নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হয়েছে।

পাইকগলির কাছে বাঁক ঘুরে আমরা এক অদ্ভুত দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলাম। একটি নৌকোয় তিন সেবায়েতের কোলে চেপে চলেছেন দারুনির্মিত দেবতারা। আগের রাতে ভরা কোটালের জোয়ার ছিল, জল ঢুকে পড়েছে মন্দিরের গর্ভগৃহে। বিগ্রহদের তাই সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে নিরাপদ স্থানে। সেবায়েতদের খালি গা, পরনে কোরা ধুতি, পৃথুল তেলচকচকে চেহারা। অন্যদিকে দেবতারা শতাব্দীকাল ছায়াচ্ছন্ন প্রকোষ্ঠে থাকার পর এই খোলা আকাশের নীচে রঙজ্বলা পুতুলের মতো, পোকায় কাটা মলিন জরির সাজ, স্থির বিস্ফারিত চোখ মেলে অবলোকন করছেন প্লাবিত নগর। ক্যামেরা খুঁটে নেয় ছবি— বানভাসি ঈশ্বর চলেছেন আশ্রয়শিবিরে।

ওপরে ফিসফিসে প্রার্থনার স্বরে আমরা মাথা তুলে তাকাই। এক জীর্ণ কোঠাবাড়ির দোতলার বারান্দায় তিন বৃদ্ধা। কদমছাঁট চুল, থান পরা। জোড়হাত করে বারান্দার রেলিঙে মাথা ঠুকে ছুঁড়ে দেন খুচরো পয়সা। সেবায়েতরা ক্ষিপ্র ভোঁদড়ের মতো লুফে নেয় দান, ছুঁড়ে দেয় পালটা হাসি। বৃদ্ধারা কিন্তু হাসেন না। জলে প্রতিফলিত আলোয় তাঁদের বিশীর্ণ মুখে ফোটে শঙ্কা আর বেদনার রেখা।

দেবতারা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। অনাথ হয়ে পড়ছে পাড়াটা। আমরা নৌকো ভেড়াই।

আপনারা এখানে ?

আমরা এগারোজন বুড়ি এখানেই থাকি বাবা। আমাদের আশ্রম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশেপাশে সবাই তো ছেড়ে চলে গিয়েছে। আপনাদের এভাবে থাকতে অসুবিধে হচ্ছে না?

শূন্য হাতের মুঠির মতো মুখে চলকে ওঠে হাসি। দাঁতবিহীন মাড়িগুলো ভিজে গোলাপি।

অসুবিধে কীসের? একটা উড়ে ছোঁড়া আছে, খাবারজলটা এনে দিচ্ছে। আমাদের শুকনো খাবার মজুত আছে।

হ্যাঁ বাবা, চিঁড়েমুড়ি সব মজুত আছে। ওই জলটাই যা।

এদিকটায় রিলিফ আসেনি?

এসেছিল তো। আমরা নিইনি। বুড়িমানুষ কিই বা লাগে। ওই জলটাই যা।

তাও ওরা বললে গৌড়ীয় মঠে শিবির খোলা হয়েছে, আপনারাও চলুন। জল নামলে ফিরিয়ে দিয়ে যাব। তা এত বছর এই আশ্রমে আছি, কত বন্যা তো দেখলুম। কোথায় যাব? এখানে মহাপ্রভু আছেন।

হ্যাঁ, এই শেষ কটা দিন আর কোথায় যাব? মহাপ্রভু আছেন, তিনিই দেখবেন।

এঁরা কথা বলেন যেন নাটকের কোরাসের মতো। একজনের কথার খেই আরেকজন তুলে নিয়ে পুনরাবৃত্তি করেন, নতুন কয়েকটি শব্দ গেঁথে দেন। একটি বৃত্তাকার কথামালা তৈরি হয়।

মহাপ্রভুও তো চলে গেলেন নৌকোয় চেপে। রাঘব বলে।

ও কী কথা বাবা! তিনি তো আছেন এইখানে।

শিরাওঠা গলায় জড়ানো জিভে আঙুল রাখেন।

আর ওইখানে!

অমন বলতে নেই বাবা। তিনি সর্বক্ষণ সঙ্গে আছেন, এইখানে আর ওইখানে।

নীল ও ধূসর ছোপ ছোপ পলেস্তারা-খসা দেয়ালে কুলুঙ্গির ভেতর জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা ও গৌরাঙ্গদেবের মূর্তি। এছাড়া অন্য দেবদেবীরাও রয়েছেন। জানলার বাইরে ঘন বটের সবুজ চুঁইয়ে আসা আলোয় ভালো করে দেখা যায় না। নীচু কড়িবরগার পাশ দিয়ে দেয়াল বেয়ে ভেতরে নেমেছে বটের শেকড়, দেবদেবীর কুলুঙ্গির ওপর গুচ্ছমূল ঝুলছে চামরের মতো। লাল মেঝেয় সারি দিয়ে মাদুর পাতা, গুটোনো বিছানা, কুঁজো, হাতপাখা, বাঁধানো চৈতন্যভাগবত, পাঁজি, চ্যবনপ্রাশ। একটি টুলের ওপর লাল টেলিফোন। এঁদের মধ্যে কয়েকজনের সন্তানসন্ততিরা দূরে থাকে, মাঝেমধ্যে টেলিফোনে কথা হয়। মানিঅর্ডারে মাসোহারা আসে। সকলের নয় অবশ্য। আশ্রমের ট্রাস্টে গচ্ছিত টাকার সুদে চলে। বন্যার জল ঢোকার পর বিদ্যুতের লাইন কেটে দিয়ে গেছে, টেলিফোনটাও অকেজো। আজ পাঁচদিন হল এক বৃদ্ধার জ্বর।

আমরা প্যারাসিটামল দিই। একজন সেটি খলনুড়িতে থেঁতো করতে থাকেন।

ও কী করছেন? ওটা কিন্তু গিলে খাবার ওষুধ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে ফিকির নাই বাবা। এনার গলা দিয়ে শক্ত কোনো দোব্য নামে না যে। চিঁড়েমুড়ি সব হামানদিস্তেয় কুটে দিতে হয়।

গুঁড়ো ট্যাবলেট সামান্য মধু দিয়ে মেড়ে রোগিণীর শুষ্ক কাগজের মতো ঠোঁটে মাখিয়ে দেন। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলেন— চেটে ন্যান মা, ঔষধ!

চোখ বন্ধ, স্থবির মুখ। কয়েক সেকেন্ড পর শম্বুকপিচ্ছিল একটু জিভ কেঁপে কেঁপে উঠে এসে টেনে নেয় প্রলেপটি। রোগিণী ও সেবিকা দুজনেই অশীতিপর। তবু চেহারায় পোশাকে একটা শ্রেণিগত ফারাক স্পষ্ট। সেটা এই আশ্রমের অন্য বৃদ্ধাদের মধ্যেও রয়েছে। বর্ণ আর মাসোহারার বৈষম্য হয়তো শ্রমেও বিভাজন এনেছে। কিন্তু তবু এই সবকিছুকে ছাপিয়ে জীবনের সায়াহ্ন অপ্রতিরোধ্য প্লাবনের মতোই ঘিরে ধরেছে এঁদের। উঠোনে, চৌকাঠের নীচে থইথই জল, তারই মাঝে এতটুকু পরিসরে আরও একটু বেঁধে-বেঁধে থাকা।

চিড়েমুড়ি কি বন্যার কথা ভেবেই মজুত করেছেন? জিজ্ঞেস করি।

না বাবা, ও আমাদের রাখতে হয়। মাঝেমধ্যে টাকা আসতে দেরি হয়, উড়ে ছোঁড়াটাও দেশে যায়। তখন ওই শুকনো খাবার চলে।

অর্থাৎ বছরভর সম্ভাব্য বানভাসির মতোই জীবন কাটে এঁদের। তাই জল কবে নামবে সে ব্যাপারে বিশেষ হেলদোল নেই। তবু জিওলিন ওষুধ ও কিছু খাবার দেওয়া হয়। বিস্কুটের প্যাকেট হাতে নিয়ে আলো-খোটে ঘোলাটে ছানিপড়া চোখে, স্কুলবালিকার মতো হাসেন।

আমরা বুড়িমানুষ, কীই বা লাগে। তবু তোমরা দিলে।

বয়স হয়েছে তো, পাখির আহার। তাও তোমরা দিলে। গৌরাঙ্গ তোমাদের পাঠালেন।

কিছু মুখে দিয়ে দুপুরটা জিরিয়ে গেলে তো ভালো হতো। কিন্তু কীই বা দিই তোমাদের। জল নেমে গেলে আবার আসবে কিন্তু বাবারা।

আমাদের বিদায় দিতে একতলার সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে আসেন ওঁরা। ঝুঁকে-পড়া বিশীর্ণ দেহগুলি পাখির মতোই, পলকা ও সতর্ক, গলা সামনে বাড়িয়ে পা টেনে টেনে হাঁটেন ঠিক যেন জলপিপির মতো।

জয় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু!

কোরা থানকাপড়ের ডানা ঝাপটে ওঠে।

জয় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু!

জয় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাঁচাকল

ছশো বছরেরও বেশি আগে এখানে জন্মেছেন এক পুরুষ। জন্মেছেন, অধ্যয়ন করেছেন, ফাগু খেলেছেন সখীর সঙ্গে, বিবাহ করেছেন ও বিবাগী হয়েছেন। তাঁর জন্মস্থান, খেলার মাঠ, সখার বাড়ি ঘিরে ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠেছে এক কাহিনি, যার ওপর দিয়ে একটু একটু করে কয়েকশো বছর ধরে পূর্বদিকে সরে গিয়েছে ভাগীরথী। মন্দির গলি ঘাট উঠোনে দাগানো সেই কাহিনির ওপর দিয়ে ফের বইছে প্লাবনের জল। এখানে আসার পর শুনলাম এবার নাকি জল উঠে গিয়েছে বেশ কয়েকটি সংগ্রহশালাতেও। তলিয়ে গিয়েছে বহুমূল্য পুঁথি। কল্পনা করা যায়, জলের নীচে প্রাচীন তালপাতার গা থেকে পাক খুলে আসছে হরীতকী পোড়ানো কালি, ঠিক যেভাবে নদীগর্ভে হারিয়ে যাওয়া একটি শহরের গা থেকে খুলে আসে কাহিনি, প্রেতের নিঃশ্বাসের মতো। প্রেতের মতোই কাহিনিও দেহ চায়, ভর করে নতুন গজিয়ে ওঠা কোনো জনপদের ঘাড়ে।

স্মৃতি বিস্মৃতির দোলাচলে শহরটার গায়ে জমেছে বিভিন্ন সময়ের পলি, উপর্যুপরি লেখা আর মুছে ফেলা পাণ্ডুলিপির মতো। আগের লিপিগুলো ঝাপসা হয়েছে, কিন্তু একেবারে হারিয়ে যায়নি। এটিএম, মোবাইল ফোনের বিজ্ঞাপন ইন্টারনেট কাফে— এর পাশাপাশি রঙজ্বলা টিনের সাইনবোর্ডে প্রাক-উদারীকরণ যুগের কিছু কিছু পণ্যের বিজ্ঞাপন— রবিনসন বার্লি, সাধনা দশন, গ্রাইপ ওয়াটার, জনতা স্টোভ, জবাকুসুম, সুলেখা কালি। রোদে জলে ঝাপসা হয়ে এসেছে, তবু কবেকার চেনা সব রঙিন রেখাচিত্র স্মৃতির আবহ বয়ে আনে।

বাজার এলাকায় কোমরজল, দোকানপাট বন্ধ। জলে ভাসছে সবজির পাতা, বাঁশের ঝাঁকা, আবর্জনা। টিনের চালে ডানা ঝাপটাচ্ছে একদল কাক। এছাড়া আর কোথাও প্রাণের চিহ্ন নেই। প্রশস্ত আটচালার ভেতরে বুকজল, ফোড়েদের বসার উঁচু বেদিগুলো জেগে আছে কেবল। চালার ওপর থেকে ঝুলছে ঝুড়ি, দড়িদড়া ; যেন জলমগ্ন জাহাজের খোল। ক্যামেরা ধরে রাখে।

এদিকটা মাছের বাজার, ওপাশে সবজির। তেলের ঘানি, মশলার পাইকারি বাজার। সব বন্ধ। পরপর কাঠের তক্তা সাজিয়ে তৈরি দোকানের ঝাঁপ, তার গায়ে আঁকা সাবানের বিজ্ঞাপন। তাড়াহুড়ো করে বন্ধ করতে গিয়ে তক্তাগুলো সঠিক ক্রমে বসেনি, ফলে ছবিটাও ভেঙেচুরে গিয়েছে। স্বল্পবাস রমণীর ছবি কিউবিস্ট হয়ে গিয়েছে ; জলে বিচূর্ণ রোদের প্রতিফলনে সপ্রাণ হয়ে উঠেছে খানখান লাস্যময়ী। সাইনবোর্ডে বিজ্ঞাপিত সামগ্রীর তালিকা— এখানে উৎকৃষ্ট মানের মাছ-ধরা ছিপ, চার, বঁড়শি, সব ধরনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দড়ি ও কুয়োর বালতি তোলার আংটা পাওয়া যায়। পেতল কাঁসার বাসনের দোকান। দশকর্ম ভাণ্ডার। বীজ সার ও কীটনাশকের দোকান। জলে আধডোবা ধান ঝাড়াইয়ের কল, খড় কাটার কল, ট্রাক্টরের ফলা। ক্যামেরা চক্রাকারে ঘুরে ধরে রাখে।

আর পাঁচটা দিনে এই বাজার এলাকাটা গমগম করে হাটুরে মানুষে, রাঘব জানায়। এখন তারাও বানভাসি। গ্রামের পর গ্রাম ভাসছে।

সেটা আমরা ট্রেনে আসার সময় দেখেছি। মাইল মাইল গেরুয়া জল, স্রোতে ভেসে যাচ্ছে কচুরিপানা, খোড়ো চাল, মাঝেমধ্যে দুয়েকটা পাকা বাড়ি, হরিণের শিঙের মতো হাইটেনশান তারের খুঁটি, বাবলার ডালে বাবুইয়ের বাসা। পাখি নেই। দূরে জলের ওপর জেগে আছে বিবর্ণ কাশবনের মাথা।

সমুদ্রগড় ছাড়াবার পর প্রথম মানুষ দেখেছি। কলার ভেলায় দাঁড়িয়ে লগি ঠেলছে নারী, ভেলার ওপর জড়োসড়ো শিশু আর অনেকগুলো হাঁড়িকলসি। পানীয় জল সংগ্রহে বেরিয়েছে। এই দুর্যোগের মধ্যেও শ্রমে বিভাজন অটুট রয়েছে। কর্মচ্যুত পুরুষেরা হল্ট স্টেশনের আশ্রয়শিবিরে শুয়ে বসে আছে। ট্রেনটা না থেমে মন্থর গতিতে পার হয়ে যায় প্ল্যাটফর্ম, জানলা দিয়ে সরে যায় দুর্গত জীবনের ছবি। সারি দিয়ে কালো প্লাস্টিকের তাঁবু, ভেতরে আলনা ড্রেসিং টেবিল বাসনপত্র জামাকাপড়ের পুঁটুলি। প্ল্যাটফর্মের প্রান্তে গরুছাগল বাঁধা। উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক রেলস্থাপত্য— ইটের জাফরিকাটা টিকিটঘর, ঢেউখেলানো টিনের ছাউনি, পারাপারের সেতু, ওজন মেশিন, ত্রিভুজাকার ঘণ্টা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিকের ওপর গ্রামীণ ঘরসংসারের সমাপতন। যেন উত্তরাধুনিক ইন্সটলেশান, কিংবা প্রজাতন্ত্র দিবসের ট্যাবলো— লংরেঞ্জ মিসাইলের পেছনে আর অরুণাচলের জনজাতির শিকারদৃশ্যের মাঝে চলেছে পশ্চিমবাংলার বানভাসি গ্রাম। প্ল্যাটফর্মে কংক্রিটের ওপর মশলা পেষা রান্নাবাটি চলছে, কাঠের বেঞ্চির আবডালে শিশুকে স্তন দিচ্ছে মা, তাঁবুর ভেতর আয়নার দিকে ফিরে দাঁতে ফিতে চেপে চুল বাঁধছে কিশোরী, লাল প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে গৃহকর্তা, দড়ির দোলনায় ঘুমন্ত শিশু, চাটাই পেতে তাস খেলছে ছেলের দল। উপড়ে আনা, দেয়ালবিহীন একেকটি গ্রাম।

*

সেপ্টেম্বরের শেষে, যখন বর্ষার অবসানে নদী নালা খাল বিল টইটম্বুর হয়ে আছে, একফোঁটা বাড়তি জল ধারণ করারও ক্ষমতা নেই মাটির, ঠিক সেইসময় যদি উত্তর বিহারে ঘনীভূত নিম্নচাপ গোপনে আঁতাত করে বঙ্গোপসাগরে ভরা কোটালের জোয়ারের সঙ্গে, যদি হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণবাহিনী নদীগুলো প্রবল জলরাশি নিয়ে হুড়মুড় করে নেমে আসে এই গাঙ্গেয় সমভূমিতে আর টক্কর নেয় জোয়ারে স্ফীত জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে, তাহলেই নদীয়া জেলায় ভাগীরথীর তীরে শ্রীকৃষ্ণপুর ননীবালা বালিকা বিদ্যালয় হয়ে ওঠে আশেপাশের নাবাল এলাকার মানুষের ঠিকানা।

দুর্যোগ কেটে গিয়েছে বেশ কিছুদিন, নির্মেঘ শরতের আকাশ, জল নেমে যাওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুরু হয়েছে। তবে এখনও নীচু এলাকার কয়েকটি পরিবার রয়ে গিয়েছে ইস্কুলবাড়ির একটি অংশে। অন্যদিকের অংশে উঁচু ক্লাসের পঠনপাঠন চলছে। সে এক দৃশ্য: পাঁচিলঘেরা কম্পাউন্ডের মাঝখান দিয়ে সীমানার মতো চলে গিয়েছে দড়ি, তাতে ঝুলছে যেন গোটা একটি গ্রামের মানুষের শাড়ি জামা চাদর তোশক। দুদিকে দুটি পৃথিবী— একদিকে কয়েকটি শরণার্থী পরিবার, বসতি থেকে উদ্ধার করে আনা আসবাব, দর্মা বাঁশ টালি, সাইকেল ; অন্যদিকে ক্লাসঘরের বেঞ্চিতে সারি দিয়ে বসে একদল শান্ত মেয়ে, তাদের পরনে তুঁতেপাড় সাদা শাড়ি। জীবনবিজ্ঞানের ক্লাস। দিদিমণি বোর্ডে খড়ি দিয়ে পৌষ্টিকতন্ত্রের ছবি এঁকে পাচনক্রিয়া পড়াচ্ছেন, ছাত্রীরা নোট নিচ্ছে মন দিয়ে। ওদিকে জামাকাপড়ের দেয়ালের ওপার থেকে ভেসে আসছে শিশুর কান্না, রান্নায় ফোড়নের গন্ধ।

প্রধান শিক্ষিকা বললেন—

এটা এখন বাৎসরিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু ভাগ্য, এসময়ে পুজোর ছুটিটা থাকে। স্কুল খোলার আগে বেশিরভাগ পরিবার ফিরে যায়। যারা রয়ে গিয়েছে তারা চরের লোকজন। কীই বা করবে। এদিকে আমাদের যেসব মেয়ে এবার মাধ্যমিক দেবে, তাদের আর কিছুদিন পরেই টেস্ট পরীক্ষা। সিলেবাস শেষ করতে হবে তো।

মাঝবয়সি বড়োদিদিমণির একমাথা কাঁচাপাকা চুল, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, ঠোঁটে ভঙ্গুর হাসি ফুটে ওঠে।

শরণার্থী শিবিরের গোলযোগ আর দুর্গন্ধ মধ্যে আসন্ন পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে একদল মেয়ে। তবে ক্লাসে হাজিরার সংখ্যা বেশ কম।

এটা আরেকটা সমস্যা, জানেন, একটা লম্বা ছুটি কিংবা এইরকম একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর সব ক্লাসেই কিছু কিছু মেয়ে ইস্কুলে আসা বন্ধ করে দেয়। এই দেখুন না।

হাজিরা খাতায় খোপের মধ্যে p এর সারি ক্রমশ a হতে হতে লাল রেখা হয়ে গিয়েছে। সেই চেনা হৃদযন্ত্র-বিকল রোগীর ইসিজি রিপোর্ট, সেই মুমূর্ষু ব্যবস্থার সুরতহাল।

লাল কালিতে দাগানো নামগুলোর দিকে চোখ চলে যায়। রেখা দুলে, মৌমিতা রজক, বৈশাখী হালদার, জিন্নাত খাতুন... পদবিগুলো থেকে ওদের সামাজিক বর্গ আর বর্ণ জানা যাচ্ছে। তার বেশি কিছু নয়। তার বেশি কিছু জানেন না প্রধানশিক্ষিকাও।

যিনি জানেন, তাঁকে আমরা পেয়ে গেলাম এখানেই, দড়ির সীমান্তের ওপারে। মাথাজোড়া টাক, কৃষ্ণবর্ণ গাঁট্টাগোট্টা চেহারা, পরনে ধুতি-ফতুয়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে ভুঁড়ি, পাটরঙা পাকা চুলে ঢাকা। বিশাল কড়ায় ফুটন্ত খিচুড়ি রান্নার তদারকি করছেন নীতু সাহা, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ও ইস্কুল কমিটির সেক্রেটারি।

আপনারা আর হপ্তাখানেক আগে এলে ওদের কাউকে কাউকে এখানেই দেখতে পেতেন। বানভাসি হয়ে এই ইস্কুলেই উঠেছিল ওদের পরিবার। এবছর তেত্রিশটা পরিবারকে এখানে এনে রেখেছি আমরা। যেখানে যেমন জল নেমেছে, যে-যার মতো ফিরে গিয়েছে। এখন সবাই খুব ব্যস্ত। ঘর মেরামতি, ভিটে সাফ করা, সামনের রবিশস্যের জন্যে জমি তৈরি করা— অনেক কাজ। অনেকে গাইবাছুর খুইয়েছে, অনেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বস্ব খুইয়েছে। যাদের নিজের জমি নেই, তারা সামনের কটা মাস গ্রামে কাজ পাবে না। কাজের ধান্দায় ভিনরাজ্যে চলে যাবে। এই মেয়েগুলো ঘরদোর সামলাবে। কেউ কেউ শহরে বাবুদের বাড়ি কাজে ঢুকে যাবে। ওদের রোজগারের টাকায় ধারদেনা শোধ হবে, বিয়ের জন্য কানের দুলটা চুড়িটা, নতুন করে ছাগল হাঁস-মুরগি কেনা হবে। ধাক্কাটা একটু সামলে উঠলে চোত মাসের আগে অনেক মেয়ে ঘরে ফিরে আসবে। কেউ কেউ আর ফিরবে না।

নীতু সাহার কথার ঢঙে অনেকটা যেন লোককাহিনির নিয়তি-নির্দিষ্ট সুর, যা কেবলমাত্র দীর্ঘকাল ধরে একটা বিষয়কে হাড়ে-মজ্জায় জানার ভেতর দিয়েই আসে।

কিন্তু এটা তো চলছে ধারাবাহিকভাবে। ইস্কুলটাকে রেহাই দিয়ে বিকল্প কোনো ব্যবস্থা ভাবা যায় না? পঠনপাঠনের দিকটা...

ট্রাফিক পুলিশের মতো হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে নীতু সাহার সোজাসাপ্টা উত্তর—

দেখুন মশাই— আগে মানুষ, তারপরে গাইবাছুর, তারপরে জমি, তারপরে আসছে ল্যাকাপড়া!

কিন্তু মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ যারা আর ফিরবে না, তারা কোথায় ফিরবে না? ইস্কুলে, নাকি বাড়িতে? কোনো চোরাপথের অন্ধকারে হারিয়ে যাবে তারা?

এটা আর জিজ্ঞেস করার সুযোগ হল না, তার আগেই খিচুড়ির কড়া নামল, নীতুবাবু খিচুড়ি ভাগ করে দেওয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দুজন লোক প্লাস্টিকের বালতিতে ধোঁয়াওঠা খিচুড়ি তুলতে লাগল। রেললাইনের ধারে তাঁবুতে কয়েকটি পরিবার রয়েছে, সেখানে নিয়ে যাবে।

লোহার কড়ায় ভারি ডাবু হাতা ঘষটানির শব্দে আড়মোড়া ভেঙে ওঠে শরণার্থী শিবিরের জবুথবু বাতাস। শিশুরা বিভিন্ন দিক থেকে এসে সারি দিয়ে বসে পড়ে করিডোরে, নারীরা পুঁটলির ভেতর থেকে থালা সরা বের করতে থাকে। বয়স্করা, যারা কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়েছিল ক্লাসঘরের বেঞ্চিতে, তারাও ধীরে ধীরে উঠে পড়ে। সবই ঘটে চলে এক মন্থর নিশিলাগা ছন্দে। প্রাণধারণের জন্য ন্যূনতম পেশিচালনা, এভাবে যতটা জীবনীশক্তি জমিয়ে রাখা যায়। দেখলে মনে হয় যেন কোনোক্রমে এই দুঃস্বপ্নটা পার করে দিয়ে জেগে উঠবে এক নির্মল, সজীব সকালে। এখন শুধুই শান্ত নির্লিপ্ত অপেক্ষা। যেন তীর্থযাত্রীর দল, স্টেশনে নেমে গাড়ি বদল করার জন্য অপেক্ষা করছে।

অপেক্ষা: যা লোহিতকশার মতো বইছে রক্তে। অপেক্ষা: যা ঠিক নিষ্ক্রিয়তা নয়, অনড় নিশ্চলতা নয়, বরং বেঁচে থাকার এক ধরণ, যার কিছু ভিন্ন ভিন্ন ছন্দ রয়েছে— ফসল পেকে ওঠার জন্য, বৃষ্টি নামার জন্য, ভোটার কার্ডের জন্য, কেরোসিনের জন্য, পঞ্চায়েতের কাজের জন্য, সীমান্তে বিএসএফের শিথিল প্রহরার জন্য অপেক্ষা।

এখন অপেক্ষা জল নেমে যাবার জন্য।

টিউবওয়েলের সামনে থালা ধোয়ার জটলা দানা বেঁধে ওঠে। ভিন-গাঁয়ের দুই দুর্গত মহিলার কুশল বিনিময় চলে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাদের উদিকে কী অবস্থা, অ দিদি?

মাথার কাপড় পিছনে সরিয়ে জিজ্ঞেস করে একজন। দ্বিতীয়জনের কাঁখে একটি নগ্ন শিশু, তার সারা মুখে ফোঁড়া।

কাল ছেলে গেসল রিলিফপার্টির লৈকোয়। ভিটার জমি নাকি জাগছে, তা বাদে মাঠে এই বুক ইস্তক জল।

আমাদের গেরামে কোমর জল গো। রাতের দিকে নাকি আবার ষাঁড়াষাঁড়ির বান ডাকবে বলছে।

দ্যাখ কী হয়। মন কয় লক্ষ্মীপুজো ইস্তক টেনে দেবে।

বুকজল, হাঁটুজল, কোমরজল, ডুবনজল— বানভাসি মনুষ্যদেহ জল মাপার কাঠি। জল কবে কখন নামবে, কীভাবেই বা নামবে, তারই জল্পনায় বুঁদ হয়ে আছে সকলে। জমি থেকে উৎখাত হলে কি হয়, জমি বইছে রক্তে।

তবে এ ব্যাপারে ননীবালা বালিকা বিদ্যালয়ের শরণার্থী শিবিরে সত্যিকারের বিশেষজ্ঞ যে মানুষটি, তিনি এই জটলা থেকে তফাতে একা পা-দুটো সামনে ছড়িয়ে বসে একটি মাছধরা জাল বুনছেন নিবিষ্টভাবে।

ছেলেবেলায় প্রসন্ন গুরুমশায়ের পাঠশালায় দীনু পালিতের মুখে শোনা সেই বুধো গাড়োয়ানের গল্প তোমার মনে আছে অপু? কেমন মন্ত্রের জোরে চার ডাকাতকে জব্দ করেছিল সে? একশো বছর নাকি বেঁচে ছিল লোকটা। তোমার সুকুমার স্মৃতিপটে আঁকা সেই বুধো গাড়োয়ানকে কতকাল কল্পনায় স্পষ্ট দেখেছি আমিও। এতকাল পরে তাকে চর্মচক্ষে দেখতে পেলাম— গুলিপাকানো চেহারা, বয়সের গাছপাথর নেই। গাড়োয়ান নয় সে। তার পেশা মাছধরা, চাষবাস। নামও তার বুধো নয়, নকুল সর্দার। মন্ত্রতন্ত্র জানে না সে, বশীকরণ ভূত তাড়ানো কিছুই জানে না। উলটে বরং তাকেই ভূতের মতো তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে একটি নদী, বিশ বছরে তেরো বার উৎখাত করেছে।

খাবার নিতে গেলেন না যে? জিজ্ঞেস করি।

নকুল সর্দার চোখ সরু করে তাকান, তারপর ব্যাজার মুখে বলেন—

পেটটা জুত নেই। তাপ্পরে ওই খিচুড়ি খেলে আর দেখতে হবে না, পোঁদের কাপড় সরানোর সময় দেবে না।

নকুলের কানে গোঁজা আধপোড়া একটি বিড়ি, হাতের লাটিম যান্ত্রিক পাক খেয়ে চলে নাইলনের সুতোয়।

কতবার বলেছি, চালডাল বেঁটে দাও যে যার মতো রেঁধেবেড়ে নিক। তা নাকি নিয়ম করেছে ইস্কুলবাড়ির মধ্যে আগুন জ্বেলে রান্না করা চলবে না। তা চলবে না তো চলবে না। তা বাদে এখানে ব্যবস্থাপনা চলনসই। জলটল আছে, হাগামোতার গন্ধ নেই, মেয়েদের সেপটি আছে। এই নিয়ে পরপর দুবছর হল তো।

সহানুভূতিসূচক কিছু একটা বলবার চেষ্টা করতে আমায় থামিয়ে দিয়ে বলেন—

দ্যাখেন, নদীর চরে বাস। বন্যাকে ডরালে কি চলে? বন্যায় মাটি চাঙা হয়, চাষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালো হয়। অবিশ্যি আজকাল বানের জল বড়ো হুটোপাটি করে আসে, টেইম দেয় না। আগের মতো রয়েসয়ে আসে না।

তাই নাকি? কেন? জানতে চাই।

ইরিগেশান ডিপার্ট থেকে বাঁধ বানাচ্ছে না? বাঁধ ভেঙে জল ঢুকে পড়ছে হুড়মুড় করে। চরে বালি তোলা শুরু হবার পর ভাঙন বেড়ে গিয়েছে। ওই ভাঙনটাতেই ভয়।

পঞ্চায়েত কিছু করছে না?

পঞ্চায়েত আবার কী করবে? নকুল ঠোঁট উলটে বলেন। সব নিজেদের লোক। কোটি টাকার কারবার। শীতের দিকে একবার এদিকপানে আসেন না, দেখবেন লরি কে লরি বালি লোড হয়ে চলে যাচ্ছে। নিউটাউন রাজারহাট হচ্ছে না? সব তো এদিককার বালি। জমি খুইয়ে কত লোক বাড়ি বানানোর লেবারি করতে যাচ্ছে। ওই বালির ঠিকাদারই পাইয়ে দিচ্ছে। এ বড়ো আজব কল।

নকুল সর্দার তেতো হেসে মুখ তুলে তাকান। নীহারদার হাতে ক্যামেরাটা দেখে হোক, কিংবা অন্য যে কারণেই হোক, হঠাৎ চুপ মেরে যান। একমনে জাল বুনে চলেন। আমরা দাঁড়িয়েই থাকি, নাইলনের সুতোর ফাঁকে ওঁর দক্ষ আঙুলের খেলা দেখি— যেন নীলাভ ঢেউয়ের ফেনায় সাঁতার দিচ্ছে কয়েকটি মাছরাঙা।

তুমি কি এই জালে মাছ ধর নাকি? নীহারদা জিজ্ঞেস করে। এখন তো পুকুর-টুকুর সব ভেসে গিয়েছে, খুব মাছ উঠছে তো?

নকুল আনমনে মাথা নাড়েন।

তাহলে তুমি হলে গিয়ে যাকে বলে মৎস্যজীবী?

তা যা বলেন। জমি থাকলে চাষ করি, না থাকলে মাছ ধরি। ইটভাটাতেও কাজ করি। আমার জমিতে এখন হাঁটুজল।

কবে নামবে? আমি জিজ্ঞেস করি।

নকুল মাথা তুলে সরাসরি তাকান, কপালের রেখাগুলো গভীর হয়। জাল সুতো সরিয়ে কানের আধপোড়া বিড়িটা ঠোঁটে গুঁজে ধরিয়ে নেন। তারপর ধোঁয়ার ফাঁকে ফাঁকে শব্দ সাজিয়ে বুনে তোলেন এক আশ্চর্য অনুপুঙ্খ জলপুরাণ।

কীভাবে নেমে যায় জল, কোন কোন জমিগুলো জেগে ওঠে প্রথমে, কেমনভাবে জল সরে যাবার সময় আশেপাশের মাঠান জমির উপরিস্তরের মাটি ধুয়ে নিয়ে যায়, কীভাবে ঘুমন্ত জোড় আর কাঁদরগুলো জেগে ওঠে আর নদীর সঙ্গে পুরোনো যোগ গড়ে নেয় আবার, সব জল নেমে যাবার পরেও কোন কোন অঞ্চলগুলো জলবন্দি হয়ে থাকে, কোথায় কোথায় সোঁতার মুখ কেটে নদীর ফ্যাকড়া পুরোনো খাতে ফিরিয়ে দিতে হয়, কোন কোন প্লাবনভূমিতে সবকিছুর পরেও জল দাঁড়িয়ে থাকে যতদিন না শীতের সূর্য তাকে শুষে নেয়।

উরিব্বাবা! তুমি তো দেখি এক্সপার্ট! ক্যামেরা থেকে চোখ সরিয়ে নীহারদা বলে ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নকুল সর্দার ঠোঁট প্রসারিত করে হাসেন ; ওপরের পাটির সামনের দাঁতদুটো দ্বিধান্বিত আঙুলের মতো জড়াজড়ি করে আছে। হাতের বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেন—

বিশ বছরে তেরোবার বানভাসি হলাম। এই ভাগীরথী মাগীটা পর পর দুটো বছর তিষ্ঠোতে দেয় না!

নকুলের মুখে ফোটে অসহায় ক্রোধ, পরক্ষণেই নরম হয়ে আসে।

কিন্তুক এমন খাঁচাকল, একে ছেড়ে দূরে কোথাও গিয়ে থাকতেও পারি না!

*

বানভাসি দেবতারা কোথায় যান?

পোড়ামাতলায় বাবার থান।

স্থানীয় মানুষেরা জানাল, শহরের এই প্রাচীন হৃৎকেন্দ্র নাকি উনিশশো আটাত্তরের সেই বিধ্বংসী বন্যাতেও ডোবেনি। চারদিক থেকে চারটি রাস্তা এসে মিলেছে এখানে। নৌকো থেকে নেমে পায়ে হেঁটে আমরা এসে পৌঁছলাম যখন, ততক্ষণে বেলা গড়িয়েছে। প্রায় চার ঘণ্টা ধরে প্লাবিত শহরের ওপর ভেসে বেড়ানোর পর নৌকোর দুলুনি আর জলে প্রতিফলিত আলোয় কেমন একটা আচ্ছন্ন অবস্থা। ডাঙায় নেমেও জাড্যের আবেশে মনে হচ্ছে পায়ের নীচে মাটি দুলছে।

টেরাকোটার মন্দিররাজির ভগ্নাবশেষ সম্ভবত সপ্তদশ শতকের। তাকে ঘিরে বেড়ে উঠেছে দৈত্যাকার বট গাছের সংসার। কাঠা পাঁচেক এলাকা জুড়ে ঝুরি নামিয়ে দিয়েছে। সেই কোন অস্পষ্ট অতীতে এই মন্দির, এই বটগাছের চারপাশে ছিল মাঠঘাট কালকাসুন্দের ঝোপ বকুল-হিজল-সাঁইবাবলার ছায়া। অদূরে প্রবাহিণী ভাগীরথী। এখন চারদিক থেকে ঠেসে ধরেছে বাড়িঘর। তবু এই সঙ্কুচিত পরিসরে প্রবল তেজে বেড়ে চলেছে বটগাছটা, ডালপালা মেলে দিয়েছে পুরোনো বাড়িগুলোর ছাতে, দোতলার বারান্দায়। কিন্তু এর গায়ে লোহা ছোঁয়ানোর স্পর্ধা নেই কারোর। গুচ্ছমূল ঘন হয়ে রাস্তার ওপর নেমে এলে তাতে বিনুনি পাকিয়ে দেওয়া হয় সন্ন্যাসীর জটার মতো। আশেপাশের বাড়িগুলোয় বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর আশ্রম। সেখানে এসে উঠেছে বানভাসি দেবতারা।

বছরভর দূরদূরান্তের মানুষেরা এসে পুজো দেয়, মানত করে, বটের ঝুরিতে ঢিল বেঁধে দিয়ে যায়। লাল সুতোয় বাঁধা অগণন ঢিল দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন আঙুরগুচ্ছ। প্রতিটি ঢিলে বন্দি হয়ে আছে গোপন মনস্কামনা, যা পূরণ হলে খুলে দেওয়াই নিয়ম।

যত ঢিল বাঁধা হয়, তত ঢিল খোলা হয় কি কখনো? মনস্কামনা পূর্ণ হবার আগেই কি মরে হেজে যায় মানুষগুলো? নাকি পূর্ণ হবার থেকে অনেক বেশি দ্রুততায় নতুন নতুন কামনার জন্ম হয়ে চলে? ঢিলগুলো আদতে মন্দিরের গা থেকে খুলে নেওয়া ইটের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টুকরো। এভাবে টুকরো হতে হতে হয়তো মন্দিরের ভগ্নাবশেষটাই হারিয়ে যাবে একদিন, বটের শাখায় ঝুলে থাকবে কামনার দ্রাক্ষাকুঞ্জ হয়ে।

আমরা চত্বরটা প্রদক্ষিণ করে গাছ আর টেরাকোটার এই আশ্চর্য বীথিতে প্রবেশ করি। ক্যামেরার চোখ সবুজ ধূসর আর পোড়া লালের ওতপ্রোত বিন্যাসটা ধরে।

মোটা বটের ঝুরির অন্দরেকন্দরে পুজোসামগ্রীর দোকান রয়েছে। এই অসময়ে দোকানিরা ঝিমোচ্ছে। ওপরে পাখিদের সংসার। চিকন পাতায় আশ্বিনের বিকেলের আলো এসে পড়েছে। ওপরের এই নিবিড় সবুজ বনানী থেকে ধীরে ধীরে নীচের দিকে দৃষ্টি নামিয়ে আনলে দেখা যায় কীভাবে মোটা মোটা গুঁড়ি আর শিকড়ের ধূসর পেশিবিক্রম ইটপাথর ফাটিয়েছে, পেঁচিয়ে ধরেছে টেরাকোটার খিলান। কয়েকশো বছর ধরে এই মহীরুহের বেড়ে ওঠার ছবি যদি কোনো টাইমল্যাপ্স মুভি ক্যামেরায় ধরে রাখা যেত, যদি সেটা দেখে ফেলা যেত কয়েক সেকেন্ডে, তাহলে মনে হতে পারত যেন এক অকল্পনীয় জুরাসিক জন্তু মাটি ফুঁড়ে উঠে ফাটিয়ে কামড়ে পিষে ধরেছে এই দেবদেউল। বটের ঝুরির অলিগলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সেই ছবিটা মাথার ভেতরে চলে, নাকে আসে আর্দ্র বনগন্ধ— জুরাসিক জন্তুর নিঃশ্বাস।

মূল দেউলের বিমান ফাটিয়ে মোটা মোটা শিকড় নেমেছে, পাতার ভেতর দিয়ে সবজেটে আলো চুঁইয়ে আসছে গর্ভগৃহে, সেই আলোছায়ার বিভ্রমে যেন মাধ্যাকর্ষণহীন ভেসে আছে কষ্টিপাথরের লিঙ্গ, মাথায় একটি সতেজ ধুতুরো ফুল।

বাইরে বেরিয়ে আসি, গভীর শ্বাস নিই।

বাবার থানের ঠিক পিছনে আরেকটা বাজার। এখানে জল নেই, তবে গোটা শহর প্লাবিত হয়ে পড়ায় দোকানগুলো বন্ধ। ছায়াচ্ছন্ন গলির মধ্যে থেকে মানুষের কথাবার্তা শোনা যায়। ভারি ভারি দুধের ক্যান নামানো হচ্ছে। গোয়ালারা এসেছে।

মিষ্টির দোকানে দুধ কেনাবেচা চলছে। বড়ো বড়ো লোহার কড়াইয়ে জাল দেওয়া হচ্ছে দুধ। এখন মিষ্টির খদ্দের নেই, দুধগুলো খোয়াক্ষীর হয়ে চলে যাবে কলকাতায় বর্ধমানে।

শালপাতায় গরম খোয়া হাতে হাতে উঠে আসে। স্বাদু, মোলায়েম, কাশফুলের মতো চিকন।

দুর্গত শিবিরে গরুরা দুধ দিচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কচুপাতার ছাতা

রানাঘাট-বনগাঁ লাইনে গোপালনগর স্টেশন থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে, ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের পূর্বদিকে একটি গ্রামের নাম বারাকপুর। স্থানীয় লোকের মুখে চালকি-বারাকপুর। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে মুমূর্ষু ইছামতীর খাত, পানা-শ্যাওলায় ঘেরা, স্রোতহীন। তার ওপর একটি সাঁকো। সাঁকোর পাশে পঞ্চায়েতের দোতলা অতিথি নিবাস হয়েছে। তারপরেই একটুকরো ফাঁকা জায়গায় একটি অতিকায় সিমেন্টের মূর্তি— চেয়ারে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি, ধুতিপাঞ্জাবি-পরা, স্বাস্থ্যবান চেহারা, বাঁ হাঁটুর ওপর ডান পায়ের জঙ্ঘা রেখে ঘাড়টা সামান্য বেঁকিয়ে চেয়ে আছেন দূরে, ইছামতীর খাত বাঁক নিয়েছে যেখানে। ঠায় বসে একটি কলস্বিনী নদীর শব দেখছেন।

সেবারের বন্যায় নদীটা প্রাণ ফিরে পেল, দুকূল প্লাবিয়ে ভাসিয়ে দিল দুপাশের মাঠঘাট গ্রাম। চেয়ারে-বসা সিমেন্টমূর্তির পায়ের ওপর উঠে এল জল। ভাসল চালকি বারাকপুর সাইলেপাড়া চিত্রাঙ্গপুর নিশ্চিন্দিপুরও। মানুষেরা ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গেল, আশ্রয় নিল শরণার্থী শিবিরে। বিপুল প্লাবনে আর নদীটাকে আলাদা করে চেনা যায় না, দুপাড়ে চাষের খেত ভাসছে। দূরে দূরে শিরিস আর বাঁশবনের মাথাগুলো জেগে আছে কেবল। তাঁর চেয়ারের পায়ার ফাঁকেও কুলকুল করে বইছে জল। জলে ভেসে যাচ্ছে কচুরিপানা, সাপখোপ, খড়ের চাল।

এভাবেই রাত নামে, বাঁশের মাথায় ঝিঁঝিঁপোকা ডেকে চলে কিটকিট শব্দে, ক্ষয়াটে চাঁদের আলো ছড়িয়ে যায় ব্যাপ্ত চরাচরে। চেয়ারে-বসা বিশাল সিমেন্টমূর্তি চেয়ে থাকেন নিথর জলভূমির দিকে। হয়তো দূরে দেখা যায় বুকজল ঠেলে চলেছে একসার নারী, ঘোমটায় ঢাকা— যেন নুয়ে-পড়া ধানের শিস, জলের ওপর জেগে দুলে দুলে চলেছে। এক ফালি চাঁদ মাথায় নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে প্লাবিত মাঠের ওপর দিয়ে।

চেয়ারে-বসা বিশাল সিমেন্টমূর্তির মনে ভেসে ওঠে অতীতস্মৃতি। তাঁর এই স্বদেশভূমি ছিল যশোর জেলায়, দেশভাগের সময় চলে আসে চব্বিশ পরগনায়। তখনও এভাবেই মানুষের মিছিল রাতের অন্ধকারে চলেছিল, মাঠঘাট নদী বিল ভেঙে, ভিটেমাটি ছেড়ে এক অন্তহীন মিছিল— মনে হয়েছিল শেষ হবে না কোনোদিন।

হয়ওনি শেষ। এই পথ দিয়েই মানুষ গরু সাইকেল পাচার হয়ে চলেছে অবিরত। বিশাল সিমেন্টমূর্তি চেয়ারে বসে দেখে চলেছেন সব। তাঁর হাতে কাগজকলম নেই, জলে জ্যোৎস্নার আলোছায়ায় বাঁশবনের মাথায় সরু কঞ্চির ডগা দিয়ে লিখে চলেছেন তিনি।

অসংখ্য নদীনালায় ভেসে আসা পলি জমে গড়ো-ওঠা এক নবীন সবুজ ভূখণ্ড।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নদীগুলো হেজে মজে যাচ্ছে, তার ধারে জন্ম নেওয়া জনপদে জমছে বিস্মৃতির পলি। তারপর কোনো একদিন প্রতিশোধের মতো জেগে উঠছে নদী। বানভাসি মানুষ ভিটে হারিয়ে ফের বসতি গড়ে তুলছে নদীর প্লাবনভূমিতে। আবার বানভাসি হয়ে পড়ছে। এই বঙ্গদেশ এক বিস্তীর্ণ প্লাবনভূমি, ভাঙা-গড়ার খেলা তার শেষ হয়নি আজও। এরই মাঝে চলেছে মানুষের আসা যাওয়া। এক আবহমান বিপর্যয়ের ছবি। চেয়ারে-বসা সিমেন্টমূর্তি চেয়ে থাকেন। ইতিমধ্যে ঘোমটা-ঢাকা নারীদের দলটা এগিয়ে এসেছে, নদীটাকে বাঁ পাশে রেখে সন্তর্পণে হেঁটে এদিকেই আসছে তারা, কতদূর থেকে মাঠ বন বাওড় সোঁতা ভেঙে, কাঁটাতার গলে আসছে তারা স্রোতের মতো প্রবাহিণী। কাছাকাছি আসতে জলে চাঁদের আলোর প্রতিফলনে ঘোমটার নীচে মুখগুলো দেখা যায়।

সেই কবেকার পাড়াগাঁর নারী সব, বুড়ি পৃথিবীর মতো, পলুইছাতা জড়িবুটি শাক-শাপলা কুড়ুনির দল। মাঠে শস্য উঠে যাবার পর যখন কাটা খড়ের নাড়ায় জড়ায় মাকড়শার জাল, শিশিরকণা জমে ওঠে বাবুইয়ের ভাঙা ডিমের খোলায়, তার ওপরে সাঁতার দেয় কাঠিপোকা, তখন দেখা যায় এদের— মাঠে পড়ে-থাকা শস্যের দানা কুড়িয়ে নিতে এসেছে। চেয়ারে-বসা বিশাল সিমেন্টমূর্তি চিনতে পারেন, ছপ ছপ জলের শব্দ শুনতে পান তিনি। চাঁদের আলোর আভায় মুখগুলো দেখা যায় কেবল, আর কিছু নয়। কেবল ছপ ছপ জলের শব্দ।

ওদের পাগুলো কি হাঁসের মতো জোড়া? হাতগুলো মাছের পাখনার মতো? পরনের কাপড় জলের নীচে আঁশ হয়েছে কি চামড়ায়?

*

আগে বাজারে গ্রাম থেকে বুড়িরা আসত, ডুমুর শাপলা থানকুনি সোনাখড়কে মাছ এইসব নিয়ে। সাকুল্যে হয়তো টাকা পাঁচেকের জিনিস। এখন আর ওদের দেখতে পাও? পাবে না। পাবে কী করে? পুবে যে বিরাট জলাটা ছিল, ওই ঝোপঝাড় ঝিল সব হারিয়ে গিয়েছে। অথচ এককালে খাল দিয়ে গঙ্গার যোগ ছিল। শীতকালে বালিহাঁস আসত। বাজারে পাওয়া যেত তার মাংস। কী সোয়াদ!

বলছিলেন আমাদের মেজকা। পক্ষাঘাতে দেহের বাঁদিকটা অকেজো হয়ে যাওয়ায় তিনি অবশ্য আর বাজারে যেতে পারতেন না। থাকতেন শহরতলির পূর্বপ্রান্তে একটি পুরোনো সরকারি আবাসনে। অকৃতদার মানুষটি দীর্ঘকাল কমিউনিস্ট পার্টির হোলটাইমার ছিলেন। আমার বাবার কী এক দূরসম্পর্কের ভাই, আমরা মেজকা বলেই ডাকতাম।

ছেলেবেলায় সেইসব বুড়িদের আমিও দেখেছি। বাজারের গলির শেষ প্রান্তে, যেদিকটায় শুঁটকিমাছ আর কচ্ছপের ডিম পাওয়া যেত, সেখানে সার দিয়ে বসতো ওরা। দাঁতে কালো মিশি, কারো বা গলায় তুলসীর মালা আর কপালে রসকলি, বৃষ্টি আর রোদ থেকে বাঁচতে মাথায় ধরে থাকত বড়ো বড়ো কচুপাতা। ওরা সবাই হারিয়ে গিয়েছে। পুবদিকে বিস্তীর্ণ জলা পতিত অঞ্চলটাই হারিয়ে গিয়েছে। সেখানে এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইটভাটা আর মহিষের খাটাল। ধোঁয়ায় কালো আকাশে উঁকি দেয় দূরে নতুন টাউনশিপের গগনচুম্বী রেখা।

সেবার সেপ্টেম্বরে যখন আমাদের অঞ্চল ভাসল, গঙ্গার জল ফুলে উঠে প্রথমে ঢুকে পড়েছিল পুবের ওই জলায়। দুর্ঘটনায় স্মৃতিভ্রষ্ট মানুষের চেতনায় যেভাবে স্মৃতি ফিরে আসে, যেভাবে ছেঁড়া ছেঁড়া দৃশ্যকল্প আর ঘটনা খুঁজে নিতে থাকে পুরোনো যোগসূত্র, অনেকটা সেভাবেই হাজামজা খাল, বেদখল বিল, বদ্ধ স্থির জলাগুলো সব জীবন্ত হয়ে উঠতে লাগল, পরস্পরে জুড়ে যেতে লাগল ঝোপঝাড়ে ছাওয়া প্লাবনভূমির ওপর দিয়ে। আর পেছনদিক থেকে, অনেকটা গেরিলা হানার মতো, ঘিরে ফেলল আমাদের পুরোনো শহরতলি।

ভোররাতে, যেসময় সেনাঅভ্যুত্থান হয়, ব্যারেজের জল ছাড়া হল। কত কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে তার সতর্কবার্তা পরদিন টিভিতে রেডিয়োয় ঘোষণা হয়েছিল। কিউসেক, অর্থাৎ কিউবিক ফুট প্রতি সেকেন্ড। ওই কিউসেক পরিমাণ জল কত সেকেন্ড মিনিট বা ঘণ্টা ধরে ছাড়া হয়েছে সেটা অবশ্য জানানো হয়নি। সেই জলে ঠিক কোন কোন এলাকা, কোন কোন মৌজা বা গ্রাম, কত বর্গ কিলোমিটার এলাকা প্লাবিত হতে পারে সেটাও জানানো হয়নি। জনপদের ভেতরে জল এসে ঢুকলে বানভাসি মানুষ আশ্রয়ের জন্য কোন কোন দিকে যেতে পারে, জানানো হয়নি।

সেবার আকাশ ছিল অপরাজিতার পাপড়ির মতো নীল, তার গায়ে রুপোলি পেঁজা মেঘ। দক্ষিণবঙ্গে একফোঁটাও বৃষ্টি হয়নি, অথচ উত্তরভারতে প্রবল বর্ষণে হিমালয় থেকে নেমে আসা নদীগুলোয় বান ডেকেছিল। নেপাল ও উত্তর বিহারের উষর, অরণ্যহীন প্লাবনভূমির ওপর দিয়ে বয়ে-আসা জল সাপুড়ের বাঁশির মতো ফুলিয়ে দিয়েছিল গঙ্গাকে। সেই জল বেঁধে রাখার চেষ্টা করলে ফারাক্কা ব্যারেজ ভেঙে যাবার একটা আশঙ্কা ছিল। অন্তত সেরকমই বলা হয়েছিল। অথবা, আরও প্রলয়ঙ্কর যেটা, ব্যারেজকে সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে বিপুল জলধারা কালিন্দ্রী-মহানন্দার খাত ধরে নতুন পথ করে নিতে পারত পদ্মার দিকে। সেক্ষেত্রে মালদা জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যেত, সেইসঙ্গে ভাগীরথী-হুগলি নদীটাই মুছে যেত মানচিত্র থেকে। সেজন্যই নাকি ফারাক্কার জল ছাড়া হয়— সরকারি সূত্রে প্রকাশ— দক্ষিণবঙ্গে সদ্য-শেষ-হওয়া বর্ষায় মাটি খালবিল সব টইটম্বুর হয়ে আছে সেটা জেনেও।

এক মঙ্গলবার ভোররাতে জল ছাড়া হল। হুগলি নদীতে তখন ভরা জোয়ার। পরদিন, অর্থাৎ বুধবার দুপুরের দিকে জল ঢুকল পুবের জলাভূমিতে। ঠিকে কাজের মেয়েরা বিকেলে বাড়ি বাড়ি কাজ করতে এসে জানালো, জল উঠে এসেছে জলার ধারে কলোনিগুলোয়। সে এক দৃশ্য : মাথার ওপর ঝলমল করছে শরতের আকাশ, নীচে থই থই গেরুয়া রঙের জল। জল গুঁড়ি মেরে এগিয়ে এসেছে নতুন গজিয়ে-ওঠা আবাসনগুলোর কাছে। জলে উজ্জ্বল রঙিন হালফ্যাশনের বহুতলগুলোর প্রতিবিম্ব, দেখে মনে হয় যেন প্লাস্টিকের খেলনা কিউব। সেই প্রতিবিম্বের ওপর দিয়ে ভেসে আসছে নৌকো, কলার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেলা ; ওপরে ডাঁই করা বসতির টুকরোটাকরা— যেন সুবোধ গুপ্তের ইন্সটলেশান। কলোনির মেয়ে-বউরা শাড়ি গাছকোমর বেঁধে পুরুষদের পাশাপাশি হাত লাগিয়ে নৌকো আর ভেলাগুলোকে ঠেলে নিয়ে চলেছে বাসরাস্তার দিকে। নৌকো থেকে হাতে হাতে ভ্যান রিক্সায় উঠে আসছে সংসার— টালি বাঁশ দর্মা টিন, রান্না ভুষোকালি আর মাঙ্গলিক সিঁদুরচিহ্ন আঁকা, তার ওপরে লেজ খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে একটি বেড়াল, উপড়ে আনা পুঁইলতা। কাঠের তাঁত খুলে আনা হয়েছে। লুঙ্গিটা দ্রুত হাঁটুর ওপর পাক মেরে লাফিয়ে জলে নেমে পড়ে তাঁতি, হাতের মুঠোয় ছোট্ট মুরগিছানা। সেটি কিশোরী মেয়ের হাতে চালান করে দিয়ে মাল নামাতে শুরু করে।

চোখের পলকে একটি বসতি খুলে অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছে যে মানুষগুলি, তাদের মুখেচোখে তৎপরতা আছে, কিন্তু শঙ্কা নেই। বরং এক অদ্ভুত নির্লিপ্তি আছে। আগের দিন সারারাত ধরে তারা জল বাড়তে দেখেছে, হাজামজা খালবিলগুলো জুড়ে যেতে দেখেছে, অপেক্ষা করেছে, হয়তো প্রার্থনাও করেছে ইষ্ট দেবদেবীর কাছে। ভোররাতে ক্লান্ত নৈঃশব্দ্যের ভেতর নদীর বিচিত্র ছপ ছপ শব্দ শুনেছে, ঠিক যেন জল থেকে ভিজে কাপড়ে উঠে আসছে একদল নারী। ঘরে তক্তপোশের নীচে ইট পেতে তার ওপর সকলে উঠে পড়েছে ছানাপোনা নিয়ে, উঠে পড়েছে চালের বাতায়, অসহায় চোখে দেখেছে কীভাবে উঠোনে ভরে উঠছে জল, মাটিতে গর্ত করা উনুনের খোঁদলে গুবগুব শব্দ করে ঘুর্ণি তৈরি হচ্ছে, লাফ দিয়ে ডিঙোচ্ছে মেরজার চৌকাঠ, ঘটিবাটিগুলো ভাসতে শুরু করেছে নৌকোর মতো। তারপর তারা ঘর ছেড়েছে।

ভ্যানরিক্সায় বোঝাই হয়ে মানুষের টুকরোগুলো চলে যায় শরণার্থী শিবিরে, কিংবা দূরের কোনো কলোনিতে আত্মীয়পরিজনের কাছে। প্লাবনে মজা খালে বিলে যেমন প্রাণ ফেরে, পুরোনো যোগাসূত্র জেগে ওঠে, সেভাবেই দুঃসময়ে রস ফেরে পুরোনো সম্পর্কের শিকড়ে। এক উদ্বাস্তুকলোনি চলে যায় অন্য উদ্বাস্তুকলোনির দিকে।

বুধবারেও সারারাত ধরে জল বাড়ল। নর্দমার পথ ধরে জল ঢুকে পড়ল পাড়ায় পাড়ায়। প্রথমে নীচু অর্বাচীন এলাকাগুলো, তারপরে সর্বত্র। লালচে বাদামি জল, টাঁড়ভূমির উপনদী আর গঙ্গার জোয়ারে মেশা জল স্থানকৌলীন্যের রেয়াত না করে ছড়িয়ে যেতে লাগল। বৃহস্পতিবার সকালের মধ্যে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে হাঁটু জল। লাল নীল সোনালি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের গাড়িগুলো মুখ দেখছে জলের আয়নায়। নতুন আবাসনের সামনে শর্টস-পরা পুরুষের জটলা— পৃথুল ক্যালরিদীপ্ত চেহারা, হাতে মোবাইল, বন্যা পরিদর্শনে বেরিয়েছে। একটি নতুন রাস্তা, একটি নতুন পিনকোড রাতারাতি বদলে দিয়েছে একটি অঞ্চলের মানচিত্র সমাজচিত্র অর্থনীতি। মহানগরীর অ্যাডেড এরিয়া, অ্যাডেড মানুষজন।

হাউজিং-এর পেছনের ওই পচা নর্দমাটাই আসল কালপ্রিট— বললেন দলের মধ্যে নেতা গোছের একজন। পুরো জলটা টেনে নিয়ে এসে এদিকে ফেলছে। ওটা বন্ধ না করে দিলে জল আটকানো অসম্ভব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপু, তুমি ওই লোকটাকে একটু বলে দেবে, ওটি নর্দমা নয়, একটি প্রাকৃতিক খাল? এদিকটায় বসতি গজিয়ে ওঠার অনেককাল আগে থেকেই আছে। এককালে ওই খাল দিয়ে হুগলি নদী থেকে বিদ্যাধরীতে নৌকো চলত, তুমি স্বচক্ষে দেখেছ। খালের দুপাশে বিস্তীর্ণ প্লাবনভূমিতে শত শত বছর ধরে গড়ে উঠেছিল জলা আর বাদাবনের বিশিষ্ট বাস্তুতন্ত্র। তখন কি সুন্দরবন এতদূর বিস্তৃত ছিল? কে জানে। কিছুকাল আগে এখান থেকে ডুমুর, গিমে শাক, পাতালকোঁড় আর সোনাখড়কে মাছ বাজারে বেচতে আনতো ওদিকের গ্রামের বুড়িরা। তাদের দাঁতে মিশি, কপালে রসকলি, মাথায় ধরা কচুর পাতা— ছেলেবেলার সেই ঘুমপাড়ানি মাসিপিসির দল।

ওরা আর আসে না। তার বদলে আসে এই জল, লালচে ঘোলা জল, ঘুমপাড়ানি মাসিপিসির পরনের কোরা থানের মতো রং তার।

আপনার মোবাইল কাজ করছে? আমারটায় টাওয়ার নেই।

আমাদের কারোরই টাওয়ার নেই। টাওয়ারের মেশিনঘরে নাকি জল ঢুকে গিয়েছে।

আমি দিন সাতেকের মতো মিনারেল ওয়াটার আর খাবার স্টোর করেছি। ভাগ্যিস ক্যারেন্টটা এখনও আছে। ফ্রিজ বন্ধ হলে কেলো হবে।

আর টিভি? পাম্প চালানো যাচ্ছে না, ট্যাঙ্ক খালি।

জলের ওপর তেলের মতো কী যেন ভাসছে, চামড়ায় লাগলেই চুলকোচ্ছে, কিছুক্ষণের মধ্যে ফুটে উঠছে লালচে বেগুনি চাকাচাকা দাগ। এভাবে জলবন্দি হওয়ার জন্য যতটা না, তার থেকেও এই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়াটা পীড়া দিচ্ছে বেশি। অচৈতন্য মোবাইল হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে অভ্যাসবশত কানে উঠে যাচ্ছে।

শীট!

*

শুক্রবার ট্রান্সফর্মারের মাচায় জল উঠে আসায় আমাদের এলাকায় বিদ্যুৎসংযোগ কেটে দেওয়া হল। বিকেলের মধ্যে পাড়াটা শুনশান হয়ে পড়ল। একা বাড়ি পাহারা দিচ্ছি আমি। একতলার বারান্দার চার আঙুল নীচে জল। হালকা আসবাবগুলো দোতলায় টেনে তোলা হয়েছে। নীচে দরজা আর মেঝের ফাঁকে খবরের কাগজ পাকিয়ে তার ওপর প্লাস্টিক জড়িয়ে প্যাকিং গুঁজছি আমি। আমার ঘরে যত পুরোনো কাগজ আছে তা দিয়ে এই পাড়ার সব বাড়িতে প্যাকিং দিতে পারি। মা বলেন, একদিন এই পুরোনো কাগজ চাপা পড়ে মারা যাবি তুই। যেদিন ইন্দিরা গান্ধী মারা গেলেন, যেদিন ভারত ক্রিকেট বিশ্বকাপ জিতল, যেদিন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংস হল— এইসব, স—ব দিনের কাগজ আছে আমার কাছে। এখন সেগুলো দিয়ে আমি বাথরুমের নর্দমা, রান্নাঘরে নালার মুখ বন্ধ করি।

ওভাবে কি জল আটকানো যাবে? মেজকা শুনে বলেন। জল আর বাতাস, যতটা ডেলিকেট ঠিক ততটাই স্ট্রং। কেমন করে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন তৈরি হয়েছে জানো তো?

মেজকার জন্য একজন আয়া আসে রোজ। প্লাবন শুরু হবার পর থেকে আমি নিয়ম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে দিনে দুবার ওঁর খবর নিতে আসি। এদিকটায় বিদ্যুৎ আছে, তবে ঘন ঘন চলে যাচ্ছে।

কলোরাডো নদী ?

রাইট ! কিন্তু আমাদের নদীটা কী কাণ্ড বাঁধিয়েছে বল দিকি ?

একটু থেমে কব্জিতে চাপ দিয়ে কাঁধটা খাটের মাথার দিকে চাগিয়ে তোলেন। বাঁ দিকটা পড়ে যাবার পর থেকে মেজকার ডান হাত পেশল হয়ে উঠেছে, টেনিস খেলোয়াড়দের যেমন হয়। চোখ বন্ধ করে থাকেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর অনেকটা স্বগতোক্তির ঢঙে বলে চলেন—

কাল রাত্তিরে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। কাগজে কদিন ধরেই পড়ছি গঙ্গা খাত বদলে ফারাক্কাকে পাশ কাটিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে পড়তে পারে। স্বপ্নে দেখলাম সেটাই সত্যি হয়েছে, আর একেবারে শুকিয়ে খটখটে হয়ে গিয়েছে আমাদের এই গঙ্গা। চারিদিকে শুধু বালি আর বালি, আর এদিক ওদিক হেলে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা নৌকো। তার মধ্যে বাস করছে মানুষ, এককালে সিএমডিএ-র পাইপের মধ্যে যেমন দেখা যেত।

আমি ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে স্বপ্নটার আঁচ পাবার চেষ্টা করি। ঘরে মোমবাতি জ্বলছে, তার নরম আলোয় মেজকার মুখের একটা পাশ আলোকিত। বাঁদিকের ঠোঁট আর চোয়াল সামান্য বেঁকে গিয়েছে, তোবড়ানো মুখোশের মতো দেখায়। মাথার পেছনে জানলায় একটুকরো আকাশ দেখা যায়, ধরতের আশ্চর্য বর্ণময় সূর্যাস্ত হচ্ছে, তার গায়ে চক্রাকারে উড়ছে কাক।

মেজকাকে দেখলে তুমি ঠিক চিনতে পারতে, অপু। তোমার রিপন কলেজের বন্ধু সেই অনিল, আদর্শবাদী দেশপ্রেমিক অনিল। মনে পড়ে, একদিন তোমরা দুজনে হাতে হাত রেখে শপথ নিয়েছিলে ? আমরা কোনোদিন কেরানিগিরি করব না, আয় শপথ নিই ! মনে পড়ে ? মেকলের সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্প ভেতর থেকে বানচাল করার শপথ নিয়েছিল দুই তরুণ কলেজপড়ুয়া।

সেই অনিল ফিরে এসেছে, দেখ, বৃদ্ধ হয়েছে বলা যায়।

যদিও অনিলের মৃত্যু হয়েছিল হার্নিয়ায়। একটি সম্ভাবনার অকালমৃত্যু ; কেমব্রিজে পড়তে যাবার স্বপ্ন ছিল তার। মেজকাও বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র, যোগ দিয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। বেঁচে থাকলে অনিলও কি তাই করত ?

আমাদের মতো যারা কৈশোর ছেড়ে যৌবনে উত্তীর্ণ হয়েছে উনিশশো আশির দশকের গোড়ায়, তাদের পক্ষে পরিবারে কিংবা পাড়ায় মেজকার মতো কোনো মানুষের সান্নিধ্যে না আসাটা বেশ একটু বিরলই ছিল বলা যায়। এই গোত্রের মানুষেরা থাকতেন ঠিক পরিবারের মধ্যেও না, আবার পুরোপুরি বাইরেও না। যাবতীয় সামাজিক আপস আর হাফগেরস্তপনার প্রতি, সব ধরনের লোলুপ মধ্যমেধার প্রতি এক তীব্র শ্লেষ আর তাচ্ছিল্য থাকত এঁদের। অনিলের মতোই সিনিক আর আদর্শবাদী।

এই চরিত্রলক্ষণগুলো সেই বয়সে আমাদের আইকন করে তুলেছিল মেজকাকে। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেগুলোই আবার তাঁকে দলের থেকে বিচ্ছিন্ন করে তোলে। ক্রমশ একা হয়ে পড়েন মানুষটি।

যৌবনে তাঁর জীবনে নাকি একটি প্রেম এসেছিল। মেয়েটি ছিল সর্বক্ষণের পার্টিকর্মী, নীচু জাত। মেজকা ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের। প্রেমের জন্য পরিবার ছাড়েন মেজকা, কিন্তু কিছুটা দেরি করেছিলেন। তার আগেই প্রেমিকা ছেড়ে যায় ওঁকে। এসবই ছেলেবেলায় কানাঘুষো শোনা, চোখে দেখিনি কিছু। কিন্তু যৌবনে মানুষটি যে অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন, সেটা বয়স আর পক্ষাঘাতজনিত ক্ষয় সত্ত্বেও বোঝা যেত।

অনেকক্ষণ, যেন প্রায় এক যুগ পরে চোখ খোলেন মেজকা।

আচ্ছা, ধর সত্যিই যদি গঙ্গা খাত বদলায়, যদি ফিডার ক্যানালের জল পুরো শুকিয়ে যায়, এক্সপার্টরা যেমন বলছে আর কি, তাহলে তোমার কি মনে হয় মানুষ মরা গঙ্গার খাতে গিয়ে বাস করতে শুরু করবে?

কেমন আচ্ছন্ন শোনায় ওঁর গলার স্বর; এতক্ষণ যে দুঃস্বপ্নের ভেতরে ছিলেন, সেখান থেকে পুরোপুরি ফিরে এসেছেন বলে মনে হয় না।

সেটা তো হতেই পারে মেজকা, আমি বলি। বাম্বজোলায় টালিনালায় পচা খালের ওপর মাচা বেঁধে যদি মানুষ বছরের পর বছর বাস করতে পারে, তাহলে শুকনো নদীখাতে গিয়ে থাকতে শুরু করবে না কেন?

ঠিক বলেছ! কিন্তু খালগুলো সংস্কারের কী হল বল তো? একটা ঝুপড়িও সরাতে পারল? তিনদিন ধরে একটা শহরের পুকের মধ্যে থই থই করছ জল। ভাবা যায়?

বিক্ষুব্ধ মেজকা। পার্টির ভেতরে বাইরে তাঁর মতো নিষ্ক্রিয় হয়ে আসা একদল কর্মীর গায়ে সেঁটে যায় ওই তকমা: বিক্ষুব্ধ। সেই সময় ওঁর পার্টিতে চালু হয়েছে একটি বুলি— পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য। এই নিয়ে কর্মীসভা হচ্ছে। নেতাদের একাংশ আওড়াতে শুরু করেছে দেং জিয়াও পিং-এর সেই বিখ্যাত উক্তি— বেড়ালের রং সাদা নাকি কালো সেটা দেখা হবে না, যদি সেই বেড়াল ইঁদুর ধরতে পারে! চাঁদ ডুবে যাবার পর ইঁদুর ধরার সেই অদ্ভুত আঁধারে দল ছেড়েছিলেন মেজকা।

নানা কারণে আমার জীবন থেকেও দূরে সরে গিয়েছিলেন তিনি, একটা প্লাবন আমায় ফিরে দিল তাঁর কাছে। প্লাবনে পুরোনো যোগসূত্র জেগে ওঠে, শুকনো সোঁতা আর খালগুলো জুড়ে যায়, বদ্ধ জলায় প্রাণ ফেরে।

সেইসব বালিহাঁস আর সোনাখড়কে মাছের জন্য আর শোক করে কী হবে? আমি হেসে বলি। পুবের ওই জলাভূমিতে জবরদখল কলোনি হয়েছে কতকাল হল। আপনার পার্টিই বসিয়েছে।

আমার পার্টি?

হ্যাঁ, মানে আপনার ভূতপূর্ব পার্টি। ভূমিসংস্কার করে, যত পতিত নাবাল জমি খাস করে পাট্টা বিলি করেছে কারা?

মেজকা আপত্তিসূচক মাথা নাড়েন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওভাবে বোলো না, একটা হিস্টরিক নেসেসিটির সঙ্গে বিষয়টা গুলিয়ে ফেল না। সাতচল্লিশে দেশভাগের পর পাঞ্জাবে সম্পত্তি হস্তান্তর হল, আমাদের এখানে সেসব কিছুই হল না। সেই ইতিহাসটা তুমি হয়তো বইয়ের পাতায় পড়েছ, আমি দেখেছি। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু আসছে। তারা থাকবে কোথায়? খাবে কী? নেহেরু বিধান রায়কে বললেন— লেট দেম স্টিয়ু ইন দেয়ার ওন জ্যুস! সরকার চোখে ঠুলি এঁটে বসে রইল। অসহায় বাস্তুহারা মানুষগুলোর পাশে রাষ্ট্র এসে দাঁড়ায়নি। কংগ্রেসও না। কমিউনিস্টরা এসে দাঁড়িয়েছে। মানুষ মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মানুষ নিজের উদ্যমে একটা নতুন জীবন গড়েপিটে নিয়েছে। এটা বড়ো কম কথা নয়। তার শরিক হয়েছিল আমাদের পার্টি।

মোমবাতির আলোয় মেজকার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কপালে বিনবিনে ঘাম জমেছে। কয়েক মুহূর্ত থেমে, দম নিয়ে ফের বলে যেতে থাকেন—

একাত্তরে বাংলাদেশ যুদ্ধের পর ফের সেই ইতিহাস আবার রিপিট হল। দুর্ভাগা এই রাজ্য! এমনিতেই জমি বাড়ন্ত, ব্যবসাবাণিজ্য সব চলে যেতে শুরু করেছে তখন, কলকারখানাগুলো ধুঁকছে। তার ওপর এসে আছড়ে পড়ল এই বিপুল মানুষের ঢেউ। ফের একটা বেঁচে থাকার লড়াইয়ে শামিল হওয়া। তারপরে তো যাইহোক ক্ষমতায় এল পার্টি। অপারেশান বর্গা হল। দশটা বছরে ভূমিহীনদের মধ্যে যত পাট্টা বিলি হয়েছে, স্বাধীনতার পর এতগুলো বছরে সারা দেশে আর কোথাও হয়েছে কি? খোঁজ নিয়ে দেখো। যদিও সেটা শেষ কথা নয়। সেটা হতে পারত একটা শুরু। হল না।

কিন্তু মেজকা, ভূমিসংস্কার করতে গিয়ে গ্রামের আশেপাশে সব পতিত নাবাল জলা জংলা জমিগুলোকে খাস করে নেওয়া হল। ওর মধ্যে কিন্তু নদীর প্লাবনভূমিও ছিল, বছরের পর বছর পড়ে থাকত ওড়কলমি শেয়াকুল বনডুমুরের ঝোপঝাড়ে ভরা। সবার জন্য অবারিত— গ্রামের আতুরি বুড়িরা পাতালকোঁড় হিঞ্চে-ব্রাহ্মী-গিমে শাক শাপলা তুলে নিয়ে বাজারে আসত। পুজোপার্বণে গরিবগুর্বো মেয়েবউরা তুলে আনতো আকন্দকুঁড়ি ধুতরোর ফুল, দুর্ভিক্ষের সময় গোঁড়িগুগলি। পাঁচ-দশ বছরে একবার বড়োসড়ো বন্যা হলে জলে ভরে গিয়ে বসতিগুলোকে বাঁচাত, কিন্তু...

দুর্ভিক্ষ! দুর্ভিক্ষ থেমেছে কি? বন্ধ চোখের পাতা খুলে অদ্ভুত স্বরে প্রশ্ন করেন মেজকা, যেন এইমাত্র গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠলেন।

তারপর দেখুন, জমিগুলো খাস করে পাট্টা বিলি করা হল। ভূমিহীনরা জমি পেল, ভালো কথা। কিন্তু পাট্টা সব পরিবারের পুরুষদের নামে, মেয়েরা কিন্তু কিছুই পেল না। অথচ এইসব পতিত নাবাল জংলা জমিগুলো ছিল মেয়েদের দেশ। অশনি সংকেত সিনেমায় সেই মেটে আলু তুলতে যাবার সিনটা মনে করুন। তারপর মনে করুন ইন্দির ঠাকরুন— বুড়ি শান্তিতে মরবে যে, সেই বাঁশঝাড়গুলো হারিয়ে গেল। সোনাডাঙার মাঠ, নয়ানজুলির ধারে বিস্তীর্ণ কাশফুল, অপু-দুর্গার রেলগাড়ি দেখার ছুট— সব হারিয়ে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেটের দায়! পেটের দায়!

ফের চোখ বন্ধ করে আধশোয়া হয়ে বিড়বিড় করেন মেজকা। আমার কথা শুনছেন কী না বোঝা যায় না। হঠাৎ চোখ খুলে সরাসরি তাকান, হাতে ঠেস দিয়ে উঠে বসেন। সহসা উত্তেজিত হলে ওঁর ঠোঁটের বাঁদিকে ঝুলে থাকা অংশ তিরতির করে কাঁপে।

পেটের দায়! কথাটায় খুব জোর আছে, জানো! মন্ত্রের মতো। সেই মন্ত্র আউড়ে রাজনীতি করা হল, ক্ষমতায় আসা হল। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখা হল না। পেট নিয়ে রাজনীতি করেছ, এবার দায়টা তো নিতে হবে? এতগুলো মানুষের পেটের দায়ভার নিতে হবে। তার জন্য পরিকল্পনা চাই। একটা অপারেশান বর্গা আর পাট্টাবিলি করে কিছু হয় না। একটা উদ্বাস্তু রাজনীতি কখনোই একটা সরকার চালানোর নীতি হয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু ক্ষমতার নেশাটা পেয়ে বসেছে ততদিনে। সেটাই হল, যা হয়েছে আর সব জায়গায়। সরকার আর পার্টি এক হয়ে গেল। একটা পার্টিসমাজ তৈরি হল গোটা রাজ্য জুড়ে, যার মাথায় বসে আছে কতগুলো লোভী মূর্খের দল।

এই কথাগুলো মেজকা ঠিক আমাকে নয়, বলেন যেন নিজের সঙ্গে। নিজের সত্তার একটি অংশের সঙ্গে। হয়তো দেহের পক্ষাঘাতগ্রস্ত অংশটার সঙ্গে।

অবশ দেহাংশ কোনো জবাব দিতে পারে না, থরথর করে কাঁপে কেবল অব্যক্ত ক্ষোভে।

বুঝি সেই ক্ষোভের ধাক্কায় বিদ্যুৎ ফিরে আসে। ঘরে এসে ঢোকে সেবিকা। সুইচ টিপে আলো জ্বালে, তারপর বুড়ো আঙুল আর তর্জনী ছুঁইয়ে নিভিয়ে দেয় মোমবাতির শিখা। নতুন লোক, আয়া সেন্টার থেকে পাঠিয়েছে। আঁটো সবল চেহারা, স্বচ্ছ বাদামি ত্বক, টান করে বাঁধা চুলের ফাঁকে উজ্জ্বল সিঁদুর।

কোনো জিনিস এনে দিতে হবে কী না জানতে চাই আমি। গতকাল সন্ধ্যা থেকে হোমসার্ভিসের খাবার আসছে না, মেয়েটিই রান্না করছে। আমাকে কিছু বাজার এনে দিতে বলে মেজকার দিকে ফেরে।

আপনার জামাটা এবার পাল্টে দিই কাকাবাবু? সকাল থেকে পরে আছেন তো।

মেজকা বাধ্য বালকের মতো ডান হাতটা মাথার ওপর তুলতে দক্ষ আঙুলে জামার বোতাম খুলতে থাকে।

জলাভূমি বুজিয়ে শহর তৈরি হচ্ছে, আকাশছোঁয়া ফ্ল্যাটবাড়ি, হাজার হাজার মানুষ থাকবে। কিন্তু যারা তাদের গাড়ি চালাবে, রান্না করবে, জামাকাপড় কাচবে, ইস্ত্রি করবে, বাগান করবে, তারা কোথায় থাকবে আমায় বল তো? তাদের কথা কে ভাবে?

কাকার খোলা পিঠে চেপে চেপে পাউডার ডলে দিতে থাকে মেয়েটি। আমি লক্ষ করি ওর বাহুতে হালকা সোনালি রোম।

জানো, ট্রেড ইউনিয়ান করার সময় জুটমিলের ভেতরে যেতাম। তখন এসব চোখে পড়ত না, এখন ভাবি। যেকোনো পুরোনো মিলে যাও, দেখবে কমপাউন্ডের ভেতরেই ধোপা মালি বাবুর্চিদের কোয়ার্টার। বাইরে কুলিলাইন। মজবুত ইটের ঘর, কমিউনিটি ল্যাট্রিন, জলের ব্যবস্থা। সাহেবরা কিন্তু এগুলো ভাবত, আর আমরা...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকেন মেজকা, কাঁধের নগ্ন পেশিতে ফের তিরতির করে কাঁপন শুরু হয়। বেপথুমান মাংসপিণ্ড শার্টের আচ্ছাদনে ঢেকে দেয় সেবিকা মেয়েটি।

*

সরকারি আবাসন থেকে যে রাস্তাটা বাজারের দিকে চলে গিয়েছে, সেখানে একহাঁটু জল। ফিডার রোডের দিক থেকে ক্রমশ উঁচু হয়েছে। শহরের কেন্দ্রস্থলে সন্ধ্যার স্বাভাবিক ছন্দ, দেখে বোঝার উপায় নেই বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত। দোকানপাট আলোয় ঝলমল করছে, রাস্তায় ঢল নেমেছে মানুষের, বাতাসে চাউমিন এগরোলের গন্ধ। স্প্রোসাইনে মোবাইলের বিজ্ঞাপন— আরও একটু কথা হোক!

হোটেলে রাতের খাওয়া সেরে শুনশান জলবন্দি পাড়ায় ফিরতে নিঃসঙ্গতা আরও বেশি করে চেপে ধরে। বাড়ির দরজার হাতলে জড়িয়ে আছে ছোট্ট একটি সাপ, টর্চের আলোয় পুঁতির মতো চোখ চিকচিক করে। ওকে এড়িয়ে আমি অন্য দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকি। গলির মুখে ফাঁকা তালাবন্ধ গোষ্ঠ উকিলের বাড়িতে একদল কুকুর চিৎকার করছে সকাল থেকে। রাস্তার কুকুর, হয়তো কোথাও জানলা খোলা পেয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। এখন রাত্রিবেলায় সেই আওয়াজটা ছড়িয়ে পড়ছে, শূন্য বায়ু প্রকোষ্ঠের মতো বাড়িগুলোয় প্রতিধ্বনি হয়ে আরও বিকট হয়ে উঠছে। একটুখানি চাঁদ উঠেছে অন্ধকার গলির মাথায়। জলে তার আলো এসে পড়েছে। কুকুরের চিৎকার অবিরাম। ওই চাঁদের জন্যই কি? নাকি খিদে? ভাদ্রমাস সবে শেষ হয়েছে। খিদে আর ঋতুশেষের তলানি যৌনতা একসঙ্গে আঁচড় কাটছে প্রাণীগুলোর ক্ষয়াটে এঁটুলি-লাগা পেটে।

দোতলার বারান্দায় এসে সিগারেট ধরাই। গলির ওপারে বাড়িগুলো সব অন্ধকার, নিঃশব্দ। দুএকটা জানলায় মোমবাতির টিমটিমে আলো। নীচে জল সরছে, খুব মৃদু কিন্তু স্পষ্ট আওয়াজ উঠে আসছে। নর্দমায় পাক খাচ্ছে জলের ঘূর্ণি। ভাটা শুরু হয়েছে গঙ্গায়।

মেজকার সেই স্বপ্নটা কল্পনা করার চেষ্টা করি। প্রলয়ঙ্কর বন্যায় গঙ্গার খাত সরে গিয়েছে, সরাসরি পদ্মায় গিয়ে মিশছে। সম্পূর্ণ শুকিয়ে গিয়েছে আমাদের হুগলি নদী। শুকনো বালির খাতে আকন্দ ক্যাকটাসের ঝোপ, বুনো কুলগাছে লটকানো ছেঁড়া ঘুড়ি, মাঝখান দিয়ে সরু ফিতের মতো ময়লা কালো জলে ভাসছে প্লাস্টিক, মরা পশু। চারিদিকে টিন আর প্লাস্টিকের ঝুপড়ি। হাওড়া ব্রিজের ছায়ায় ভাঙাচোরা নৌকোর খোলে বাসা বেঁধেছে মানুষ। টায়ার জ্বলছে, চোলাইয়ের ঠেক। বালি উড়িয়ে ছুটে যাচ্ছে মোটরসাইকেল...

কষ্টকল্পনা! মেজকার দুঃস্বপ্নের আড়াল থেকে ছমছমে ছায়ার মতো আমার মনে এসে পড়ে নতুন এই সেবিকাটি। ওর স্বচ্ছ বাদামি ত্বক, বাহুতে সোনালি রোম, পরিচ্ছন্ন চেহারা। এই বিপর্যয়ের মধ্যেও হাঁটুজল ভেঙে প্রতিদিন আসছে অথর্ব মানুষটির জন্য। কী অদ্ভুতভাবে তর্জনী আর বুড়ো আঙুল টিপে মোমবাতি নিভিয়ে দিল।

রাধা, রোকেয়া। দরজার হাতলে লিকলিকে সাপটার মতো সেই নারী জড়িয়ে থাকে আমার চেতনায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঁটাতার

চেয়ারে-বসা সিমেন্টের মূর্তি, পায়ের ওপর পা তোলা। উত্তরপূর্ব কোণে ঈষৎ ঘাড় বাঁকিয়ে চেয়ে আছেন দূরে, নদীর ওপারে বনশিমতলার দিকে। কিংবা আরও দূর অতীতে, যখন হাসি-কান্না-প্রেম-বিরহের ছন্দে কলকল করত এই নদীতীর। অথবা আরও ঢের আঁধার সময়ে, লক্ষ-কোটি বছর আগে, সুনীল জলধির বুক থেকে এই আশ্চর্য ভূখণ্ডের জেগে ওঠা দেখছেন।

ইতিমধ্যে প্লাবন শেষ হয়েছে। ইছামতী ফিরে এসেছে তার চেনা রূপে— শীর্ণ, হাজা-মজা, ঘন কচুরিপানার ফাঁকে ক্ষীণ একটি জলের রেখা। একটু আগে খেজুর গাছের গুঁড়ি বোঝাই ডিঙি চলে গিয়েছে, তারই চিহ্ন। সেই টানা ক্ষতের মতো জলে ধীরে ধীরে ভেসে চলেছে কয়েকটি হলুদ পাপড়ি। হয়তো দূরে ওই রাধাচূড়া গাছের থেকে ঝরে পড়েছে। বাঁশের তেকাঠি জালের মাথায় মাছরাঙা ওপারের মাঠে মই দিচ্ছে একলা রোগা চাষি, ততোধিক বিশীর্ণ বলদ। হ্যাটাধ্বনি শোনা যাচ্ছে এপার থেকে। ঢিল ঢিল এঁটেল মাটি, তিন বছর আগের সেই বন্যা এখন স্মৃতি।

আমরা এসেছি তাঁর দেশে। সেই বকুলতলা জন্মভিটে, ঠিক যেমন বইয়ে ছিল— নদী থেকে একপোয়া পথ, মাঝে আমবাগান, বাঁশবন। পাশেই জ্ঞাতিবাড়ি পোড়ো হয়ে এসেছে। সামনের দিকে অগোছালো বাগানের মতো খানিকটা জমি। এক বুড়ি বিধবা একা থাকেন, রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রীর কী ধরনের যেন বোন হন, জামাইবাবু বলে উল্লেখ করলেন। বারান্দায় ঠিক কোথায় চেয়ার পেতে বসে লিখতেন, পাছউঠোনে কোন ধাপিটায় বসে গায়ে সরষের তেল মেখে নদীতে নাইতে যেতেন, ঘুরে ঘুরে দেখালেন সব। সেই পুরোনো বকুল গাছটা, যার কথা বইয়ে আছে, এখনও খুব ফুল দেয় শ্রাবণ মাসে। আরেকটা অশোক গাছ ছিল, তাঁর মায়ের হাতে পোঁতা। পাড়ার বউঝিরা অশোকষষ্ঠীর দিন কুঁড়ি নিতে আসত। কী যে হল, গাছটা গত বছর অদ্ভুতভাবে শুকিয়ে মরে গেল, বুড়ি বললেন। বন্যার সময় অনেকদিন জল দাঁড়িয়ে ছিল তো, বোধ হয় শিকড় পচে গিয়েছিল। টানা দশদিন ভিটেয় এক কোমর জল ছিল। ঘরের দেয়ালে জলের দাগ দেখালেন। বইপত্র অল্প কিছু ছিল, নষ্ট হয়ে গিয়েছে। দুদিন ধরে হাতে করে কাদা সরিয়েছি— বললেন। তারপর দেখি ঘরের কোনায় এই এত বড়ো একটা চন্দ্রবোড়া! ঠিক তুমি যেখানটায় দাঁড়িয়ে আছ।

এই পৈতৃক ভিটে থেকেই রোজ পাঁচ মাইল পায়ে হেঁটে মাস্টারি করতে যেতেন, গোপালনগর হরিপদ ইন্সটিটিউশনে। তার পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে ৩৪ নম্বর জাতীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সড়ক। কাঠ চেরাই কল, প্লাইউডের কারখানা, চাষের সরঞ্জামের দোকান, দুচারটে আধুনিক প্যাটার্নের বাড়ি। নদীর মতোই একটি রাস্তার দুপাশে গড়ে ওঠে তার নিজস্ব প্লাবনভূমি, সময়ের পলি ঢেকে দেয় সবকিছু। সত্তর বছর আগের এক মানুষ ও তাঁকে ঘিরে অনুষঙ্গগুলো খুঁজে পাবার উপায় নেই আর। স্কুল কম্পাউন্ডে একটি আবক্ষ মূর্তি রয়েছে, এছাড়া শিক্ষকদের বসার ঘরে দুটি ছবি। আর কিছু নেই। তাঁকে নিয়ে শিক্ষক কর্মচারী কারোরই কোনো ব্যক্তিগত স্মৃতি নেই। মূর্তি ছবি ফলক আছে, মানুষটি নিরুদ্দেশ হয়েছেন।

কিন্তু এই হরিপদ ইন্সটিটিউশনে ছাত্র থাকালীন তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন এমন একজনকে পেয়ে গেলাম স্থিরপাড়ায়, বলা যেতে পারে সম্পূর্ণ অযাচিতভাবেই। স্থিরপাড়া গ্রামটা নদীয়া জেলায়, কৃষ্ণনগর থেকে প্রায় ষাট কিলোমিটার পুবে, বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে। পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে জলঙ্গি।

এই তোমার দেশ, অপু। উলা বীরনগর হয়ে মনসপোতা, এদিকে আড়ংঘাটা রানাঘাট। জলঙ্গি আর চূর্ণী, পূব-পশ্চিমে প্রবাহিণী প্রায় সমান্তরাল বয়ে গিয়ে ভাগীরথী আর পদ্মাকে যুক্ত করেছে। দক্ষিণে বইছে ইছামতী। মাঝে এই পলিসেবিত সুজলাং সুফলাং ভূখণ্ড। প্রাচীন জনপদের সমৃদ্ধি ছিলই, সেইসঙ্গে কৃষ্ণনগরের রাজানুকুল্য যোগ হয়ে শিক্ষা আর শিল্পকলার বিকাশ হয়েছে। একদা বাংলার এই অঞ্চলকে সাহেবরা বলত অক্সফোর্ড অব বেঙ্গল। শান্তিপুর নবদ্বীপে সংস্কৃতচর্চার টোল চতুষ্পাঠী ছিল, উনিশ শতকে ক্রিশ্চান মিশনারিরা গড়ে তুলল পাশ্চাত্য শিক্ষার ইস্কুল। এই নদীয়ার আকাশে দীর্ঘকাল ধরে প্রবাহিত হয়েছে মুক্ত চিন্তা আর সহিষ্ণুতার সুপবন, যে কারণে শ্রীচৈতন্যের ভক্তি আন্দোলন ছাড়াও অসংখ্য ছোটো ছোটো লোকধর্মের উত্থান হয়েছে এখানে।

আর এই সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল কৃষিনির্ভর অর্থনীতির মজবুত ভিতের ওপর, যার উৎস উর্বর পলিস্তর জমে গড়ে ওঠা ভূমি, যা বয়ে এসেছে অসংখ্য নদী নালা খাল বিল দিয়ে। বিশ শতকের শেষ বছরে সেই নদী নালা খাল বিলে প্লাবন এসে ভাসিয়ে দিল গ্রামের পর গ্রাম, নগর, জনপদ।

কিন্তু তিন বছর পরে দেখে বোঝার উপায় নেই এত বড়ো একটা বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে। বর্ষার শেষ, নতুন পাট উঠেছে। ছুটন্ত বাসের জানলা দিয়ে দেখা যায় রাস্তার দুপাশে বাঁশের আড়ায় উজ্জ্বল পাট চুড়ো করে গিঁট বাঁধা, যেন একদল পাড়াগেঁয়ে স্বর্ণকেশীর মাথার খোঁপা।

কৃষ্ণনগর ছাড়াতেই নতুন চকচকে রাস্তা, আগেরটা বন্যায় সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

এর কারণটা অবশ্য বিএসএফ চৌকি, হাজার হোক বর্ডার এলাকা তো! জানাল উৎপল, আমার সফরসঙ্গী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎপল বসাক কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজে ইংরেজি অনার্স পড়েছে। যেবার বন্যা হল, তখন সে ছাত্র। দুটো দিন গাছে চড়ে কাটিয়েছে। তারপরেও কিন্তু কলেজে এসেছে মাসখানেকের মধ্যেই। ওর মতো অনেকেই তাই করেছে। আটাত্তরের সেই বন্যার পর ইস্কুল কলেজ থেকে খসে গিয়েছিল একটা গোটা প্রজন্ম।

এর পেছনে যে স্থিতিস্থাপক অর্থনীতির একটা গল্প আছে, তার চালিকাশক্তি এখন পাটের চাষ। সমৃদ্ধির টুকরো টুকরো ছবি ছুটন্ত বাসের জানলা থেকে দেখা যায়— উজ্জ্বল রঙের পাকা বাড়ি মাথা তুলেছে টিনের চালের মাঝে, উঠোনে শোভা পাচ্ছে ট্রাক্টর। আমাদের বাসটা ঘিঞ্জি ধূলিধূসর না-শহর না-গ্রাম জনপদের ভেতর দিয়ে আর্ত হর্ন দিয়ে পথ করে নিতে নিতে ছোটে। মোটর সাইকেলের শো রুম, গৃহসামগ্রীর দোকানে বহুজাতিক ব্র্যান্ডের প্রতীক, অনলাইন লটারি, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের সাইনবোর্ড। পথে বাজারে গিজগিজ করছে এত মানুষ, এদের মধ্যে অনেকেই নাকি রোজ সীমান্ত প্রহরা গলে আসে, কাজকর্ম সেরে দিনের শেষে ফিরেও যায়।

অর্থকরী ফসল বলতে পারেন এখানে দুটো, উৎপল জানায়। পাট আর স্মাগলিং! আগে বাংলাদেশ ঘুরে ইলেকট্রনিক জিনিস আসত, আমরা বলতাম টানা মাল। এদেশে বাজার খুলে যাবার পর সেটা বন্ধ হয়েছে। তবে এদিক থেকে চিনি সাইকেল গরু থেকে শুরু করে যায় না হেন জিনিস নেই।

অর্থকরী ফসলের কোনোটির সঙ্গেই অবশ্য যুক্ত নয় উৎপল বসাকের পরিবার। বংশপরম্পরায় ওরা তন্তুবায়। উৎপল ওর পরিবারে প্রথম সদস্য যে স্কুলের পাঠ শেষ করে কলেজে গিয়েছে, সদরের সরকারি কলেজে ইংরেজির মতো কুলীন বিষয় নিয়ে অনার্স পড়েছে। ওর দুই দাদা ও বাবা এখনও তাঁতে বসেন। দেশভাগের সময় ওদের পরিবার ওপার বাংলা থেকে বাস উঠিয়ে চলে আসে। না এসে উপায় ছিল না। যে সামন্তশ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁত চলত, তারাই সবার আগে চলে আসে। ওদের মতো তন্তুজীবী বসাকেরা শান্তিপুর ফুলিয়ায় গিয়ে তাঁত বসায়। অতটা ভেতর দিকে যেতে চাননি উৎপলের দাদু। সীমান্তের কাছাকাছি স্থিরপাড়ায় ভদ্রাসন পাতেন। মনে সুপ্ত আশা ছিল, খারাপ সময়টা থিতিয়ে এলে আবার একদিন ফিরে যাবেন। সময় থিতোয়নি, থিতোয় না। দাদুর নশ্বর দেহের সঙ্গে সেই আশারও অন্ত্যেষ্টি হয়েছে অনেককাল আগে।

বাসটা থামলেই একটা চিমসে দুর্গন্ধ নাকে এসে লাগে— পাট পচানোর গন্ধ। কিন্তু চলতে শুরু করলে রাস্তার দুপাশে আশ্বিনের অপরাহ্নের আলোয় ধোয়া বর্ষার সতেজ সবুজ: কোমল রেশমি থেকে গাঢ় গ্রানাইট, সবুজের বিবিধ বর্ণাভা, আলো আর বাতাসের খেলায় পাতার নীচের বিশ্রস্ত ভেলভেট। খালে বিলে টলটল করছে জল, কালচে বেগুনি, তাতে প্রতিফলিত আকাশের গায়ে মাথা তুলেছে রক্তাভ শালুক। তালডোঙায় ভেসে চলা টোকা মাথায় চাষি, দূর থেকে কোনো অচেনা পাখি ভেবে ভ্রম হয়; যেন এখনি উড়ান দেবে দূর আকাশে, যেখানে নীল ফিরোজা সবজে গোলাপি কমলা ধূসর মেঘগুলো ফালাফালা হয়েছে অস্তগামী সূর্যের ফলায়। তার বর্ণাচ্ছটা এসে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়েছে মাঠের মাঝে মাঝে পঞ্চায়েতের বনসৃজনে— আকাশমণি বাবলা কদমের বন। প্রাচীন আমবাগান ছায়ার ঘোমটায় ঢাকা, লাইকেনের ছোপ-ধরা শাখার গোপন সন্ধিতে ঘন অর্কিডগুচ্ছে তেরছা মধুরং আলোর আঙুল। যেন অস্ফুট লজ্জায় শিউরে উঠে ক্রমশ রক্তিম হয়েছে প্রকৃতি, রঙের বিচ্ছুরণে সুতীব্র শিহরন গোঙাচ্ছে আকাশময়। এমন সূর্যাস্ত শেষ কবে দেখেছি মনে করতে পারি না। এই যে তোমার দেশ, অপু!

স্থিরপাড়ায় এসে পৌঁছলাম যখন, চরাচর জুড়ে বিশুদ্ধ চিকন আঁধার নেমেছে, সবকিছু একটা রুপোলি তবকে মুড়ে দিয়েছে যেন। বাসরাস্তার ধারেই কুলিপাড়া, আদিবাসী মেয়েরা বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়, হাতপা ছড়িয়ে বসে জটলা করছে কালভার্টের ধারে। স্নান সেরে পরিপাটি করে চুল বেঁধেছে ওরা, নিজেদের ভাষায় কথা বলছে। সারাদিন মাটিকাটার কাজে গিয়েছিল দূরে কোথাও। এখন একপল বিশ্রাম, আলাপচারি। এরপর আছে রান্নাবাটি, ঘরকন্না। তার মাঝে একটুখানি নিজস্ব মেয়েলি প্রহর।

জানো অপু, একেকটা অযাচিত অনির্বচনীয় মুহূর্তের সৌন্দর্য এমনভাবে নিজেকে খুলে মেলে ধরে যে এই জীবনটার ভঙ্গুরতার কথা মনে থাকে না, মনে থাকে না এইসময় গ্রামদেশে ম্যালেরিয়া, পাট-পচা জলে চর্মরোগের বীজাণু আর আন্ত্রিকের কথা। এক বৃদ্ধার কোলে কষ্টিপাথরে কোঁদা শিশুর স্বচ্ছ কাচের মতো চোখে প্রতিফলিত সন্ধ্যার আকাশ দেখে মনে ভেসে ওঠে অনেক বছর পরে কোনো এক অস্পষ্ট ভবিষ্যতের কথা, যখন এই পৃথিবীতে আমরা কেউ থাকব না, যখন এই শিশুটির স্মৃতিতে এখনকার এই মুহূর্তটা ফিরে আসবে তার সমস্ত বর্ণ গন্ধ নিয়ে। তখন মনে থাকে না, এই শীতের আগেই ম্যালেরিয়া কিংবা আন্ত্রিক কেড়ে নিতে পারে একে— একরত্তি পলকা ভবিষ্যৎ, চিরঅনাগত, যা হারিয়ে যেতে পারে সুকুমার মস্তিষ্কে শিরাছেঁড়া রক্তক্ষরণে।

*

অল্প কিছুদিন পেয়েছিলাম ওঁকে। নীচু ক্লাসে পড়ি তখন, বেশি কিছু মনে নেই।। তখনও জানিনা না কত বড়ো সাহিত্যিক, জানার কথাও নয়। পথের পাঁচালি বইটা পড়তে দিয়েছিল কেউ, কিন্তু তার মাহাত্ম্য বোঝার বয়স হয়নি। মনে হয়েছিল, এ তো আমাদের চিরচেনা দেশগাঁয়ের কথা বলছে, রোজই যা দেখি। এর মধ্যে গল্প কই? তখন খুব টানত বোম্বেটেদের গল্প, শিকারের গল্প... এইসব। আর টানত কবির লড়াই, কথকতা। তখন এসবের খুব চল ছিল আমাদের এই জেলায়। সে যাইহোক, মাস্টারমশাইকে দেখে অন্যরকম কিছু মনে হতো না। আমাদের নীচু ক্লাসে বিশেষ আসতেনও না। দূর থেকে দেখতাম ওঁকে— ভারী চেহারা, একটা শ্লথ ভঙ্গী ছিল। কিন্তু খুব জোরে হাঁটতে পারতেন। রোজ সেই চালকি-বারাকপুর থেকে সোয়া দুমাইল পথ বনবাদাড় ভেঙে হেঁটে আসতেন, খালি পায়ে। প্রায়ই দেখতাম উঠোনের কোনে ইঁদারা থেকে দারোয়ান বালতি করে জল ঢেলে দিচ্ছে, উনি পা ধুচ্ছেন। তালপাতার চটি রাখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকত দারোয়ানের ঘরে, তাই পরে স্কুলবাড়িতে উঠতেন। কেমন যেন আত্মভোলা টাইপের মনে হতো, পাঞ্জাবিতে সবসময় বিড়ির আগুন পড়ে ছ্যাঁদা হয়ে থাকত দুচারটে। একদিনের কথা মনে আছে— কী একটা গদ্য পড়াচ্ছিলেন আমাদের, পড়াতে পড়াতে বুঁদ হয়ে গিয়েছিলেন। তখন বিকেল হয়ে আসছে, শেষ পিরিয়ড, খিদেয় পেট চুঁইচুঁই করছে। আমরা কেউই পড়ায় মন দিতে পারছিলাম না, উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করছিলাম কখন ছুটির ঘণ্টা বেজে উঠবে। অস্থির অমনোযোগীর মতো আচরণ করছিলাম সবাই, ছেলেপুলেরা চিরকালই যেমন করে। এইসময় শিক্ষকেরা গল্পকথায় ভুলিয়ে রেখে পিরিয়ডটা পার করে দেয়। কিন্তু সেদিন মাস্টারমশাইয়ের ওপর কী যেন ভর করেছিল। তন্ময় হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন খুব দীর্ঘ একটা লেখা, সম্ভবত জগদীশচন্দ্র বসুর কোনো প্রবন্ধ।

হঠাৎ দেখি মাস্টারমশাইয়ের চোখে জল। জলের ধারা তাঁর গাল বেয়ে গড়িয়ে নেমে না-কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়িতে এসে আটকে রয়েছে। আমরা সকলে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। কিছুই বুঝতে পারিনি। লেখাটায় বিয়োগান্তক কিছু ছিল না। ওই চোখের জল যে কোনো দুঃখের অনুভূতি থেকে নয় এটা যদিও বুঝতে পেরেছিলাম। সেই প্রথম টের পেলাম একধরনের সৌন্দর্যবোধ থেকেও মানুষের চোখে জল আসে। পাঠ্যবইয়ে ওই গদ্যটির ভেতর তেমন একটু কিছু ছিল, যা আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম না। তখন কতই বা বয়স আমাদের, কিন্তু এই ঘটনার কথা ভুলিনি।

এরপর খুব বেশিদিন পাইনি আমরা ওঁকে। ক্লাস এইটে উঠে আমিও হরিপদ ইন্সটিটিউশন ছাড়লাম। চলে এলাম এই স্থিরপাড়ায়, আমাদের পৈতৃক ভিটেয়। বাবা গোপালনগরে ব্যবসা তুলে দিয়ে চাষবাসে মন দিলেন।

বলছিলেন সুরিথের বাবা সত্যপ্রসাদ ঘোষাল। উনি নিজেও স্কুল শিক্ষক। উৎপলের বন্ধু সুরিথ তেহট্ট মহকুমা আদালতে উকিল। এখানে এদের বাড়িতে আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

খুব টালমাটাল অবস্থা চলেছে তখন, সত্যপ্রসাদবাবু বলছিলেন। দেশ স্বাধীন হবে। শোনা গেল আমাদের এই অঞ্চলটা চলে যাবে পাকিস্তানে। গ্রামের অবস্থাপন্ন লোকেরা গঙ্গা পেরিয়ে বর্ধমান কিংবা হুগলি জেলায় গিয়ে জমি কিনে রাখছে। বাবাও গিয়েছিলেন দেখতে। পনেরোই আগস্ট দেশ স্বাধীন হল, র‍্যাডক্লিফ সাহেবের যে রোয়েদাদ বেরোল তাতে দেখা গেল আমাদের এই অঞ্চলটা চলে গিয়েছে পাকিস্তানে। তারপর তো মিছিল বিক্ষোভ সব হল। হিন্দুদের ঘরে ঘরে অরন্ধন, নিষ্প্রদীপ। কংগ্রেসের নেতারা দেখা করল মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে। আঠের তারিখ ভোররাতে রেডিয়োয় ঘোষণা করে ভুল শোধরানো হল। আমাদের এখানে স্বাধীনতা এসেছিল দুদিন পরে।

উঠোনে বসে গায়ে সরষের তেল মাখতে মাখতে কথা বলছিলেন সত্যপ্রসাদ। ওঁর কথাগুলো ছড়িয়ে যাচ্ছিল মন্থর দুপুরের রোদসেঁকা বাতাসে। রোদে গামলায় চানের জল গরম হচ্ছে, কাপড় মেলার দড়িতে একটা কাক। তার ছায়া দুলছে জলে। গাছপালার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আড়ালে কোথাও একটা কুবো ডেকে চলেছে একটানা। বাগানে বিভিন্ন ফলের গাছ, ঝরাপাতার স্তূপ। তার ওপর দিয়ে একটা ছাইরঙা বেড়াল চলেছে নিঃশব্দে, সম্ভবত শিকারের সন্ধান পেয়েছে। বাগানটা শেষ হলে একটা পায়ে-চলা মেটে রাস্তা, ঘাসজমি। তারপরেই বাঁধানো পুকুর, কাপড় আছড়াচ্ছে রজকিনী। গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে দেখা যায়। ঘাটলায় ভিজে কাপড় আঘাতের দৃশ্য আর ছপাৎ শব্দ ভেসে আসার মধ্যবর্তী বিরতিতে ঠিক দুটি কুব্‌কুব্‌ ডাক ভরে দেয় পাখিটা।

এই ভূখণ্ড ভিন্ন একটি দেশ হয়ে পড়েছিল দিনকয়েকের জন্য। সেই ভিনদেশেও কি আশ্বিনের অলস দুপুরে এমন মাটির রোদ-সেঁকা গন্ধ ওঠে। এমন কাপড় কাচার শব্দ ও দৃশ্যের মাঝে বিরতি ভরে ওঠে কুবোর ডাকে? যশোর জেলা থেকে আঁজলা ভরে তুলে নেওয়া হয়েছিল অপুর দেশ নিশ্চিন্দিপুর, সীমান্তের কোল ঘেঁষে বিভূতিভূষণের চালকি-বারাকপুর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ-সাজাদপুর, মধুসূদনের কপোতাক্ষ-সাগরদাঁড়ি, জীবনানন্দের ধানসিড়ি-বরিশাল, জসীমউদ্দীনের তাম্বুলখানা-ফরিদপুর অথবা মণীন্দ্র গুপ্তের অক্ষয় মালবেরির দেশ রয়ে গিয়েছে কাঁটাতারের ওপারে।

কাকে বলে দেশ? মানচিত্রে দাগানো একটি ভূখণ্ড, নাকি স্মৃতির ঠিকানা? তোমার মনে পড়ে অপু, মামজোয়ানের ইস্কুলে আসা-যাওয়ার পথে দেখা সেই ব্রাহ্মণবাড়ির কুলত্যাগিনী বউ, ময়লা কাপড় পরে জলার ধারে গেঁড়িগুগলি তুলছিল যে? কিংবা আচম্বিত বিয়ের দিন ছাদনাতলার পাশে দাঁড়িয়ে একটি লাল রঙের ডাব কাটছিল কেউ, দায়ের বাঁটটি ছিল বাঁশের? এইসব হারিয়ে যাওয়া স্মৃতির নদীর নাম কোদলা, যার পাড়ে পড়ে থাকে সর্বজয়ার চিতাভস্ম। রাতের অন্ধকারে মানুষ পায়ে হেঁটে পার হয়, পার হয় গরু সাইকেল, হিজলের গলি মেঠো আল হয়ে ওঠে চোরাচালানের পথ, কাঁটাতারে লটকে থাকে চাঁদ, সীমান্ত পেরোতে যাওয়া এক দেশহীন মেয়ের মতো।

জলঙ্গীর তীরবর্তী গ্রাম স্থিরপাড়া, ওপারে মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশী। বর্ধিষ্ণু অঞ্চল, শিক্ষার ঐতিহ্য রয়েছে। পাশাপাশি গ্রাম স্থিরপাড়া রাধানগর পলাশীপাড়া মিলিয়ে অনেকগুলো পুরোনো ইস্কুল আছে এখানে। এছাড়াও বেশ কয়েকটি নতুন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল হয়েছে, এখানে আসার পথে বাসরাস্তার ধারে বড়ো বড়ো ফ্লেক্স হোর্ডিং-এ তার বিজ্ঞাপন দেখলাম। সুরিথদের বড়ো ছড়ানো কোঠাবাড়িটা সব অর্থেই স্থিরপাড়ার কেন্দ্রে। সদর দরজায় নামফলক দেখলে তার কারণও মালুম হয়; বাড়ির দুই প্রজন্মের তিন পুরুষ যথাক্রমে শিক্ষক, ডাক্তার ও উকিল— গ্রামের তিনটি সম্ভ্রান্ত উচ্চক্ষমতাশালী পেশা। সত্যপ্রসাদ ঘোষাল শিক্ষকতা থেকে অবসর নিয়েছেন বছর পাঁচেক আগে। ওঁর বড়ো ছেলে বহরমপুর হাসপাতালে যুক্ত, সেখানেই পরিবার নিয়ে থাকেন, সপ্তাহে-দুসপ্তাহে একবার বাড়ি আসেন। সুরিথের মা মারা গিয়েছেন অনেককাল হল।

সত্যপ্রসাদের ঘরের দেয়ালে প্রয়াত স্ত্রী ও বড়োছেলের পুত্রকন্যার অসংখ্য ছবি টাঙানো আছে। ওঁর চোখের নীচে চামড়ার থলিতে নিঃসঙ্গতা জমে স্ফীত হয়ে আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবরে সবরে নাতিনাতনিদের আসার জন্য কীভাবে তৃষিত চাতকের মতো অপেক্ষা করেন, সেটা ওঁর দুচারটে কথা থেকেই বোঝা যায়। কিছু জমিজমা আছে, দিনের বেলা সেসব দেখাশোনা করেন। এছাড়া ফুলের বাগান করেন, দুটি খবরের কাগজ আদ্যপান্ত খুঁটিয়ে দেখেন ; টিভি দেখার নেশা কোনোকালেই নেই। সন্ধ্যার পর একাকীত্বটা চেপে বসে।

বসার ঘরে তখন ছোটো ছেলের বন্ধুদের আড্ডা জমে ওঠে। উৎপল ছাড়াও রয়েছে দীপ্তিমান আর অর্ণব ; দুজনেই উৎপলের সহপাঠী ছিল। কলেজের পাট চোকানোর পর ওরা যুবকল্যাণ দপ্তরের থেকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে। বাসস্ট্যান্ডের কাছে একটি দোকানঘর ভাড়া নিয়েছে ; সংস্থার নাম বাইনারি সলিউশানস।

কী ধরনের কাজ হয় জানতে চাই আমি।

হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার দুটোই করি। এছাড়া টুকটাক ডেটা প্রসেসিং, প্রিন্ট আউট— এইসব আর কি। আইআরসিটিসির এজেন্সিটা পেয়ে গেলে টিকিট বুকিং-এর কাজটা ধরব। দীপ্তিমান জানায়।

এদিকে ইন্টারনেটের স্পিড কেমন ?

চলে যায়, অর্ণব বলে। তবে আসল ভোগান্তি হল ইলেকট্রিসিটি। দিনের মধ্যে কতবার যে...

অর্ণব বাক্যটা শেষ করার আগেই বিদ্যুৎ চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে হাহাকার আর হাসির হররা ছোটে। অল্পক্ষণের মধ্যেই ভেতর থেকে ইমারজেন্সি ব্যাটারি ল্যাম্প আসে, আর আসে বড়ো গামলায় মুড়িমাখা। ইতিমধ্যে তপা নামের এক ছোকরা ঠোঙাভর্তি গরম আলুর চপ আর ফুলুরি নিয়ে হাজির হয়েছে।

চেহারায় আর গলার স্বরে তপার সঙ্গে মিল রয়েছে পুরোনো দিনের বাংলা ছবির অভিনেতা নবদ্বীপ হালদারের। কোর্টে সুরিথের সহকারী তপা, তবে এই আড্ডায় ওর কাজ মূলত হাস্যরসের যোগান দেওয়া। এসেই ধপাস করে বসে পড়ে মুড়ি চিবোতে চিবোতে বলে—

হ্যাঁরে দীপ্তি, তোদের ভাড়াটেকে দেখলাম আমার পাশে দাঁড়িয়ে দুটো সিঙাড়া কিনল। আবার বিয়ে করছে কবে ?

সিঙাড়া কেনার সঙ্গে বিয়ে করার কি সম্পর্ক ? সুরিথ শুধোয়।

বউ পালানোর পর থেকে আবার বিয়ে করবে বলে টাকা জমাচ্ছে, জানো না ? বাড়িতে রান্নার পাট তুলে দিয়েছে। সন্ধ্যাবেলা দুটো সিঙাড়া কিনে বাড়ি নিয়ে গিয়ে খোলটা চা দিয়ে খায় নিমকির মতো, তরকারিটা রেখে দেয়। রাতে দুটাকার দুটো রুটি কিনে নিয়ে ওই তরকারিটা দিয়ে...

সকলে হাসতে শুরু করে। দীপ্তিমান বিরক্তির ভান করে বলে— যত্তসব আটভাট...

প্রতিবাদ করে ওঠে তপা—

আমি আটভাট বকছি ? তোরা গিয়ে দেখ ! মাঝেমাঝে আবার আশু ময়রার দোকান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে এক টাকার রস কেনে। একটা রুটি ওই রসটা দিয়ে, আরেকটা... সেদিন অবশ্য একটাই সিঙাড়া কেনে!

বলতে বলতে নিজেই কুলকুল করে হাসতে শুরু করে। এবার দীপ্তিমানও যোগ দেয়।

মহকুমা আদালতে কী ধরনের কেস আসে? সুরিথের কাছে জানতে চাই আমি।

ডিভোর্সের কেস খুব আসে, সুরিথ বলে।

গ্রামের দিকে ডিভোর্স বেড়ে গিয়েছে নাকি?

তা হয়তো নয়... এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলে— আগে মেয়েরা কোর্টে যাবার কথা ভাবতেই পারত না। আজকাল পারে। নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বেড়েছে, খোরপোষের দাবী আদায় করার জন্য মরীয়া হয়ে থাকে।

ডিভোর্স থেকে দাম্পত্য ও পারিবারিক সম্পর্ক, সেখান থেকে আলোচনা বয়ে যায় গ্রামসমাজের নানান বিষয়ে। এব্যাপারে ওদের প্রত্যেকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আছে, যা সোচ্চারে বিনিময় করে, তর্ক করে। এইভাবে প্রবাহিত হতে হতে একটি নতুন বিষয়ে এসে আড্ডার খেই গিঁট বেঁধে ওঠে: আত্মহত্যা— বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে।

সদর বলুন মহকুমা বলুন, এখনকার কোনো হাসপাতালে হেলথসেন্টারে একটা দিনও যায় না যেদিন কোনো সুইসাইড কেস আসে না— সুরিথ বলে। এটা আমার নয়, দাদার কথা। যারা আসে তাদের মধ্যে নব্বই ভাগ মেয়ে, বয়স তিরিশের নীচে।

সুইসাইড কেস বেড়ে গিয়েছে কী না বলতে পারব না, তবে সত্যিই আগে কিন্তু এত শোনা যেত না। দীপ্তিমান জানায়।

বেশিরভাগ সময় কারণগুলো হয় খুব তুচ্ছ। হয়তো স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া হল, কিংবা একটা নতুন জামা কেনা নিয়ে অশান্তি, পরীক্ষায় ফল খারাপ হল— ব্যাস! বাড়িতে পেস্টিসাইড থাকেই, টিন খুলে ঢক করে মেরে দিল। অর্ণব যোগ করে।

অনেক সময় সেইসঙ্গে এক খাবলা চিনি খেয়ে নেয়। তাতে করে মৃত্যুটা তাড়াতাড়ি আসে।

কাল ইস্কুলগুলোয় যাবার পর আপনাকে একটা এলাকা দেখাব, যেখানে প্রত্যেক বাড়িতে অন্তত একটা করে সুইসাইড কেস আছে। উৎপল বলে।

মহাশয়পাড়ার কথা বলছিস তো? সুরিথ জিজ্ঞেস করে। মাথা নাড়ে উৎপল। আমার দিকে ফিরে সুরিথ বলে—

এককালে আমাদের এখানে সবথেকে সম্পন্ন লোকেদের বাস ছিল এই মহাশয়পাড়ায়। এখন পড়তি দশা, লোকজনও আগের থেকে কমে গিয়েছে।

যারা আছে তারাও সুবিধের নয়, তপা জানায়। কুচকুরে টাইপের। গেল ইলেকশানে ওখান থেকে বুথ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে ওরা ভোট বয়কট করেছিল।

কিন্তু মহাশয়পাড়াতেই কেন আত্মহত্যার ঘটনা এত বেশি, সেটা ওদের কথা থেকে জানা যায় না। তার কোনো ব্যাখ্যা নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাল যাবেন তো, জায়গাটা দেখবেন নিজের চোখে। দীপ্তিমান বলে।

আসলে এখানে অল্পবিস্তর জমিজমা তো রয়েছে সবারই। সবার ঘরেই কীটনাশক মজুত থাকে। আত্মহত্যা হয়তো সেই কারণে বেশি ঘটে।

কীটনাশককে গাঁয়ের লোকেরা বলে ওষুধ, জানেন তো? অর্ণব বলে। বিষকে বলা হচ্ছে ওষুধ! ভাবুন একবার!

পেস্টিসাইডের শিশির গায়ে অ্যান্টিডোট লেখা থাকে, কিন্তু লোকে পড়তে পারলে তবে তো?

আমার মনে পেস্টিসাইডের কোম্পানিগুলোর ফ্রি অ্যান্টিডোট বিলি করা উচিত— তপা ঘোষণা করে।

আর নয়তো জৈবচাষ বাধ্যতামূলক করা উচিত। কি বল? সুরিখ ওর দিকে ফিরে বলে।

গেল শীতে আমার ছোটোকাকা বিঘেখানেক মাঠান জমিতে যা বাঁধাকপি ফলিয়েছিল না, ইয়া বড়ো বড়ো হাতির মাথার মতো! পুরোটা নিজের সারে! তপা দুহাত প্রসারিত করে ঘোষণা করে।

নিজের সারে! নিজের সারে? ওরা সমস্বরে রে রে করে ওঠে।

আহা, মানে নিজের বাগানের সারে... তপা ভুল শোধরানোর চেষ্টা করে।

তা বললে তো হবেনা! তুমি তো তা বলনি!

সকলে মিলে তপাকে পেড়ে ফেলে।

তা হ্যাঁরে, এক বিঘে জমি তোর আকার একার সারে হলো? তোর কন্ট্রিবিউশন কতটা সেটা একটু বল? উৎপল ফোড়ন কাটে।

সমবেত হাসির ফোয়ারার মাঝে নির্বিকার তপা গামলার তলানি মুড়ি শেষ করে হাতে চপের তেল মাথার চুলে ঘষে ঘষে মুছতে থাকে।

রাতে খাওয়ার পর মহাশয়পাড়া নিয়ে আরও কিছু তথ্য পাওয়া গেল সত্যপ্রসাদ ঘোষালের কাছ থেকে।

জলঙ্গির পাড় ধরে এই অঞ্চলের যত সরেস জোতজমি তার প্রায় সবটাই এককালে ছিল ওই পাড়ার মহাশয়দের। পার্টিশানের পর সেসব বেহাত হতে থাকে। তারপর তো সরকার বাড়তি জমি খাস করে বিলি করে দিল। সাতচল্লিশের পর এককাপড়ে চলে এসেছিল যারা, তাদের অবস্থার ক্রমশ উন্নতি হতে লাগল। এদিকে মহাশয়পাড়ার পড়তি দশা চলতেই লাগল। একে ভাগ্যের ফের বলা হবে নাকি ইতিহাসের ফের, সেটা আমি বলতে পারি না।

আত্মহত্যার ব্যাপারটা যে শুধু মহাশয়পাড়াতেই সীমাবদ্ধ এমন কিন্তু নয়, সুরিখ বলে। সব জায়গাতেই হচ্ছে। আসলে সমাজটা বদলাচ্ছে খুব দ্রুত, মানুষ তাল রাখতে পারছে না। আমরা শহরের কথা বলি, কিন্তু গ্রামেগঞ্জে পরিবর্তনগুলো খুব চোখে পড়ার মতো। আর তাছাড়া জীবনটাও খুব ফঙ্গবেনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই কথাগুলো সত্যপ্রসাদবাবুর মনে ধরে বলে মনে হয় না। ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে হাতদুটো মাথার ওপর আড়াআড়ি রেখে জানলার বাইরে ঝিঁঝিঁ-ডাকা অন্ধকারে চেয়ে থাকেন তিনি। খানিকটা স্বগতোক্তির ঢঙে বলে যেতে থাকেন—

আমাদের এখানকার ইতিহাসটাই কুলক্ষণে। পার্টিশানের কোপটা জমির ওপর আড়াআড়ি পড়ল ভোজালির মতো। এখন এখানে যে পাটের চাষ দেখছ, দেশভাগের আগে সেটা হতো ওপার বাংলায়। এসব জায়গায় তো ছিল শুধু বড়ো বড়ো আমবাগান। পলাশীর প্রান্তরের কথা মনে আছে তো? কাছেই, এই নদীর ওপারে। সাতচল্লিশের পর পাটচাষিরা দলে দলে চলে এল, আমবাগানগুলো কাটা পড়ল। বছর দশেকের মধ্যে এলাকার ছবিটা বদলে গেল। তারপরে তো পাটশিল্প রুগ্ন হয়ে পড়ল, অনেকেই শ্যালো বসিয়ে বোরো ধানের চাষ শুরু করে দিল। আগে দশফুট পাইপ বসালে জল উঠত, আজকাল তিরিশ ফুটেও নাগাল পাওয়া যায় না। আমাদের ছেলেবেলার কথা ছেড়েই দিলাম। তখন তো সবার বাড়িতে কুয়ো ছিল, বর্ষাকালে হাত দিয়েই জল তোলা যেত। অন্যসময় বড়োজোর পাঁচ কি সাত হাত। এখন মাটির চেহারাটাই বদলে গিয়েছে। আগে দোঁয়াশ মাটির রং কী ছিল! ঠিক যেন টকটকে গুড়ের মতো। এখন দ্যাখ, ম্যাটমেটে কাদা কাদা। তেজ নেই একফোঁটা। এইভাবে কতদিন টানতে পারবে কে জানে! সবকিছুর তো একটা সীমা আছে? এদিকে মানুষ আসার বিরাম নেই। ইদানীং নমশূদ্ররা আসছে, তাও বেশ কিছুকাল হয়ে গেল। এসেই যেখানে পারছে বসে পড়ছে— জলা জংলা নয়ানজুলি নদীর চর। তবে ওরা কিন্তু মাটির নাড়িনক্ষত্র জানে, দুকাঠা জমিতে একটা পরিবার দিব্যি চালিয়ে নিতে পারে। এই ধর— প্রথমেই একটা ছোট্ট ডোবা কাটবে, তাতে মাছ ছাড়বে, চারদিকে কটা নারকেলের গাছ লাগিয়ে দেবে, পুকুরকাটা মাটি দিয়ে দুটো ঘর তুলে ফেলবে। তারপর ধর, বাকি জমিটায় লাগাবে সুপুরি। কেমন, হল? এবার ধর, সুপুরিগাছের ঠেকনোয় মাচা বেঁধে লাউকুমড়ো ফলাবে, নীচে ছায়া ছায়া মাটিতে হলুদ আদার চাষ দেবে... ওরা সত্যিই জানে! ওরা আসতে শুরু করার পর এদিকে জিরে মৌরি তিল আরও সব মশলার চাষ শুরু হয়েছে। আগে ছিল না। কিন্তু এত মানুষ! কতদিন সইবে মাটি? আমরা বলি বটে প্রকৃতি সর্বংসহা, কিন্তু তারও তো একটা ধারণক্ষমতা আছে? আর কতদিন? আমি হয়তো থাকব না। কিন্তু এই দেশটার কী হবে? এসবই আজকাল ভাবি মাঝে মাঝে, বুঝলে? সারা জীবন ছাত্রদের প্রশ্ন করা অভ্যাস তো, আজকাল নিজেকেই প্রশ্ন করি। উত্তরটা কে বলে দেবে? মাস্টারমশাই থাকলে জিজ্ঞেস করতাম। কত যে মায়ায় জড়িয়ে লিখে গিয়েছেন এই দেশগাঁয়ের কথা...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খড়ের বাছুর

কী নাম তোমার?

মাম্পি রানী দাস।

এই স্কুলের নাম কী?

ঈশ্বরচন্দ্র অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়।

কোন ক্লাসে পড় তুমি?

ক্লাস থ্রি।

তোমার কোনো ভাইবোন আছে?

হ্যাঁ, ভাই আছে।

সে ইস্কুলে পড়ে?

হ্যাঁ, ক্লাস ওয়ানে পড়ে।

তোমার সঙ্গে ইস্কুলে আসে?

না, ভাই তো অন্য ইস্কুলে পড়ে। স্টেট বাড, ইংলিশ মিডিয়াম।

AMARBOI.COM

এইবার প্রশ্নকর্তা খেই হারিয়ে ফেলেন। উত্তরদাত্রী কিন্তু নিরুদ্বেগ, বড়ো বড়ো চোখ মেলে অপেক্ষা করে পরের প্রশ্নের জন্য। ওর তেলচুপচুপে চুল মাথার দুপাশে বিনুনি করে বাঁধা, পরনে সরকার থেকে বিলি করা নীল-আকাশি ইউনিফর্মটা পুরোনো, খাটো হয়ে হাঁটুর ওপরে উঠে এসেছে। ওর মতো অনেকেরই তাই। ক্লাসে মেয়েই বেশি, তারা মেঝেয় খাতাবই ছড়িয়ে বসে উদগ্রীব চেয়ে আছে প্রশ্নকর্তার দিকে। কচি মুখগুলো উত্তেজনায় চিকচিক করছে।

আজকের দিনটা অন্য দিনের থেকে আলাদা। আজ বাইরে থেকে অচেনা একজন এসেছেন। তিনি মাস্টারমশাই বা দিদিমণি নন। পড়াও ধরছেন না। অদ্ভুত সব প্রশ্ন করছেন আর মাঝেমাঝে একটা খাতায় খসখস করে কীসব টুকে রাখছেন।

এখন অবশ্য খাতাটা খোলাই আছে, ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছেন। তাঁর মনে চলেছে বিচিত্র ভাবনার স্রোত।

নারীশিক্ষার জন্য প্রাণপাত করেছেন যে মানুষটি, যাঁর নামে এই স্কুল, আজ যদি তাঁকে যাদুবলে এখানে এই ক্লাসঘরের ভেতর এনে হাজির করা যায়? মেয়েদের এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখে কেমন লাগবে তাঁর? প্রশ্নকর্তা ভাবছেন।

বিদ্যাসাগরমশাইয়ের কেমন লাগবে সেটা আর জানার উপায় নেই, কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক ভালো লাগছে না প্রধান শিক্ষক নিত্যানন্দ খান মহাশয়ের। তার কারণ, নীচের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিকের ক্লাসে ক্রমান্বয়ে পড়ুয়ার সংখ্যা কমছে, এমনকি উঁচু ক্লাসে স্কুল-ছুটের প্রবণতা সত্ত্বেও। অর্থাৎ সোজা কথায়, ভর্তির হার কমছে।

প্রাইমারিতে ইংরেজিটা তুলে দিল, আর এদিকে ব্যাঙের ছাতার মতো প্রাইভেট ইংলিশ মিডিয়াম ইস্কুল গজিয়ে উঠতে দিল। তার ফলটা দেখুন। নিত্যানন্দবাবু বাঁ হাতের চেটো ঘুরিয়ে বললেন।

কিন্তু প্রাথমিকে ইংরেজি তো ফিরেছে?

হ্যাঁ, কুড়ি বছর পরে। তদ্দিনে যা হবার তা হয়ে গিয়েছে।

প্রাথমিকে ইংরেজি তুলে দেবার সরকারি নীতির জন্যই যে শহরে গ্রামেগঞ্জে একটা সমান্তরাল শিক্ষাব্যবস্থা গজিয়ে উঠেছে, এব্যাপারে শিক্ষকেরা প্রায় সকলেই একমত। ব্যতিক্রমী সুর শোনা গেল এক তরুণ শিক্ষকের মুখে।

আমাদের এখানে বেশিরভাগ ছেলেমেয়ে চাষির ঘরের। ওদের অনেকে বাড়িতে যে বাংলা বলে সেটা ক্লাসে আমরা যে মান্যচলিত ভাষায় কথা বলি, যে ভাষায় বই লেখা হয়, তার থেকে কিছুটা আলাদা। নীচু ক্লাসে ইংরেজি শেখানো মানে কিন্তু একটা নয়, প্রায় দুটো ভাষার বোঝা কাঁচা মাথায় চাপিয়ে দেওয়া।

এই কথার কোনো সমর্থন জোটে না। পাশ থেকে এক শিক্ষিকা অনুযোগ করেন—

শুধু তো ইংরেজি নয়, পাশ-ফেল প্রথাটিও তো তুলে দেওয়া হল। প্রাইভেট স্কুলগুলোয় দুটোই আছে। বাবামায়েরা কেন ছেলেমেয়েদের এখানে পাঠাবে বলতে পারেন?

কিন্তু প্রাইভেট স্কুলে তো মিড-ডে মিল নেই। তাই না?

না, তা অবশ্য নেই। নিত্যানন্দবাবু স্বীকার করেন।

আমাদের স্কুলে অনেক ছেলেমেয়ে কিন্তু মিড-ডে মিল খায় না, শিক্ষিকাটি বলেন। যেদিন ডিম হয় সেদিন সংখ্যাটা হয়তো একটু বাড়ে, কিন্তু অনেকেই বাড়ি থেকে টিফিন আনে।

হ্যাঁ, সেটা অবশ্য ক্লাসঘরেই দেখা গিয়েছে— ইস্কুলব্যাগের থেকে উঁকি দিচ্ছে টিফিনবাক্স। অর্থাৎ ক্লাসের ভেতরেও আবার একটা বিভাজন।

মিড-ডে মিল খাওয়া আর টিফিনবাক্স আনা— এই দুই দলে লিঙ্গভিত্তিক অনুপাতটা কেমন? প্রশ্নটা মনে উঁকি দেয়, কিন্তু উত্তরটা এঁরা চটজলদি দিতে পারবেন বলে মনে হয় না। তাছাড়া সেটা জানার চেষ্টা করা একটু বাড়াবাড়িই হবে হয়তো।

দিনকাল পাল্টেছে, জানেন। আগে বাড়িতে একটা উৎসব হলে অতিথিরা খেয়ে চলে যাবার পর গ্রামের লোক রবাহূত হয়ে চলে আসত। আজকাল বাড়ি বাড়ি গিয়ে নেমন্তন্ন না করে এলে কেউ আর আসে না।

নিত্যানন্দবাবু বললেন। আশির দশকের মাঝামাঝি এই স্কুলে যোগ দেবার পর উনি এখানেই বাড়ি করে বসবাস করছেন। তখন ভূমি সংস্কার চলছে পুরোদমে। তারপর থেকে অনেক কিছুই বদলে গিয়েছে। কৃষ্ণনগর থেকে বাসে আসার সময় সেই বদলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু কিছু ঝলক চোখে পড়েছে— রাস্তার পাশে হিরো হন্ডা স্যামসাং আর সফেদ ডিটারজেন্টের অতিকায় হোর্ডিং-এর সঙ্গে টক্কর দিচ্ছে লিটল বাড নার্সারি স্কুল, হোলি চাইল্ড কিন্ডারগার্টেন, সেন্ট জ্যাকসন অ্যাকাডেমি...

জ্যাকসন নামেও যে একজন সন্ত আছেন, কেই বা জানত!

ক্রিশ্চান মিশনারিরা এই অঞ্চলে এসেছিল উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। ১৮৪০ সালে কৃষ্ণনগরে প্রটেস্টান্টদের গির্জা তৈরি হয়, ১৮৫০-এ চার্চ অব ইংল্যান্ড মিশনারি সোসাইটি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে চাপড়ায়। তবে একুশ শতকে এ এক নব্যমিশনারির দল— শিক্ষার বাজারীকরণ এদের বাইবেল, নতুন প্রজন্মের সন্তান ঘিরে বাবামায়ের 'বৈপ্লবিক উচ্চাশা'* এদের প্রচারভূমি। হেয়ার সাহেবের পাল্কির পেছনে যে দৌড় শুরু হয়েছিল, তা আজও থামেনি।

ইতিমধ্যে এক গ্রাম্য পুরোহিতের ছেলে একদিন ভিটে ছেড়ে কলকাতাগামী ট্রেনে চেপে বসেছিল এই বৈপ্লবিক উচ্চাশার টানে। তার হাতে ছিল বাক্সবিছানা আর একটি গ্লোব। ভিড়ে ঠাসা রেলের কামরায় এক লক্ষ্মীট্যারা হকার বিচিত্র ফাটা গলায় বিক্রি করছিল আশ্চর্য মলম— এই যে দাদারা, আপনারা কেউ জীবনে হোঁচট খেয়েছেন, হোঁচট? যদি খেয়ে থাকেন তাহলে এই আশ্চর্য মলম... ইত্যাদি।

কয়লার ইঞ্জিনে টানা সেই ট্রেন, সেই কাঠের কামরা আজ নেই। কিন্তু জানো অপু, সেই হকার আজও আছে। তার গলার স্বর আরও কর্কশ হয়েছে, ট্যারা চোখের ওপর ভুরুতে পাক ধরেছে। আশ্চর্য মলম শুধু বিষহরি থেকে জামশেদপুরের আমলকী, বাদামভাজা থেকে ইঁদুরমারা বিষ— হরেক পসরা তার। দিনকাল বদলেছে। কিন্তু বিচিত্র কণ্ঠস্বর আর বাচনভঙ্গি শুনলেই চেনা যায়। যদিও পসরা বদলে যেতে থাকে ঋতুচক্রের সঙ্গে: গ্রীষ্মে প্লাস্টিকের পাউচে আমপোড়া সরবত থেকে শীতে কমলালেবু, বর্ষায় চ্যবনপ্রাশের পুরিয়া থেকে বর্ষশুরুতে বেণীমাধব শীলের হাফপঞ্জিকা— ক্রেতার চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে চলে। কিন্তু লোকাল ট্রেনে এই চলমান শপিং মলে একটি জিনিসের চাহিদা কখনো বদলায় না।

বলতে পার অপু, সেটি কী?

সেটি নিছক একটি পণ্য নয়। সেটি একটি বৈপ্লবিক উচ্চাশা। সেটি হল ইংরেজি ভাষা।

ট্রেনের কামরায় সিটের সারির মাঝে ডান হাতে একগোছা চটি বই পাখার মতো মেলে ধরে বাঁ হাতটি মুখের সামনে চোঙার মতো রেখে আউড়ে চলে আমাদের সেই অক্লান্ত হকার—

আচ্ছা বেশ, আপনারা সবাই মাছের ইংরেজি জানেন— ফিশ। কিন্তু জানেন কি,

---

* প্রতীচী ট্রাস্টের একটি সমীক্ষায় সন্তানের শিক্ষা প্রসঙ্গে বাবা-মায়ের আগ্রহ দেখে অমর্ত্য সেন লিখেছেন— 'We were struck by the reflective and mature nature of these radical aspirations.' The Pratichi Education Report No. 1, 2002, New Delhi, TLM Books

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাছের পাখনার ইংরেজি কি? মাছের আঁশের ইংরেজি কি? মাছের কাঁটার ইংরেজি কি? ইলিশ মাছের ইংরেজি কি? মাগুরমাছ ভেটকিমাছ গলদা চিংড়ি বাগদা চিংড়ির ইংরেজি কি? আচ্ছা বেশ, চোখের ইংরেজি আমরা সবাই জানি— আই। কিন্তু জানি কি চোখের পাতার ইংরেজি কি? ভুরুর ইংরেজি কি? চোখের মণির ইংরেজি কি?... এরকম দুহাজার দুশোটি জিনিসের ইংরেজি নাম ও তাদের ব্যবহার জানতে গেলে পড়তে হবে ম্যাজিক ইংলিশ। দোকানে কিনতে গেলে বইটার দাম পড়বে তিরিশ টাকা। কিন্তু রেলগাড়িতে প্রচারের স্বার্থে দাম রাখা হয়েছে দশ টাকা। দশ টাকা! দশ টাকা! বইটা হাতে নিয়ে দেখতে পারেন। দেখাশোনা ফ্রি, কেনাকাটা ব্যক্তিগত ব্যাপার...

লিটল বাড ইংলিশ অ্যাকাডেমি, মাম্পির ভাই যেখানে পড়ে, ঘোষিত ইংরেজি মাধ্যম স্কুল। তবে পঠনপাঠন মূলত বাংলাতেই হয়। ছাত্রের সংখ্যা যথারীতি ছাত্রীর দ্বিগুণ। শিক্ষিকারা সকলেই আশেপাশের গ্রামের তরুণী, উচ্চমাধ্যমিক পাস ও কলেজ-ছুট, বেতন মাসে পাঁচশো থেকে সাতশো টাকার মধ্যে। একটি ছোটো উঠোন-ঘেরা দোতলা ভাড়াবাড়িতে ইস্কুল বসে। ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক টয়লেট রয়েছে, এছাড়া রয়েছে একটি দোলনা ও খেলার ঢেঁকি। ঘরে দর্মার পার্টিশন দেওয়া ছোটো খুপরি ক্লাসঘরে সিলিংফ্যান ও বসার বেঞ্চি রয়েছে। পড়ুয়ারা সকলেই ইউনিফর্ম ও নেকটাইপরা, কেউ কেউ খাঁচাগাড়িতে চেপে ইস্কুলে আসে। ইস্কুলের উঁচু লোহার গেটের বাইরে শিরীষগাছের ছায়ায় মায়েদের একটি দল বসে থাকে। ছুটির পর সন্তানকে আগলে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য। তাঁদের পরিপাটি পোশাক, হাতে ছাতা, ভ্যানিটি ব্যাগ। স্বামীরা হয় চাকুরে কিংবা ব্যবসায়ী। ছুটির পর সন্তানের হাত ধরে বাড়ি ফেরার পথে নিয়ম করে টিফিনবাক্স খুলে দেখেন খেয়েছে কী না, ক্লাসের পড়া ও হোমটাস্কের খুঁটিনাটি জেনে নেন। সকলেরই প্রাইভেট টিউটর আছে, তাদের অনেকে এই স্কুলেরই শিক্ষিকা।

*

দিনের শেষে কৃষ্ণনগর ফেরার বাস ধরতে একটি পুরোনো পাড়ার ভেতর দিয়ে আমায় নিয়ে চলে উৎপল। যেতে যেতে গলা নামিয়ে বলে—

আপনাকে মহাশয়পাড়ার কথা বলেছিলাম না? এই যে।

বেশিরভাগই সাবেকি দোতলা দালানকোঠা, রঙের পোঁচ পড়েনি বহুকাল। বাগানে ঝোপঝাড়, শুকনো পাতার স্তূপ। একটা ঝিমধরা নিস্তব্ধতা জড়িয়ে আছে পুরু মাকড়শার জালের মতো। সন্ধ্যার আগে গলিতে লোকজন দেখা যায় না। হাঁটতে হাঁটতে স্বেচ্ছায় আত্মঘাতের অদৃশ্য চিহ্ন খুঁজে ফেরে চোখ। বাড়ি বাড়ি উনুনে আঁচ পড়েছে, এছাড়া শুকনো পাতা জড়ো করে পোড়াচ্ছে কেউ। নীল ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে, কুয়াশার মতো ঢেকে দিচ্ছে চারপাশ। ধোঁয়ার সঙ্গে পাট-পচা গন্ধ মিশে বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। কোথাও সদর দরজার নীচের দিকটা ক্ষয়ে খসে গিয়েছে; ভেতরে দেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায় ধানের গোলা, ইটবাঁধানো উঠোনে চাষের সরঞ্জাম রাখা। ছায়াচ্ছন্ন ছাউনির ভেতর একলালা ঘোমটা ঢাকা দুই নারী ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে চলেছে একঘেয়ে শব্দে। একরাশ মাটিমাখা মুলো সাইকেলে চাপিয়ে ঠেলতে ঠেলতে চলে গেল এক খালি-গা মুনিষ। কলার ঝাড় থেকে সবুজ তেলের মতো অন্ধকার চুঁইয়ে বেরোচ্ছে। অদূরে বাঁধানো দিঘি, রাশি রাশি পাট পচছে কাদার তালে চাপা। তার মাঝে এক টুকরো কালো জলে তিনটি বাদামি হাঁস, ভাঙা ঘাটলায় দাঁড়িয়ে একটি সেমিজ-পরা মেয়ে চইচই করে ডেকে নিচ্ছে ওদের। খড়ো চালার নীচে অস্থিচর্মসার গরুকে দুধ দোয়ার জন্য তৈরি করছে আদিবাসী গোয়ালিনী ; বাঁটে তেল মাখাচ্ছে, মুখের কাছে ঠেলে দিচ্ছে খড়ের বাছুর, ওপরে মৃত বাছুরের চামড়া চাপানো। ঝুলবারান্দায় কড়িবরগার ফাঁকে ডানা ঝাপটে ফিরে আসছে পায়রারা। দ্রুত লয়ে শাঁখ বেজে ওঠে তিনবার।

সমসেরনগরে সন্ধ্যা নামার ঠিক আগে এইরকম নীলাভ আলোয় বাঁধের ধারে একসার কুঁড়েঘর দেখিয়ে দুলাল আমায় বলেছিল— এই যে দেখছেন, এখানে এমন একটাও ঘর নেই যেখান থেকে কখনো কাউকে বাঘে নেয়নি।

বাঘ দেখিনি, কিন্তু তাকে ঘিরে মিথ আর লোককথার জালে মূর্ত হয়েছিল তার অদৃশ্য আকার, গায়ের গন্ধ পেয়েছিলাম যেন, কিন্তু মহাশয়পাড়ায় হানাদার মৃত্যুর স্বরূপ দেখা গেল না। কোন সে গভীর বিশ্বস্ততা অথবা নির্জ্ঞান, যার থেকে একগাছি দড়ি কিংবা কীটনাশকের বোতল খুঁজে নেয় হাত, তার আন্দাজ পেলাম না। মাথার ভেতরে কিছু ভাঙাচোরা দৃশ্যের স্তূপ জমল কেবল। আ হিপ অব ব্রোকন্ ইমেজেস...

হে অপু, হে মানবপুত্র
তুমি কিছু বলতে পার না, আন্দাজ করতেও পার না, তুমি কেবল জানো
ভাঙাচোরা দৃশ্যের স্তূপ, যার ওপরে রোদ ঝলকায়—

ফিরতি বাসে একলা যাত্রায় আমার মনে ছেয়ে রইল মাম্পি রানী দাসের মুখ ; ডাগর দুটো চোখ, তেলচুপচুপে চুল দুটি বেণি পাকিয়ে মাথার দুপাশে ঘোরানো— যেন ফুলের সাজি। দুর্গা ইস্কুলে যায়নি, মাম্পি যায়। ওর ভাইও যায় খাঁচাগাড়ি চড়ে, পরনে জামাজুতো, গলায় নেকটাই। কাঁধের ব্যাগে থাকে টিফিনবাক্স, জলের বোতল। মাম্পির ইস্কুলে মিড-ডে মিল আছে, আর টিউবওয়েল। এছাড়া মাম্পির ইস্কুলে সরকার থেকে মাঝেমাঝে মেয়েদের জন্য ইউনিফর্ম দেয়— আকাশী আর নীল রঙের ফ্রক, তার বুকের কাছে একটি নকল নেকটাই সেলাই করা আছে।

বড়ো হয়ে কী হতে চাও মাম্পি ? জিজ্ঞেস করেছিলাম।

লাজুক হেসে মাম্পি বলেছিল, সে বড়ো হয়ে মিস হতে চায়।

সুকান্ত ভট্টাচার্যের একটি মোরগের কাহিনি কবিতাটি ওদের পাঠ্যক্রমে আছে। একটি মোরগ আশ্রয় পেয়ে গিয়েছিল বিরাট প্রাসাদের ছোট্ট এক কোণে, ভাঙা প্যাকিং বাক্সের গাদায়। আশ্রয় মিলল, কিন্তু খাবার মিলল না। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত গলা ফাটিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চীৎকার করে প্রতিবাদ জানাত সেই মোরগ। তারপর শুরু হল তার আঁস্তাকুড়ে আনাগোনা। সেখানে মিলতে লাগল চমৎকার খাবার। তারপর একদিন সেখানেও ভাগ বসাতে এল ছেঁড়া ন্যাকড়াপরা দুতিনটে মানুষ। মোরগের খাবার গেল বন্ধ হয়ে। খাবার! খাবার! খানিকটা খাবার! ভুখা মোরগ বার বার চেষ্টা করে প্রাসাদে ঢুকতে, তাড়া খায় খুব। ছোট্ট মোরগ ঘাড় উঁচু করে স্বপ্ন দেখে, প্রাসাদের ভেতর রাশি রাশি খাবার। তারপর, কী আশ্চর্য, সত্যিই সে একদিন প্রাসাদে ঢুকতে পেল। একেবারে সোজা চলে এল ধবধবে সাদা কাপড়ে ঢাকা খাবার টেবিলে। খাবার খেতে নয়, খাবার হিসেবে।

দুটো-তিনটে পাস যদি দিতে পারে মাম্পি, যদি এরপর হাইস্কুল, তারপর হায়ার সেকেন্ডারি, তারপর একটা কলেজ পর্যন্ত যেতে পারে যদি, তাহলে হয়তো তার স্বপ্নপূরণ হতেও পারে। ভাইয়ের ইস্কুলে সত্যিই একদিন ঢুকতে পারে সে, শিক্ষিকা হিসেবে। সেই কাজের চাপ আছে— অতগুলো বাচ্চা সামলানো, ঘরে ফিরে হোমটাস্কের পাহাড়, গার্জেনদের কৈফিয়ত আর স্কুলমালিকের দাপট সয়ে মাস গেলে যা বেতন, তার থেকে পাঁচবাড়ি গতর খাটিয়ে ঠিকে কাজের লোকের রোজগার হয়তো বেশি। কিন্তু তবু তো লোকে বলবে মিস, মাম্পি মিস। নামের পাশে এই উপাধিটার একটা সার্থকতা আছে। প্রতিদিন কয়েকশো কচিকাঁচায় পরিবৃত হয়ে থাকার মধ্যে, তাদের চোখের মণি হয়ে ওঠার মধ্যে এক পরম প্রাপ্তিও আছে।

কিন্তু অনেকটা পথ যেতে হবে তাকে, আক্ষরিক অর্থেই। বাসস্ট্যান্ড থেকে কখনো সেই পথ বেঁকে যায় গ্রামের ধারে একথকে অন্ধকারে— নয়ানজুলি, জুয়ো-চোলাইয়ের ঠেক, দর্মার পার্টি অফিস। তবু আশা করা যায় সে নির্বিঘ্নেই বাড়ি ফিরবে রোজ, নিরাপদে তার স্বপ্নের গন্তব্যে পৌঁছবে একদিন। একটি পাকা রাস্তা, সন্ধ্যার পর রাস্তায় যথেষ্ট আলো, একটি সাইকেল, একটি মোবাইল ফোন তাকে সেই স্বপ্নের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। তার জন্য অবশ্যই ইস্কুলের গণ্ডিটা পেরোতে হবে প্রথমে, আরও একটা-দুটো পাশ দিতে হবে। সেটা পারলে আর কিছু না হোক, কীটনাশকের গায়ে লেখা প্রতিষেধকের নামটা পড়তে পারবে সে, আশা করা যায়, অন্তত কীটনাশককে কোনোদিন ওষুধ ভেবে ভুল করবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা-বলা আয়না

রোকেয়া, ওরফে রাধা, খালপাড়ের বস্তিতে থাকত। ওর অতীত জীবনের গল্প তমসাময়, মেজকার কাছে পরে জানতে পারি আমি। রোকেয়ার বয়স যখন বছর পনেরো, ওকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে বস্তিরই কয়েকজন যুবক। পরে সালিশিসভা করে ওদের মধ্যে একজনকে বিয়ে করতে বাধ্য করা হয়। বিয়ের পর একটি সন্তান হয় রোকেয়ার। স্বামী কিছুদিন ছিল, তারপর বেপাত্তা হয়ে যায়। শোনা যায় সে বাংলাদেশে চলে গিয়েছে, আবার বিয়েও করেছে। ইতিমধ্যে আয়ার কাজ করে সন্তানের ভরণপোষণ শুরু করে রোকেয়া। সেবিকা হিসেবে খুবই দক্ষ আর দায়িত্বশীলা ছিল সে। ওর আগে মেজকার দেখাশোনা করত একজন মাঝবয়সি পুরুষ। দেখেছি কি নির্লিপ্তভাবে মেজকার অথর্ব শরীরটা নাড়াচড়া করত লোকটা। একটি অশক্ত সাহায্যপ্রার্থী মনুষ্যদেহ তুলে ধরছে, গা মোছাচ্ছে, পোশাক পরিয়ে দিচ্ছে আরেকটি মনুষ্যদেহ। একটি অশক্ত কাঁধ তুলে ধরছে একটি হাত। হাত আছে, মন নেই। একটি কাজ, যা সেবা হয়ে ওঠে না ; সংযোগ নেই কোনোরকম। একজন মানুষকে নিরুচ্চার প্রত্যাখ্যান করছে একজন মানুষ। তখন দেখেছি কেমন বিরক্ত হয়ে উঠতেন মেজকা, ওঁর মুখে ফুটে উঠত এক গভীর অসহায়তার অভিব্যক্তি।

তাহলে ধর্ষণের অনুভূতি কেমন হয়? যখন একটি শরীরে থাকা মানুষকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে দেহটিকে খাবলানো হয়, তার অন্তঃপুরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় পুরুষাঙ্গ কিংবা লোহার রড?

মনে পড়ে, কীভাবে মেজকার পিঠে বৃত্তাকারে পাউডার ঘষে ঘষে রক্তসঞ্চালন ঘটাত রোকেয়া, যাতে বেডসোর না হয়, কীভাবে ঘর্মাক্ত মুখে ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুছে দিত বিপন্নতার অভিব্যক্তিগুলো। অনির্বচনীয় সব দৃশ্যের জন্ম হতো তখন। বন্যা চলাকালীন প্রতিদিন যে মেজকার কাছে যেতাম, সেটা কতটা কর্তব্যের টানে, আর কতটাই বা সেবার এই রহস্যময় আচার চাক্ষুষ করার বিচিত্র নেশায়, সেটা পরে ভাবার চেষ্টা করেছি।

সেপ্টেম্বর মাস থেকে শীতের শুরু পর্যন্ত একটানা নিয়মিত এসেছিল রোকেয়া। ইতিমধ্যে মেজকার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু হয়, পিজি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ওঁর পুরোনো কমরেডরাই সব ব্যবস্থা করে দেয়।

রোকেয়াকে ভুলে গিয়েছিলাম। মনে পড়ল আমার জীবনের এক অবিস্মরণীয় মুহূর্তে, আমার মায়ের মৃত্যুর পরমুহূর্তে। সেইসময় যে সেবিকা হাজির ছিল, যে প্রথম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টের পেয়েছিল প্রাণবায়ু বেরিয়ে গিয়েছে, মায়ের নিশ্চল খোলা চোখের পাতা তর্জনী আর বুড়ো আঙুল ছুঁইয়ে বন্ধ করে দিয়েছিল সে। অবিকল এইভাবে রোকেয়া মোমবাতি নিভিয়ে দিত মেজকার ঘরে, লোডশেডিং অন্তে বিদ্যুৎ আসার পর।

*

মৃত্যুর আগে অপুর গলায় ডাক শুনতে পেয়েছিলেন সর্বজয়া, সদর দরজা খুলে বাঁশবনে চাপবাঁধা অন্ধকারে দেখেছিলেন জোনাকির নাচ। একাদশীর জ্যোৎস্নায় একা নির্জন ভিটেয় শুয়ে অনুভব করেছিলেন পায়ের নীচ থেকে উঠে আসছে মৃত্যুর বরফঠান্ডা স্পর্শ। আমার মা মারা যান জানুয়ারির এক উজ্জ্বল সকালে। সেইসময় তাঁর পাশে ছিলাম আমি, তাঁর একান্ত অপু।

দুরারোগ্য অসুখে ভুগছিলেন মা, জীবনের আশা ছিল না। শেষ কটা দিন আমরা তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলাম বাড়িতে। সেটাই ছিল তাঁর ইচ্ছা। একটি আয়া সেন্টারের মারফৎ দুবেলা দুজন সেবিকা রাখা হয়। তাদেরই একজন ছিল ভারতী।

ভারতী সাধারণত দিনের শিফটে আসত। ওর বাড়ি ছিল নদীয়ার মাজদিয়ায়, সেখান থেকে লোকাল ট্রেনে চড়ে আসত। বছর পঁচিশের বিবাহিতা হাসিখুশি মেয়েটি ছিল অত্যন্ত কর্মপটু আর সেবাপরায়ণা। ওর কাজের আওতায় পড়ে না এমন কিছু কিছু, যেমন মায়ের কাপড় কেচে দেওয়া কিংবা কোনো পছন্দের পদ রেঁধে দেওয়া, আগ বাড়িয়ে এসে করে দিত। এগুলো ওর পেশাগত শিক্ষার অঙ্গ ছিল কী না জানিনা, কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যেই মায়ের ক্ষীণজীবী হৃদয়ে জায়গা করে নিল ভারতী। এক অদ্ভুত সখ্য গড়ে উঠল দুজনের মধ্যে। রোজ সকালে ওর আসার সময় হলে উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করতেন মা, বার বার ঘড়ির দিকে চাইতেন। ভারতী যখন পিঠে বালিশ ঠেস দিয়ে বসিয়ে মাথার অবশিষ্ট কয়েকগুছি চুল চিরুনি দিয়ে যত্নভরে আঁচড়ে দিত, মায়ের যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখে এক স্নিগ্ধ আলো ফুটে উঠত। ছোটো মেয়ের সঙ্গে বড়োরা যে সুরে কথা বলে, এসময়ে মায়ের সঙ্গে ঠিক সেভাবেই কথা বলত ভারতী, যদিও মাসিমা বলে ডাকত।

মৃত্যুর আগে ছোট্ট মেয়ের মতোই হয়ে উঠেছিলেন মা। পথ্য খেতে চাইতেন না, নানারকম খাবারের আবদার করতেন। ডাক্তারের নির্দেশ মেনে যতদূর সম্ভব সেসব মেটানোর চেষ্টা করা হতো। তবে খাবার জিনিসের থেকেও একটা ইচ্ছের কথা প্রায়ই বলতেন এইসময়: সিগারেটের তামাক, পেট্রোল, নতুন ট্যান-করা চামড়া আর জুতোর কালির গন্ধ শুঁকতে চাইতেন। এমন অদ্ভুত ইচ্ছের কথা আগে কখনো শুনিনি। আমার মা জন্মেছিলেন মজফ্‌ফরপুরে, ছেলেবেলা কেটেছে উত্তরভারতের বিভিন্ন শহরে। হয়তো তখনই কিছু শখশৌখিনতার সংস্পর্শে এসে থাকবেন। আমাদের মফস্‌সলের গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে বিয়ে হবার অনেক বছর পরেও মায়ের সেই অতীতটা পুরোপুরি মরে যায়নি। ভালো চা, চকোলেট, সিনেমা আর রাগসঙ্গীত ভালোবাসতেন। কিন্তু এইসব বিচিত্র গন্ধের প্রতি আকর্ষণের কথা আগে কোনোদিন বলেননি আমাদের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইসব আবদার মেটাত ভারতী। ওর মুখ থেকে স্টেশনের বাইরে দোকানে সিগারেট কেনার গল্প শুনে মায়ের দুর্লভ হাসির শব্দ শোনা গিয়েছিল একদিন।

এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে সর্বজয়া এক আশ্চর্য স্মৃতির টান অনুভব করেছিলেন নিশ্চিন্দিপুরের সেই বন্ধকী আমবাগানের প্রতি। মায়ের এইসব বিচিত্র গন্ধের প্রতি টান ছিল তাঁর একান্ত স্মৃতির আমবাগান— ছায়াকুয়াশায় ঘেরা, দুর্ভেদ্য, দুর্জ্ঞেয়।

এইসময় আত্মীয়স্বজনেরা মাকে দেখতে আসছিল। এভাবে অনেকের সঙ্গেই দেখা হচ্ছিল বহুকাল পরে। এই দুর্লভ পারিবারিক মুহূর্তগুলো ধরে রাখার জন্য নীহারদার হ্যান্ডিক্যামটা ধার নিয়েছিলাম আমি। কিংবা কে জানে, হয়তো মায়ের অপ্রিয়মাণ মুখচ্ছবি জমিয়ে রাখার একটা বাসনা কাজ করেছিল অবচেতনে।

ছোট্ট মুঠিপরিমাণ একটি যন্ত্র, যা প্রবহমান সময়কে তার যাবতীয় দৃশ্য শব্দ সমেত ধরতে পারে, আর সঙ্গে সঙ্গে সেসব ছোট্ট পর্দায় অবিকল ফুটিয়ে তুলতে পারে— দেখে ভারতীর বিস্ময়ের সীমা ছিল না। তবে সম্ভবত মুভি ক্যামেরার যে দিকটা ওকে হতবাক করেছিল, তা হল স্মরণীয় আর অকিঞ্চিৎকরের মধ্যে, মহিমাময় আর তুচ্ছের মধ্যে তফাৎ করতে না পারার ক্ষমতা; অথবা অক্ষমতা। যে গভীর অনুপুঙ্খতায় একটি আত্মসচেতন মুখের অভিব্যক্তি কিংবা একটি পরিশীলিত কণ্ঠস্বর ফুটে উঠছিল, সেভাবেই পাপোশের নকশা কিংবা চেয়ার টানার কর্কশ শব্দও আমাদের পোষা বেড়াল গঙ্গার ঠাট ঠমক ক্যামেরায় নিখুঁত ধরা পড়তে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল ভারতী, এবং একদিন বিস্ময় আর সংকোচ মেশানো গলায় আমায় জিজ্ঞেস করল—

আমি যেমন যেমন বলব করব, ঠিক তেমন তেমন ছবিতে উঠবে?

ওর এই কথার সূত্র ধরেই তৈরি হল একটি ছবি। রোকেয়ার জীবনের কাহিনি ওর নিজের মুখ থেকে শোনা হয়ে ওঠেনি, ভারতীর ক্ষেত্রে সেই সুযোগটা ছাড়িনি। ক্যামেরাটা একটা টেবিলে ওর মুখোমুখি বসিয়ে এলসিডি স্ক্রিনটা ওর দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলাম, যাতে যন্ত্রে যে ছবি ধরা পড়ছে সেটা যেন ও দেখতে পায়। আমার মনে হয় এই ব্যাপারটাই ওকে ক্রমশ এগিয়ে দিচ্ছিল ওর জীবনকথার ভেতর। মনে হচ্ছিল যেন আয়নার সামনে বসে নিজের সঙ্গে কথা বলছে ভারতী, এমন এক আয়না যার নিজস্ব স্মৃতি রয়েছে।

*

আমরা যখন ইন্ডিয়ায় আসি আমার বয়স তখন পাঁচ। ওদেশে আমার নাম ছিল আলপনা। ইন্ডিয়ায় রেশন কার্ড পাবার সময় বাবা নাম দিল ভারতী। ভারতে এলাম তো, তাই ভারতী (অল্প হেসে)। আমার কাকারা আগেই চলে এসেছিল। কাকার ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া বিয়ে সব এখানেই। এক ছেলে হায়দরাবাদে কাজ করে, চারমিনার সিগারেটের কারখানায়। এখানে এসে আমরা প্রথম উঠি নেতাজিনগরে। নেতাজিনগর জানেন তো? গেদে লাইনে। ওখানে সব পর পর হল্ট স্টেশন— নেতাজিনগর, তারকনগর, বঙ্কিমনগর। আগে স্টেশন ছিল না, ওপার থেকে লোকেরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসার পর হয়েছে। আগে কিছুই ছিল না, শুধু বড়ো বড়ো আমবাগান। আগে ট্রেনও থামত না। লোকেরা চেন টেনে দিয়ে নেমে পড়ত। তো রেল কী করবে? লোকে টিকিট কেটে ট্রেন চড়লে তো রেলেরই লাভ। নেতাজিনগরে আমি বন্যা দেখেছি তিনবার। একটা বড়ো আর দুটো ছোটো। শেষবারেরটায় আমরা রেললাইনের ধারে ছিলাম টানা দু-মাস। পার্টি থেকে জিআর (*গভর্নমেন্ট রিলিফ*) দিয়েছিল। বাংলাদেশে আমরা যেখানে থাকতাম সেখানেও খুব বন্যা হতো, তবে সেসব আমার মনে নেই। পদ্মার ভাঙনে আমাদের জমিজমা চলে যায়, বাবা ভ্যান চালাত। একদিন মিয়ারা ভ্যান পুড়িয়ে দিলে, বললে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেবে। তারপরেই তো ভিটে বেচে দিয়ে এপারে চলে আসা হল। (*থামে, আঁচলে মুখ মোছে*)

আমি নেতাজিনগর সুকান্ত স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্লাস ফোর অব্দি পড়েছি। তারপর তো আমরা উঠে গেলাম নতুনপল্লীতে। চূর্ণীর চরে বাঙালদের একেবারে নতুন গ্রাম, ইস্কুল ছিল না। ইস্কুল কেন, কিছুই ছিল না। চারিদিকে শুধু বালি আর শরের বন। শর দিয়ে ঘর ছাওয়া হতো। চৈত্র-বৈশাখ মাসে আগুন লাগার ভয় ছিল। আর শেয়াল ছিল খুব। একবার একটা ছোটো বাচ্চাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল শেয়ালে। আমাদের গ্রামে কয়েকঘর তাঁতি আর সবাই চাষি। আগে জমির পাট্টা ছিল না, এখন হয়েছে। এখন তো রাস্তা লাইট সবই হয়েছে, অনেকের পাকা বাড়িও হয়েছে। বছরে তিনটে চাষ হয়। তবে এখন চাষে আর লাভ নেই। আমাদের গ্রামে ছেলেরা সবাই বাইরে চলে গিয়েছে সেন্টারিং-এর (*শাটারিং, কংক্রিট ঢালাইয়ের জন্য তক্তার কাঠামো*) কাজে। আমার ভাইরাও গিয়েছে তামিলনাড়ু। তবে যেখানেই যাক, বছরে একবার অন্তত ভিটেয় ফিরবেই, বারুণী মেলার সময়।

বারুণী মেলার নাম শোনেননি? (*অবাক হয়ে ক্যামেরার পাশ দিয়ে তাকায়*) মতুয়া মেলার নাম শুনেছেন? আমরা হলাম মতুয়া, নমশূদ্র। আসলে কিন্তু আমরা ব্রাহ্মণ। সেসব অনেক আগের গল্প, তাছাড়া আমি ভালো জানিও না। তার চেয়ে বরং মেলার কথা বলি। প্রতি বছর দশই চৈত্র সব মতুয়ারা যে যেখানেই থাকুক ঠাকুরনগরে হরিচাঁদ ঠাকুরের আশ্রমে যাবেই। আমাদের সবথেকে বড়ো উৎসব। শুধু বাংলা না, বিহার আসাম থেকেও লোকে কামনাসাগরের জলে ডুব দিতে আসে। নতুনপল্লী থেকে আমরা দল বেঁধে ট্রাকে করে আসি। আমার ভাইরা সব ট্রাকের মাথায় বড়ো বড়ো ড্রাম আর ঝাঁঝর নিয়ে বসে। যে যেখানেই থাকুক এইসময় সবাই নিজের ভিটেয় আসবেই আসবে।

নিজের ভিটেই তো! (*কোমরে হাত রাখে*) বাবার ভিটে ছিল মিয়াদের দেশে, আমরা দেখিনি। নেতাজিনগরে অনেকবছর ছিলাম ঠিকই, কিন্তু ওটা ছিল কলোনি। চাষবাস ঘরকন্না যেখানে, সেখানেই তো ভিটে। নতুনপল্লীতে প্রথম যখন গিয়ে উঠি, তখন আর এখন? দেখলে চেনাই যাবে না। সবকিছু একটু একটু করে হয়েছে, চোখের সামনে, নিজেদের চেষ্টায় হয়েছে। লোকনাথ বাবার মন্দির হয়েছে, হাইস্কুলও হয়েছে একটা। ইশ, আমাদের সময়ে হলে!

ইংরিজি পড়তে পারি না যে। (*সলজ্জ হেসে ঠোঁট কামড়ায়*) আমাদের সময়ে ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সেন্টারে কাজ নেওয়ার আগে চাকদায় একটা নার্সিংহোমে ছিলাম কিছুদিন। ইংরিজি ওষুধের নাম আর ডাক্তারদের লেখা পড়তে পারলে ওখানে চাকরিটা পাকা হয়ে যেত। দুমাসের ট্রেনিং নিয়ে কতজন নার্সের কাজ করছে। এই সেন্টারেও ইংরিজি পড়তে জানা আয়াদের রেট বেশি।

এখন আর হয় না। (*দীর্ঘশ্বাস চাপে*) কী করে হবে? ভোর চারটেয় উঠে চান করা, কাপড় কাচা, নিজের টিফিন তৈরি করা। ট্রেনে করে সেন্টারে আসতে দু ঘণ্টা লাগে। তারপর হয়তো বলল, যাও অমুক জায়গায়। বাসভাড়াটা শুধু দেয়। বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত আটটা-নটা। দেরিও হয়, যদি রিলিভার লেট করে। বাড়ি ফিরে আবার চান করা, যদি হাগা-মোতার পেশেন্ট থাকে তো তখনই কাপড়চোপড় কাচা। নাইট শিফট চললে আবার সবকিছু উলটে যায়। তবু কলকাতার দিকে রেটটা বেশি, তাই এতদূর থেকে আসা। এভাবে কতদিন পারব কে জানে? যতদিন শরীর দেবে।

আমি এখন নতুনপল্লীতেই থাকি। বাপের ভিটেয়। (*একটু থেমে, আঁচলের খুঁট আঙুলে পাকাতে থাকে*) বিয়ে একটা হয়েছিল। ঘর করি না। স্বামীর অন্য মেয়েছেলে আছে... এগুলো? (*হাতের শাঁখা-নোয়া দেখিয়ে*) ফেলব কেন? বিয়েটা তো ভেঙে যায়নি। এখন মাঝেমধ্যে টাকা চাইতে আসে। (*চোখ সরু করে তাকায়, ঠোঁটের কোণে মিটমিট করে হাসির রেখা*) তাছাড়া এসব থাকার কিছু সুবিধে আছে। এই কাজের ঝক্কি অনেক। কতরকম বদ লোক থাকে।

নিজের সংসার? ভাবি না। ভাইপো দুটো বড়ো হচ্ছে। ছোটোটার খুব বুদ্ধি। ওকে ইংলিশ মিডিয়াম ইস্কুলে পড়াব, তা টাকা লাগে। মায়ের কিডনিতে পাথর হল, আট হাজার টাকা খরচ করেছি। সামনের বছর একটা পাকা ঘর তোলার ইচ্ছে আছে। তাহলে বন্যার সময় আর ইস্কুলবাড়িতে গিয়ে উঠতে হবে না। তা বাদে নিজের আর কি? এইসব কাজে নেমে শখআহ্লাদ চলে না। বেশি সাজগোজ করে গেলে সেন্টারের বড়দিমণি ছুটি করে দেবে। যা মুখ না! (*হাসি*)

*

মায়ের অন্তিম সময়ে পাশে ছিল ভারতী। পরে মনে হয়েছিল হয়তো আসন্ন মৃত্যুর গন্ধ পেয়েছিল সে। ডাক্তার নাড়ি হারানোর কিছুক্ষণ আগে ওর কথামতো নীল কাঁপা কাঁপা ঠোঁটের ফাঁকে একচামচ গঙ্গাজল দিয়েছিলাম। মা ক্রমশই ডুবে যাচ্ছিলেন গভীর অচৈতন্যে, আর বুড়বুড়ি কাটার মতো কণ্ঠনালী বেয়ে একটা শব্দ উঠে আসছিল। একসময় সেটা থেমে গেল। কাঁধ দুটো ঝাঁকিয়ে মা! মা! করে ডাকতে লাগলাম আমি। প্রতিবারই ভুরু দুটো তিরতির করে কেঁপে উঠে সাড়া দিচ্ছিল। ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছিল কম্পন। আমার কব্জিতে হাত রেখে ভারতী ফিসফিস করে বলল—

আর পিছু ডাকেন না দাদা, শান্তিতে যেতে দ্যান। দেখছেন না, মাসিমা হোঁচট খাচ্ছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর ডাকিনি। মায়ের চোখদুটো চক্রাকারে ঘুরে মাথার কাছে উজ্জ্বল সূর্যালোকিত জানলার দিকে চেয়ে স্থির হয়ে গেল। আর তখনই তর্জনী আর বুড়ো আঙুল ছুঁইয়ে চোখের পাতা বন্ধ করে দিল ভারতী, এক নিবিড় দক্ষতায়, ঠিক যেভাবে সেই প্লাবনের সন্ধ্যায় মেজকার ঘরে মোমবাতি নিভিয়েছিল রোকেয়া।

এই বইতে যত মানুষের কথা লিখছি, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমি গিয়েছি। তাদের নিজস্ব জগতে গিয়ে তাদের কথা শুনেছি। ভারতী ব্যতিক্রম, ওই এসেছিল আমাদের বাড়িতে। ওর কথাগুলো অবিকৃত ধরেছে যন্ত্র, আমি শুধু অনুলিখন করলাম। কিন্তু তাই কি হয়? শব্দের ফাঁকে ফাঁকে নৈঃশব্দ্যগুলোর কি অনুলিখন হয়? আর শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা দীর্ঘশ্বাসগুলো? সে চেষ্টা করিনি। ওর উচ্চারণে যে মিশ্র উপভাষার টান ছিল, সেটাও কয়েকটি স্বরবর্ণ দিয়ে ধরার চেষ্টা করিনি। করলে তা অহেতুক বিকৃতি হতো।

এতকাল পরে আজ সাত মিনিট একুশ সেকেন্ডের ছবিটা আবার দেখতে গিয়ে একটা কথা মনে হচ্ছে আমার। নিত্যদিন রকমারি রোগীর সেবা করতে কত জায়গায় কত ধরনের পরিবারে গিয়েছে ভারতী, কত বিবিধ বিচিত্র অভিজ্ঞতা জমেছিল তার। কিন্তু সেই প্রসঙ্গে একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি সে। হয়তো ওর এই কাজে সেটা বলা বারণ। কিংবা হয়তো এই রোগযন্ত্রণা, ক্লেদ আর মৃত্যুর গন্ধের এ এক ভিন্ন পৃথিবী, যেখানে প্রতিদিন যেতে হয় তাকে। কিংবা বলা যায় এই পৃথিবীটা প্রতিদিন ওর কাছে আসে, যেভাবে ঘুমের ভেতরে স্বপ্ন আসে, তারপর কোনোরকম চিহ্ন না রেখে চলে যায়। ভারতী ফিরে আসে, জেগে ওঠে তার নিজের পৃথিবীতে, চূর্ণী নদীর বুকে ওদের চর-গ্রামে, যেখানে ওর বাবা-মা ভাই ভাইবউ ভাইপোরা আছে। ঘুম আর জাগরণের মতো এই দুই সমান্তরাল পৃথিবী সম্পূর্ণ পৃথক করে রাখার মধ্যে দিয়েই হয়তো বেঁচে থাকার, রোগযন্ত্রণা-ক্লেদ-মৃত্যুর গন্ধের হিমালয়প্রমাণ ভার সয়ে বেঁচে যাবার কৌশল আয়ত্ত করেছে সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচের চোখ

সেদিনের পর আর দেখা হয়নি ভারতীর সঙ্গে, মায়ের পারলৌকিক কাজেও আসেনি। ভিডিয়ো রেকর্ডিঙটা ছিল। তার বেশ কিছুকাল পরে অজয়ের ধারে একটি গ্রামে গিয়ে আমার মনে পড়ল ওর মুখে শোনা ওদের সেই নতুনপল্লীর কথা।

কেন্দুলিতে জয়দেবের মেলায় গিয়েছিলাম শান্তিনিকেতনের এক বন্ধুর সঙ্গে। সারারাত আখড়ায় গান শোনার পর বিশ্রামের ব্যবস্থা হয়েছিল নদীর ওপারে চরে একটি ছোট্ট গ্রামে, বন্ধুর চেনা এক চাষির বাড়িতে। ওপারে বর্ধমান জেলা, এপারে বীরভূম।

রাত জাগার ক্লান্তি, সেইসঙ্গে শুকনো নেশার তলানি ঘোর মিশিয়ে এক বিচিত্র আচ্ছন্নতার ভেতর কীভাবে যে খটখটে নদী পায়ে হেঁটে পার হয়েছিলাম, সেটা আর স্পষ্ট মনে নেই। তখন চাঁদ অস্ত যাচ্ছে, কনকনে হাওয়ায় মাঝে মাঝে ভেসে আসছে গুপিযন্ত্রের গুবগুব শব্দ। মাথার মধ্যে একটি কাংস্য কণ্ঠ বেজেই চলেছে—

বেদ বিধির পর শাস্ত্র কানা
আরেক কানা মন আমার
এসব দেখি কানার হাটবাজার...

বিস্তীর্ণ ঢেউখেলানো বালিয়াড়ির মাঝে টুকরো টুকরো রুপোর পাতের মতো পড়ে আছে জল। দূরে একসারি খড়ের ঘর জ্যোৎস্নায় ভিজে চুপচুপে হয়ে আছে। আর কিছু মনে নেই।

ঘুম ভাঙল বেশ বেলা করে। শরে বোনা দেয়াল চুঁইয়ে দিনের আলো এসে ঢুকছে ঘরে। বিভিন্ন দিক থেকে ধুপধুপ করে ঢেঁকির শব্দ আসছে। ঘরে ঘরে চাল কোটা হচ্ছে, পৌষ সংক্রান্তির পিঠে তৈরি হবে।

গৃহকর্তা বছর পঞ্চাশের গৌরাঙ্গদার সঙ্গে জয়দেবের মেলায় এসেই পরিচয় হয় আমার বন্ধুর। তারপর থেকে মেলায় এলে এখানেই এসে ওঠে। এর আগেও অনেককে নিয়ে এসেছে। স্ত্রী ছেলে ভাই ভাইয়ের বউ এবং গরু হাঁস মুরগি নিয়ে ভরন্ত সংসার গৌরাঙ্গদার। ভাইয়ের বউ সন্তানসম্ভবা, বাপের বাড়িতে রয়েছে। ওর ছেলে দিনকয়েক হল গিয়ে রয়েছে সেখানে। পরিবারের সবাই অত্যন্ত মিশুকে আর অতিথিবৎসল। সেদিন আমাদের ফিরে যাবার কথা বোলপুর, কিন্তু কিছুতেই ছাড়ল না।

আজকের দিনে এসে পিঠে না খেয়ে চলে যাব বললেই হল? সেটি হবে না। গৌরাঙ্গদার বউ বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাছাড়া বন্ধুকে শুধু জয়দেব ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেলে কি হয়? গৌরাঙ্গদা বলল। এপারেও তো কত কিছু দেখার জিনিস আছে— দেউল গড়জঙ্গল শ্যামারূপার মন্দির... দূর দূর থেকে লোকে বেড়াতে আসে।

কিছুদূরে কয়েকশো ফুট উঁচু একটানা পাহাড়ের মতো শিরা, জঙ্গলাকীর্ণ। পুরাণে নাকি কথিত আছে, সত্যযুগে রাজা সুরথ কোল-ভীলদের হাতে পরাস্ত হয়ে এই গভীর জঙ্গলে এসে প্রথম দেবী দুর্গার পুজো করেছিলেন। কাছেই অজয়ের পাড়ে মাথা তুলেছে ইছাই ঘোষের দেউল, টেরাকোটার তৈরি একটি মিনার। ইছাই ঘোষ আঠেরো শতকে এই অঞ্চলে ভূস্বামী ছিলেন।

তাঁর নামেই গ্রামের নাম হয়েছে ইছাইপুর। তবে গ্রামটা অর্বাচীন, অজয়ের বুকে জেগে ওঠা চরে গড়ে উঠেছে, ভূমিরাজস্ব দপ্তরের ভাষায় যাকে বলে পয়স্থি জমিতে। এই গ্রামের সকলেই উনিশশো আশির দশকের মাঝামাঝি বাংলাদেশ থেকে এসেছে। জঙ্গলাকীর্ণ বালির চর হাসিল করে বাস, এবং চাষ। গৌরাঙ্গদা সব ঘুরিয়ে দেখাল আমাদের। আলু লঙ্কা ছাড়াও শীতের কিছু সবজি হয়েছে। আনকোরা পলি মাটি, চাষ খুব ভালো হয়। মাটিতে বালির ভাগ বেশি থাকায় জল দাঁড়ায় না।

গ্রামে কোথাও পুকুর দেখলে? গৌরাঙ্গদা বলে, তোরা খুঁড়লে বর্ষার জমা জল ভাদ্দর মাসেই মাটির ভেতরে সেঁধিয়ে যায়।

মাঝে মাঝে অজয়ের কুল ছাপিয়ে বন্যা হয় বটে, কিন্তু সেটা প্রকৃতির আশীর্বাদ। দু-চারদিন জল থাকে, তারপরে নেমে যায়। জমিতে রেখে যায় উর্বর পলি। এইসময় লোকে উঠে যায় ওপরদিকে ডাঙাজমিতে। ঘরগুলো সব শরের বোনা প্যানেল দিয়ে তৈরি, অনায়াসে খুঁটি থেকে খুলে নেওয়া যায়। বর্ষার পর চরে নতুন ঘাস হয়, কার্তিক মাসে সবাই ঘর ছায়। উজ্জ্বল হলুদ পাকা শরের দেয়াল আর খড়ের চাল, গ্রামটা যেন ঝকঝক করছে নতুন। সবকিছুর মধ্যেই এই নবীন আনকোরা ছাপ। এমনকি গাছগুলোও তরুণ; আম পিয়ারা পেঁপে, পনেরো-বিশ বছরে তারা আর কতই বা বেড়েছে। এবং আশ্চর্য যেটা, খুব বয়স্ক কোনো মানুষ গ্রামে চোখে পড়ল না।

সেটা গৌরাঙ্গদাকে বলতে হাসে। ওর বাবা এখনও জীবিত, ওদেশে আছেন। এক ভাইয়ের কাছে থাকেন। এরা মাঝে মাঝে ওপারে যায়। অসুবিধে তো নেই, পাশপোর্ট আছে। রেশনকার্ড জমির পাট্টা সবই আছে, গ্রামে সকলের কাছেই আছে।

এখানে সবাই লাল পার্টি, গৌরাঙ্গদা জানায় আমাদের।

ইছাইপুরে ঢোকার মুখে রাস্তার পাশে চায়ের দোকান। বাখারির মাচায় বসে শীতের রোদ পিঠে মেখে লাল চায়ে চুমুক দিই আমরা। দর্মার দেয়ালে সাঁটা লাল পোস্টার— ব্রিগ্রেড চলো। মুঠিবদ্ধ হাত আর পতাকার পেছনে নারীপুরুষের সারিবদ্ধ মিছিলের রেখাচিত্র, লাল সূর্য উঠছে। অদূরে বাঁশে লটকানো বোর্ডে সাঁটা গণশক্তি। চায়ের দোকানেও রয়েছে। কিন্তু অন্য কোনো কাগজ পাওয়া গেল না। জানা গেল, এখানে অন্য কোনো কাগজ ঢুকতে দেওয়া হয় না। ইছাইপুরে একটি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার হয়েছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইস্কুলটা দূরে। মন্দির নেই। তার বদলে আছে পার্টি অফিস— পাকা একতলা বাড়ি, বাইরে ফ্ল্যাগপোস্ট, ভেতরে বিগ্রহদের ছবি— মার্কস লেনিন সুকান্ত হরেকৃষ্ণ কোঙার রবীন্দ্রনাথ। অদৃশ্য মাকড়শার জালের মতো সুতো ছড়িয়ে আছে চারদিকে। ভোররাতে দুজন বহিরাগত যে গ্রামে এসে ঢুকেছে, সেটা খবর হয়ে গিয়েছে। সকালে আমরা ঘুম থেকে ওঠার আগেই লোকাল কমিটির লোক এসে খোঁজ নিয়ে গিয়েছে। গৌরাঙ্গদার ভাই সুবল যুব ফেডারেশান করে। ওর ঘরটাই আমাদের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল।

সুবলের ঘরে আসবাব বলতে একটি কাঠের আলনা, সস্তা ড্রেসিং টেবিল আর বাঁশ বেঁধে মাচার ওপর বিছানা। আলনায় ওর স্ত্রীর ডুরে শাড়ি পাক দেওয়া রয়েছে। এছাড়া খুঁটিতে ঝোলানো একটি যুগলে ফোটোগ্রাফ আর পাশের ঘরের লাগোয়া শনের দেয়ালে এক নগ্ন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ শিশুর পোস্টার— ঘরে শ্রীবৃদ্ধি ছাড়াও সম্ভবত আব্রু রক্ষা করছে। চালের নীচে চাঁদোয়ার মতো কারুকার্যময় কাপড় টাঙানো। এছাড়াও কাঁথা বালিশঢাকা ও আয়নার ঢাকায় অসম্ভব সুন্দর সূচের কাজ। জানা গেল, এসবই গৌরাঙ্গদার স্ত্রীর হাতের কাজ।

আমাদের প্রশংসা শুনে বউদি সলজ্জ হাসে আর গৌরাঙ্গদা অনুযোগ করে।

এই করে চোখের মাথা খেয়েছে। পার্টি থেকে ক্যাম্প করেছিল, চশমা দিয়েছে। ছুঁচের কাজ একদম বারণ। কিন্তু সেকথা কানে তুলছে কে?

কী করব, হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারিনা যে— বউদি বলে। আর এখন তো কাঁথা বুনতেই হবে, ঘরে নতুন মানুষ আসছে না?

সুবলের দিকে ফিরে ঠোঁট টিপে হাসে বউদি। সুবল একটু লজ্জা পেয়ে মুখ নীচু করে। কথা বলে না বিশেষ।

এই হাত গুটিয়ে বসে থাকতে না পারাটা অবশ্য স্বচক্ষে দেখলাম আমরা। সারাদিন অক্লান্ত চরকির মতো কাজ করে চলেছে— ভোরবেলা সারা উঠোন গোবরমাটি দিয়ে নিকোনো থেকে শুরু করে সকাল থেকে রাশি রাশি পিঠে তৈরি, গরুর জাব দেওয়া থেকে ঘরকন্না। বিকেলবেলা দেওরের সঙ্গে মাঠে গিয়েছিল খেতের আলু তুলতে। রাতের বেলা সেই আলু রেঁধে খাওয়াল আমাদের। মটরশাক আর মেথি দিয়ে মার্বেলের আকারে নতুন আলুর তরকারি, অতীব সুস্বাদু, সঙ্গে অড়হর ডাল আর পায়েসপুলি। চাল ডাল গম মেথি থেকে শুরু করে দুধ খেজুরের গুড়— সবই নিজেদের খেতের জিনিস, ঘরের জিনিস।

খোলা উঠোনে পিঁড়ি পেতে অর্ধচন্দ্রাকারে বসে আমরা চার পুরুষ, সামনেই কাঠের উনুনে গরম রুটি সেঁকে একটি একটি করে পাতে দিচ্ছে বউদি। গল্পগাছা চলে তারই ফাঁকে।

আপনার বন্ধুকে কতবার বলি, জয়দেবের মেলায় তো অনেক হল। এবার একবার আমাদের মেলায় আসা হোক।

আমাদের মেলা মানে বৈশাখ মাসে ঠাকুরনগরে মতুয়া মেলা। এখান থেকে কীভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দল বেঁধে ট্রাক ভাড়া করে যাওয়া হয়, কতদিন থাকা হয়, গোটা গ্রামের মানুষ একটি বৃহৎ পরিবারের মতো একসঙ্গে রান্নাবান্না খাওয়াদাওয়া হয়, জ্ঞাতিগুষ্ঠির সঙ্গে দেখা হয়, বিয়ের সম্বন্ধ হয়— তার গল্প চলে। সেখান থেকে চলে আসে ব্রিগেডে পার্টির মিটিঙে যাবার গল্প। কিছুদিন আগেই তেমন একটি গণসমাবেশ হয়ে গেল, যার পোস্টার চায়ের দোকানে দেখলাম।

সে যা যজ্ঞি হয়, মেলায় যাবার বাড়া। বউদি হেসে বলে।

কীরকম ? আমি জানতে চাই।

মাঝরাত থেকে উঠে পালা করে দিস্তে দিস্তে রুটি তরকারি ডিমসেদ্ধ তৈরি করতে হয়। অতগুলো লোক যাবে, সারাদিন খাবে। ট্রাকগুলো ছাড়ে সেই ভোরবেলা।

এবার গৌরাঙ্গদা আর সুবল গিয়েছিল, বউদি যায়নি। তবে এর আগে গিয়েছে অনেকবার, চিড়িয়াখানা জাদুঘর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সবই দেখেছে। এবার যাত্রায় বিভ্রাট হয়েছিল। দ্বিতীয় হুগলি সেতুর টোলপ্লাজায় পৌঁছতেই দুপুর গড়িয়ে যায়, শহরে ট্রাক ঢুকতে পারেনি। সুবল জানাল।

এই মানুষগুলোকে কলকাতার রাজপথে মিটিং-এর দিন দেখেছি, থেমে থাকা বাস ট্রাম ট্যাক্সির জানলা দিয়ে গভীর বিরক্তিভরে দেখেছি— পতাকা বেঁধে অন্তহীন মিছিলে পা মিলিয়ে চলেছে গ্রাম থেকে আসা সারি সারি মানুষ। পরদিন খবরের কাগজে ছবিতে দেখেছি কালো মাথার সমুদ্র। তাদের কাউকে কখনো নিজস্ব জগতে এত অন্তরঙ্গভাবে দেখব বলে ভাবিনি। মাথার ওপর পূর্ণিমার চাঁদ থেকে গলানো রুপো ঝরছে। সেই আলো আর কাঠের আগুনের কাঁপা কাঁপা আভায় দীপ্যমান চাদর মুড়ি-দেওয়া মানুষজন আর তাদের নিজেদের হাতে বোনা ঘরগেরস্থালি। টনটনে মাটির উঠোনে চিকচিক করে অভ্রের গুঁড়ো, তার ওপর লম্বা লম্বা ছায়াগুলো নড়ে।

এখানে সন্ধ্যা নামে ঝুপ করে, অজয়ের শুকনো খাতে সূর্যটা ডুবে যাবার পরে-পরেই। বেলেমাটি রোদের তাপ ধরে রাখতে পারে না, ঠান্ডা জাঁকিয়ে বসে চারদিক থেকে। আমরা যেখানে রয়েছি, এখানেই অজয়ের মূল খাতটা ছিল বছর পঞ্চাশেক আগেও। সেই নদীর প্রেত যেন হামাগুড়ি দিয়ে উঠে আসে রাত্রিবেলা। মনে হয় একটা রুপোলি হিমেল স্রোতের ভেতর বসে আছি। আমরা উনুনের কোল ঘেঁষে বসি আরেকটু ওম পাবার আশায়। গরম ফুলকার ভাপ, কাঠের ধোঁয়ার গন্ধ, বেলেমাটির সোঁদা গন্ধ, মেথি ফোড়নের স্বাদ— এক অপার্থিব ইন্দ্রিয়জাগর অনুভূতি। আজ থেকে মাত্র তিরিশ বছর আগেও এই জায়গাটি ছিল ঘন ঝোপজঙ্গল, গোসাপ আর শিয়ালের আস্তানা। কেউ মাড়াত না। কোথা থেকে একদল মানুষ এসে গড়ে তুলল এক জনপদ। চরের মাটিতে খাদ্য ফলাল। সেই খাদ্যের চিরন্তন আস্বাদ দেহের কোষে কোষে ছড়িয়ে যাচ্ছে সুরের মতো। উঠোন ঘিরে শনের ঘরগুলো, ভেতরে কেরোসিনের বাতি জ্বলছে, ফানুসের মতো দেখায়— নির্ভার আর রহস্যময়। আগুনে কাঠ জ্বলার শব্দ, শরের বনে হুহু উত্তুরে হাওয়ার শব্দ, ঝিঁঝিপোকার ডাক। কিছুদিনের মধ্যেই এর সঙ্গে যোগ হবে শিশুর কান্নার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধ্বনি। এক রহস্যময় সৌন্দর্যের মাঝে বসে আছি, অথচ মনে হয় যেন তার এক প্রান্তে রয়ে গেছি। এই রহস্য এতই সহজ যে তার থই পাইনা। ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে আসি, মাথার মধ্যে ফের ফিরে আসে লালনের সেই গানের কলি—

পণ্ডিত কানা অহংকারে
মাতবর কানা চোগলখোরে
সাধু কানা অনবিচারে
আন্দাজে এক খুঁটি গেঁড়ে
চেনে না সীমানা কার।
বেদ বিধির পর শাস্ত্র কানা
আরেক কানা মন আমার
এসব দেখি কানার হাটবাজার...

*

এরপর বেশ কিছুকাল কেটে গিয়েছে, রাজ্যরাজনীতিতে পালাবদল হয়েছে। একদিন শান্তিনিকেতনের সেই বন্ধু ফোন করে জানাল, গৌরাঙ্গদা কলকাতায় এসেছে, হাসপাতালে আছে। তখন চারিদিকে হিংসার আগুন জ্বলছে। ইছাইপুর গ্রামে রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনাটা খবর হয়নি, হলেও চোখে পড়েনি। জানা গেল, গৌরাঙ্গদার একটি হাত মারাত্মক জখম হয়েছে। পানাগড় হাসপাতালে কয়েকদিন ভর্তি ছিল, সেখান থেকে মেডিকেল কলেজে আনা হয়েছে। ওর ডান হাতের পাঞ্জায় পচন শুরু হয়েছে, হয়তো কেটে বাদ দিতে হতে পারে। খোঁজ নিয়ে গেলাম একদিন দেখা করতে।

যতবার এই মেডিকেল কলেজে আসি, গেট দিয়ে ঢুকে ডানদিকে আদি বাড়িটার অতিকায় করিন্থীয় শৈলীর থামের নীচে বিশাল সিঁড়িতে অপেক্ষারত মানুষের ভিড় দেখি, প্রতিবারই আমার মনে পড়ে যায় ব্যাটলশিপ পটেমকিন ছবির ওডেসা সিঁড়ির সেই অবিস্মরণীয় দৃশ্য। এই সারি সারি শুকনো পাণ্ডুবর্ণ অসহায় মুখগুলো, এই ম্লান দিশাহারা চোখগুলো, এই উৎকণ্ঠায় দীর্ণ মুখগুলো, গালে রাখা হাত, ফাঁকা চাহনি, এই সিঁড়িতে আধশোয়া বসা অবসন্ন দেহভঙ্গিগুলো, এই হাঁটুতে বেড় দেওয়া হাত, হাতে ধরা এক্স-রে প্লেট রিপোর্ট হাতপাখা জলের বোতল, এই চোখের ওপর কনুই ভাঁজ-করা চিৎ হয়ে শোয়া ঘুমন্ত দেহগুলো, একতলা উঁচু সিঁড়ির বিভিন্ন তলে— এই সবকিছু এক অনন্ত অপেক্ষায় স্থির, অথচ যেন ফুটন্ত লাভাস্রোত নামছে, যা সার্জেনের ছুরি দিয়ে দ্রষ্টার চোখের মণি চিরে দিলে, এই দৃষ্টিবিভ্রম ছিঁড়ে দিলে, দেখা যাবে: কারুকার্যময় কার্নিশ আর্কিট্রেভ স্তম্ভশীর্ষের জমকালো স্থাপত্য থেকে ঠান্ডা নির্মম বুট মচমচিয়ে, বন্দুক উঁচিয়ে নেমে আসছে মৃত্যুর সেনানি— এখনি রণপোত থেকে উপর্যুপরি গোলার আঘাতে চুরমার হবে শহর, ঘুম ভেঙে তিন ঝটকায় জেগে উঠবে মার্বেলের সিংহ, তার আগে এই হুড়মুড়িয়ে নামা আতঙ্কগ্রস্ত মানুষের স্রোত, প্যারাম্বুলেটার, পায়ের নীচে গুঁড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাওয়া চশমা, থেঁতলে যাওয়া মানবশিশু, অন্ধ বিস্ফারিত চোখের থেকে গড়িয়ে নামা রক্ত আর সমবেত মানুষের জান্তব হাহাকারগুলো দলা পাকিয়ে ইমারজেন্সির দিকে ধেয়ে আসা অ্যাম্বুলেন্সের তীক্ষ্ণ সাইরেন হয়ে বেজে চলেছে, বেজেই চলেছে, ছুটে চলেছে স্ট্রেচারবাহকেরা, পাশে পাশে ছুটছে স্যালাইনের বোতল উঁচু করে ধরা হাত, হাতে রিনঠিন রিনঠিন বেজে চলেছে শাঁখা আর নোয়া, এত কোলাহলের মধ্যেও স্পষ্ট শোনা যায় রাতের শেষ ট্রামের ঘন্টির মতো।

বেড জোটেনি গৌরাঙ্গদার। ডেভিড হেয়ার ব্লকে তিনতলায় করিডোরে মেঝেয় নীল প্লাস্টিক বিছিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে ছিল। পরনে লুঙি আর গেঞ্জি, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ডান হাতটা কনুই পর্যন্ত অতিকায় ব্যান্ডেজ জড়ানো। জানা গেল, ইঞ্জেকশান দেবার পর থেকে হাতে ব্যথা নেই আর, কিন্তু একদম অসাড় হয়ে আছে। মনে হচ্ছে যেন খুব ভারি একটা কিছু বইতে হচ্ছে সারাক্ষণ। এছাড়া জ্বর আসছে থেকে থেকেই। তবে আসল আঘাতটা পড়েছে মনে ; ভেতর থেকে দুমড়ে গিয়েছে মানুষটা। কয়েক বছর আগে ইছাইপুরে যে গৌরাঙ্গদাকে দেখেছিলাম, তার ছায়া যেন।

ওর সঙ্গে সুবল এসেছে, এছাড়া গ্রামের দুজন। এখানে ভর্তি হবার পর টিভি থেকে সাংবাদিক এসেছিল। গৌরাঙ্গদা বসেছিল, ওরা শুয়ে পড়তে বলে। শোয়া অবস্থায় ক্যামেরা চালিয়ে ইন্টারভিউ নেয়, জানতে চায় কোন দল করে, যারা মেরেছে তারা কোন দলের লোক।

কী বলব ? গৌরাঙ্গদা শুকনো হাসি হাসে। একই লোক, এপার ওপার একই চর। সবাই জ্ঞাতিগুষ্ঠি। এসব কীকরে বোঝাই ওদের বলুন তো ?

গ্রাম দখল হবে, খবরটা কদিন ধরে বাতাসে ভাসছিল। হাওয়া বুঝে রং বদলায়নি যারা, বিশেষ করে পুরুষেরা, অনেকে ইছাইপুর ছেড়েছিল। তখন মাঠে ধান পেকেছে, সময়মতো ঘরে না তুলতে পারলে বৃষ্টির জল পেয়ে এলিয়ে যাবে। এদিকে কদিন ধরেই এলাকায় টহল দিচ্ছিল বাইক বাহিনী, তাদের মুখে মাথায় গামছা জড়ানো। কাঁকসার দিক থেকে বালির চর ধরে আসছিল তারা। সুবল আগেই চলে গিয়েছিল দুবরাজপুরে ওর শ্বশুরবাড়ি। একদিন দুই শালাকে পাঠিয়ে গৌরাঙ্গদার বউ আর ছেলেকেও নিয়ে গেল।

গৌরাঙ্গদা যায়নি। কোথায় যাব ? বলেছিল সে। এক জীবনে কতবার ভিটেছাড়া হয় মানুষ ? এইসব নিজের হাতে গড়া— এই ঘর, ঘরের প্রত্যেক কটা আসবাব। ভিটের চারপাশে গাছগুলো সব নিজের হাতে লাগানো। চল বললেই যাওয়া যায় নাকি ?

গ্রামদখল শুরু হল যখন, দশহরার দিন বিকেলবেলা, শসার খেতে মাচা বাঁধছিল গৌরাঙ্গদা। ঘর পুড়ছে খবর পেয়ে ছুটেছিল। গিয়ে দেখে আগুনটা এদিকে এগিয়ে আসছে হাওয়ায়। গোয়ালের খোড়ো চালে ফুলকি উড়ে এসে লাগতেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। গামছায় মুখ মাথা জড়ানো কয়েকটা মানুষ, তাদর হাতে রামদা আর দিশি ওয়ান-শাটার। বাদবাকি মুখগুলো চেনা। গরুটা খোঁটার দড়ি ছিঁড়ে পাগলের মতো

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাপাচ্ছে উঠোনময়। আগুনের শিখা লাফ দিচ্ছে পুবের বড়ো ঘরের দিকে। নতুন শরের ঘর, গত নবান্নে বাঁধা হয়েছে। ভেতরে একটা সাইকেল, কয়েক বস্তা সর্ষে, আর পাঞ্জাব থেকে আনানো আলুর বীজ ছিল। একজনের হাতে কেরোসিনের টিন দেখে গৌরাঙ্গদা ছুটে গিয়ে দরজার ফ্রেমে দুহাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। যেন উদ্দালক, আলে বুক বেঁধে জল আটকানোর মতো আগুন আটকাবে। একটা খিস্তি, তারপর ঘাড়ের ওপর কষে একটা রদ্দা— মাটিতে ফেলে দিয়েছিল ওকে। পড়ে গিয়েও দরজার কাঠ আঁকড়ে ধরেছিল গৌরাঙ্গদা। পেছন থেকে কোমর ধরে টানছিল দুজন, মনে হচ্ছিল হাতটা বুঝি ছিঁড়ে যাবে।

সরে যা! সরে যা! বলে পেছন থেকে চিৎকার করছিল।

গলাটা চেনা। পাশের পাড়ার বিশু, একসময় অঞ্চল কমিটির সেক্রেটারি ছিল। দায়ের কোপটা ওই বসায়। দল বদলের পর আনুগত্যের প্রমাণ দেবার দায় ছিল।

এক কোপে কব্জি থেকে পাঞ্জাটা প্রায় কেটে ঝুলে পড়েছিল। তারপর সংজ্ঞা হারায় গৌরাঙ্গদা। হুঁশ ফিরলে দেখে কেউ কোথাও নেই, উঠোন জুড়ে ছড়ানো বাক্সপ্যাঁটরা। মাঝরাতে হালকা বৃষ্টি হয়েছিল, তাতেই আগুন নিভেছে। পোড়া কাঁথা তোষকের স্তূপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। হাত থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে তখনও। অন্ধকারে আঁতিপাঁতি করে খুঁজে ন্যাকড়াকানি, সূচ আর মাছধরা জালের সুতো জোগাড় করে জখম হাতটা একটা কাপড়ের থলিতে ঝুলিয়ে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। চলে গিয়েছিল গড়জঙ্গলের ভেতর, যেখানে কতকাল আগে সামন্ত রাজা ইন্দ্রাই ঘোষ লাউসেনের আক্রমণে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। সেই পলাশ আর পিয়ালের জঙ্গলে গড়ের ধ্বংসাবশেষের ভেতর কতগুলো দিন আর রাত কেটেছে, মনে পড়ে না। জালের সুতো দিয়ে ঝুলে থাকা পাঞ্জা সেলাই করেছিল, তারপর ধুলো শুকনো ঘাস আর পতঙ্গের বিষ্ঠা পরিষ্কার করে আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে দিয়েছিল ক্ষতমুখ। সেলাই করার সময় অসহনীয় যন্ত্রণাতেও সংজ্ঞা হারায়নি, কিন্তু নিজের চামড়া পোড়া গন্ধ নাকে এসে লাগতে আর ধরে রাখতে পারেনি।

তারপর জ্ঞান এসেছে চলে গিয়েছে— একদিন দুদিন... কতদিন ঠিক মনে নেই। খিদেতেষ্টার কোনো অনুভূতি ছিল না। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়েছে, জঙ্গলে গাছের পাতায় বৃষ্টিফোঁটার ঝিরঝির শব্দ ঘুমের ভেতর শুনেছে। স্বপ্নে দেখেছে, কাটা হাতের পাঞ্জাটা সেঁটে আছে দরজার ফ্রেমে।

একদিন ভোরবেলায় যেন মরণঘুমের থেকে জেগে উঠল। হাতে কোনো সাড় নেই, মাথার ভেতরে কোনো অনুভূতি নেই, ফোঁপরা। হাতে কাপড়ের পটি সরিয়ে দেখে মেটে আলুর ন্যায় রং ধরেছে, সেলাইয়ের জায়গাটা কালো। কী হয়েছে, কোথায় রয়েছে কিছুই বুঝে উঠতে পারেনা প্রথমে। স্মৃতি লোপ পেয়ে গিয়েছে। পায়ের দিকে তাকাতে কাঠকুটোর ভেতর দেখতে পায় একটা সূচ। কুড়িয়ে নেয় সেটা। প্রথমে ঠিক চিনতে পারেনা জিনিসটা কী, যেন জীবনে এই প্রথম দেখছে। আঙুলে নাড়াচাড়া করতে করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রমশ তার তীক্ষ্ণ মসৃণ দেহ, একদিকে চেরা চোখের মতো ছিদ্র— একটি সূচের আশ্চর্য সুষমা দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে মনে পড়ে যায় সবকিছু। এই লম্বা সূচ দিয়ে নকশিকাঁথা বোনে ওর বউ সরস্বতী, এর আগে কখনো এভাবে হাতে তুলে নিয়ে দেখেনি। কী আশ্চর্য মানুষের উদ্ভাবন, কী নিখুঁত আর অমোঘ। এক নতুন-পাওয়া চোখ দিয়ে— চারপাশে তাকায় সে। ডালপালার ফাঁক দিয়ে দিনের আলো এসে পড়েছে ভিজে হলুদ পাতার ওপর, মাটির গন্ধ, পাখি ডাকছে।

গৌরাঙ্গদার বউ সূচে ফোঁড় তুলে কাপড়ে যে আশ্চর্য সুন্দর নকশা বুনত, তাতে যে ঘন নিবিড় গাছপালা নৌকো আর আকাশপথে বকের সারির মোটিফগুলো থাকত, সেটা ঠিক অজয়পাড়ের প্রকৃতি নয়। সীমান্তের ওপারে যে প্রকৃতি ওরা ছেড়ে এসেছে, সেই প্রকৃতি। সেই দেশ ওরা ছেড়েছে দেশটা ভাগ হবার অনেক পরে। তার আগে যতদিন পেরেছে জমি কামড়ে পড়ে থেকেছে, কারণ সেটাই ছিল ভাতকাপড়ের সম্বল। যখন আর পারেনি, চলে এসেছে। দেশটা আনতে পারেনি, কিন্তু তার নকশা নিয়ে এসেছে সরস্বতী। তারপর সেগুলো ফুটিয়ে তুলেছে নীরব সুতোর কাজে।

পরে জেনেছিলুম, নকশিকাঁথা দুচারটি অক্ষত আছে; ভিটে ছাড়ার সময় কিছু বাসনকোসন পুঁটলি বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সুবলের মেয়েটা সেই কাঁথায় শুয়ে বড়ো হচ্ছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেরাকোটার মুখ

নকুল সর্দারের পোড়া কাঠের মতো চেহারা, তার ওপর সাদা ছাইয়ের মতো চুল আর খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ননীবালা বালিকা বিদ্যালয়ে বন্যাদুর্গতদের শিবিরে ওঁকে প্রথম দেখে আমার মনে পড়েছিল বুধো গাড়োয়ানের কথা। বুধোর উড্‌কাট ছবি আমার ছেলেবেলার আম আঁটির ভেঁপু বইতে ছিল। এখন নকুলকে যেন তারই একটা ঝাপসা রেখাচিত্রের মতো লাগে। এক ধাক্কায় অনেকটাই বুড়িয়ে গিয়েছেন, চোখের চাহনি ঘোলাটে। এক চৈত্রের বিকেলে খালের মুখে জাল পেতে এসে আমাদের সঙ্গে গঙ্গা পার হচ্ছেন ফেরি নৌকোয়। এখন ভাঁটা।

জোয়ারে নদীর মাছ খালে ঢুকবে? নীহারদা বিজ্ঞের মতো প্রশ্ন করে।

জলের যেদিকে টান, মাছ তার উল্টোপানে যায় গো বাবু। নকুলের গলায় শ্লেষের ছোঁয়া। মাছ আছে খালে, জোয়ারে মুখের দিকে চলে আসবে। তা বাদে নদীতে এখন মাছ আর কই? সব তো শেষ করে দিয়েছে ওই কাগজকল, বুড়ি মাগিটাকে বাঁজা করে ছেড়ে দিয়েছে একেবারে!

চেহারায় চিনতে অসুবিধে হলেও মুখের ভাষা অবিকল আছে নকুল সর্দারের। শীতকালে একবার ওর চরের দেশে আসতে বলেছিলেন আমাদের। একটু দেরি হয়ে গিয়েছে, কিন্তু কথা রেখেছি। সেজন্য আমাদের দেখে প্রথমে যেন খুশি হয়েছিলেন, কিন্তু এখন আবার অন্যমনস্ক দেখায়; নির্লিপ্ত চোখে চেয়ে থাকেন জলে।

নকুলের ফ্যাকাসে চোখ, মুখের চামড়ায় গাঙশালিখের পায়ের ছাপ। ঠোঁটে বিড়ি চেপে গামছাটা ল্যাঙটের মতো পরে এক বুক জলে নেমে খুব ধীরে ধীরে জাল বাঁধছিলেন যখন, মুখে এই নির্লিপ্তিটা ছিল। সারাদিনের শ্রমে হয়তো তিরিশ-চল্লিশ টাকার মাছ হবে না, ঘরে তিন-চারটে পাতে দেবার মতোও নয়। সেজন্যেই কি? কে জানে! হয়তো নকুলের ভাবনার গড়ন, কাজ সম্পর্কে ধারণা ও প্রত্যাশা আমার চেনা শহুরে মানুষদের মতো নয়। খালে মাছ আছে, ওঁর কাছে জাল আছে, সেই জাল কোথায় কীভাবে বাঁধতে হয় জানা আছে, মাছের গতিপ্রকৃতিও জানা আছে। ব্যাস, এই পর্যন্তই। মন পড়ে আছে অন্য কোথাও। কোথায়, কে জানে?

নদীটাকে সত্যিই বিশীর্ণ নারীর মতোই দেখায়। তার কঙ্কালসার দেহ পড়ে আছে চওড়া বালির খাতে। দূরে গাছগাছালির ফাঁকে মাথা তুলেছে কাগজ কলের চিমনি। এক বছর হল বন্ধ। নদীও সরে এসেছে। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে নিরন্তর খাত বদল করে চলেছে। মাঝে মাঝে জেগে উঠছে চর। পিঁপড়ের সারির মতো বালির লরি নামছে চরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুকে, ভাগীরথীর মাংস খুঁটে নিচ্ছে। বানভাসি কৃষকের স্বপ্নের চর দেখব বলে বেরিয়ে যেন ভুল করে ঢুকে পড়েছি মেজকার সেই দুঃস্বপ্নে।

আপনারা মনে করে দেখতে এলেন, তবু ভালো। নকুল বলে। তবে দেখার আর আছে কী? আশ্বিন মাসে বানের জল সেই যে ঢুকল, আর বেরোয়নি। এখন বাঁধের ওপর বাস।

বাঁধের ওপর শরণার্থী শিবিরের সিলুয়েট। আকাশের গায়ে তাঁবুর সারি, শর আর দর্মার ঝুপড়ি। চওড়া বাঁধটা একদিকে সরু হতে হতে ঢুকে এসেছে বদ্ধ খাতে। অপরাহ্নের আলোয় চিকচিক করছে লেপাপোঁছা কাঁসার থালা, তার ওপর প্রসারিত বুভুক্ষু জিভ। ওটাই নকুল সর্দারের ঠিকানা এখন। ওর গ্রামটা রয়েছে বাঁধের ওধারে, বদ্ধ জলার নীচে।

আর দিন কুড়ি আগে যদি আসতেন, পাখি দেখতে পেতেন।

পাখি আসছে নাকি?

আসছে তো। জমা জল আটকে বাঁধের ওদিকটায় বিল হয়েছে না? মেলা পাখি এয়েছে এবার শীতে। এখন সব ফিরে যাচ্ছে।

পাখির ছবি তোলার সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে যেতে নীহারদা আক্ষেপ করে।

ভাঁটার নদী, সরু খাতে বার কয়েক লগি মারতেই নৌকো এপারে এসে ভেড়ে। বালির ওপর দিয়ে পথ বেঁকে গিয়েছে। তার ওপর দিয়ে সারিবদ্ধভাবে চলেছে মানুষ সাইকেল ছাগল। এদিকওদিক টুকরো টুকরো জল, তার মধ্যে হাঁটু ডুবিয়ে জোয়ারে আটকে পড়া কুচো মাছ ধরছে একদল উলুরিঝুলুরি শিশু। আয়নার মতো জলে সূর্যের প্রতিফলনে তাদের মাথার চুলগুলো অদ্ভুত জ্যোতির্বলয় হয়ে উঠেছে। এদিক ওদিক বালির ভেতর আধডোবা ভাঙা নৌকার হাড়গোড়।

আমাদের সঙ্গে খানিকদূর পর্যন্ত আসেন নকুল।

আপনারা এই পথ ধরে সিধে বাঁধের ওপর চলে যান, আমি আর দুটো জাল বেঁধে আসছি।

পথটা খানিকদূর এঁকেবেঁকে কাঁটাঝোপ চিরে উঠে গিয়েছে বাঁধের ওপর। মনুষ্যবিষ্ঠার গন্ধ আর আকন্দ শেয়ালকাঁটার ঝাড় দুহাতে সরিয়ে আমরা উঠে পড়ি জিভের ডগায়। একদিকে চূর্ণবিচূর্ণ নদী, অন্যদিকে আদিগন্ত স্থির কালো জল। জলের ওপর মাথা তুলে আছে গাছ, আধডোবা বাড়িঘরের চিহ্ন, পথের জ্যামিতি। হেলেপড়া বিদ্যুতের স্তম্ভ, তারহীন।

একটি চারপেয়ে পানগুমটি, মানুষ নেই। রেডিয়ো মিরচি বাজছে। এক সুললিত নারীকণ্ঠ বলছে— আর যদি আপনার পছন্দের মানুষটির জন্য চান একটি পছন্দের গান, তাহলে কিন্তু অবশ্যই ফোন করুন...

কী নেবেন?

লাল প্লাস্টিকের জগ হাতে উঠে আসে লুঙ্গিপরা দোকানি। আমরা সিগারেট নিই। বাঁধের ওপর ছাউনিগুলো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করি—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রীকৃষ্ণপুর এটাই তো?

হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। আবার খয়রামারি বিজনে হবিবপুরও বলতে পারেন।

তার মানে?

মানে আর কি, এই এতগুলো গাঁয়ের লোক ঠাঁই নিইছে।

কালো প্লাস্টিকের ছাউনিগুলো দেখে অবশ্য আলাদা করে কোন গ্রামের মানুষ চিনে নেবার উপায় নেই। সকলেই ছিন্নমূল। তিনটি গ্রামের প্রায় ষাটটি পরিবার বাস করছে। তাঁবুর মধ্যে বসবাসের জায়গাটা মাচা করে উঁচু করা হয়েছে। ওপরে মানুষ, নীচে ছাগল মুরগি আর বন্যার থাবা থেকে হিঁচড়ে আনা গৃহসামগ্রী: বাসনকোসন, শিলনোড়া, গৃহদেবতা, সস্তা কাঠের আলমারি, জ্বালানি কাঠ, বাচ্চার খেলনা, কীটনাশকের স্প্রেয়ার। তাঁবুর সামনে খোলা আকাশের নীচে রান্নাবাটি, পেছনে বাঁধের ঢালে তেকাঠিতে ছেঁড়া চট ঝুলিয়ে শৌচালয়। পতিত জমির ওপর যেভাবে আগাছা বাড়ে, সেভাবেই একটা গ্রাম ধীরে ধীরে গজিয়ে উঠছে যেন। খাঁচায় টিয়াপাখি আছে, তুলসীমঞ্চও, প্লাস্টিকের চালে লতিয়ে উঠছে লাউ পুঁই। তবু ধূসর হতশ্রী গ্রাম। ট্রেন থেকে দেখা সেই হল্ট স্টেশনের বানভাসি শিবিরের তুলনায় বড়ো বেশি নিষ্প্রাণ, বিবর্ণ।

উদ্যমীরা যে-যার মতো ব্যবস্থা করে নিয়ে চলে গিয়েছে। যাদের সামনে কোনো বিকল্প নেই, অর্থাৎ গ্রামের আর্থসামাজিক তলানিটুকু পড়ে আছে। এইভাবে খোলা আকাশের নীচে এতগুলো মাস পড়ে থাকার পর তাদের চোখের থেকে সমস্ত আশা শুকিয়ে গিয়েছে। বিবর্ণ আশাহীন মানুষ, চৈতালি হাওয়ার ঘূর্ণিতে শুকনো পাতার মতো ভাগ্যতাড়িত। শিশুরা নির্জীব, মেয়েদের খড়িওঠা ত্বক, ঘোলাটে চাহনি: উনুনের গর্তে কাঠকুটোর আগুনে ফুঁ দিতে দিতে ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে চোখ সরু করে তাকায়। বাঁধের ওপর এই ন্যাড়া পরিবেশে গ্রামজীবনের স্বাভাবিক আব্রুগুলো খসে গিয়েছে, সতর্ক প্রাণীর মতো চলাফেরা ওদের। বেশিরভাগ পরিবারে পুরুষেরা শ্রমদান করতে চলে গিয়েছে বাইরে। পড়ে আছে নারী শিশু বৃদ্ধ ও বিপর্যয়জীবীরা।

তেমন একজনের মুখোমুখি পড়ে যাই আমরা। বছর পঁচিশের যুবক— পরনে গেঞ্জি আর খোপকাটা লুঙ্গি, ব্যাকব্রাশ-করা চুল, হাতে মোবাইল। নীহারদার গলায় ঝোলানো ক্যামেরাটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আপনারা এখানে কার খোঁজে এয়েছেন?

ওর রুক্ষ চাহনি আর দেহের ভাষা দেখে নীহারদা দপ করে জ্বেলে ওঠে।

সেটা তোমায় বলতে যাব কেন হে? তুমি কে?

যুবকটি একটু থতমত খেয়ে যায়।

আমি হলুম এখানকার শিবির কমিটির মেম্বার। বহিরাগত কেউ এলে খোঁজখবর করাটা এখানে নিয়ম।

নিয়ম! নিয়মটা কে তৈরি করেছে শুনি? জায়গাটা ভারতবর্ষের মধ্যে তো, নাকি? আমি ভারতবর্ষের নাগরিক। এই দেশের ভেতর যেখানে ইচ্ছে যেতে পারি। এটাই নিয়ম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোমরে হাত রেখে বেশ নাটুকে ভঙ্গিতে ওর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করেন নীহারদা।

কোন পার্টি করা হয়? দেশ কোথায়?

আজ্ঞে বিজনে। যুবকটি বলে।

আহ্, ওটা তো ঠিকানা। আসল দেশ কোথায়? বাংলাদেশ নাকি পুব পাকিস্তান? বাংলাদেশ, তাই তো? তার মানে একাত্তরের পরে এদিকে আসা হয়েছে। তার আগে হলে বাপু বলতে পাকিস্তান। আর যদি বলতে পূর্ববঙ্গ, তাহলে বুঝতাম দেশভাগের আগে এসেছ। এই শর্মার মতো।

এই বলে নিজের বুকে দুবার টোকা মারে নীহারদা।

শিবির কমিটির মেম্বার এবার সহজ হয়। কুঁচকি চুলকোতে চুলকোতে বলে— তা যদি বলেন, আমাদের এদিকে আদি বাসিন্দে বলতে...

আহ্! ওসব আদি বাসিন্দে-ফাসিন্দে কিছু নেই, নীহারদা অধৈর্য গলায় বলে। এসব অর্বাচীন জায়গা, এই গোটা বঙ্গদেশটাই। লক্ষ বছর আগে এখানে ছিল সমুদ্দুর, বুঝলে হে? সাগর সরে যেতে যেমনি চর জেগে উঠল, অমনি উড়ে এসে জুড়ে বসলাম তোমরা আমরা এরা সক্কলে। তা সেই চর ভাঙবে গড়বে, ঘাসগুলো মজবে ফুলবে, এটাই হল নিয়ম। প্রকৃতির নিয়ম। তুমি আমি সকলেই বহিরাগত, দুদিনের অতিথি। কী বুঝলে?

যুবকটি, বাপী মণ্ডল, এবার আমার দিকে ফিরে ফিক করে হাসে।

কাকু এমন করে কইছেন যেন গতকাল কালকের ঘটনা। এসব তো হিসটিরি!

শিবির কমিটির তাঁবুটি বেশ বড়ো, ভেতরে খড় বিছানো। প্লাস্টিকের চেয়ার টেবিল, ব্যাটারিচালিত টিভি সেট।

সরকারি রিলিফ সব এখান থেকেই দেওয়া হচ্ছে। তিনটে গ্রাম পঞ্চায়েতের মেম্বাররা আছে কমিটিতে। বাপী জানায়।

তাঁবুর একপাশে টেলিফোন বুথ। কমিটিই চালায়। যেসব পুরুষেরা ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়েছে, তাদের পরিবারেরা ব্যবহার করে। এভাবে শিবিরের মানুষদের হালহদিশ কমিটির গোচরে থাকে।

হপ্তায় হপ্তায় একজন ডাক্তারবাবু বসে। আইসিডিএস সেন্টারটা চালু করে দেবার কথা হচ্ছে। আপনারা এনজিও নন তো?

কেন, হলে আপত্তি আছে নাকি?

দ্যাখেন, এখানে সব পার্টি চলবে। শুধু মাওবাদী চলবে না আর এনজিও চলবে না। এনজিওদের আমরা ঢুকতে দিচ্ছি না।

বাপি স্বচ্ছ দাঁত বের করে হাসে। চা খাবেন তো? আসেন।

শিবির কমিটির তাঁবুর পরে কয়েকটি দোকান— মুদিখানা, মাটির হাঁড়িকুড়ি ও ভিডিও ক্যাসেটের গুমটি। বাঁধের শেষে চায়ের দোকান। তারপরেই ভাঙনের ছবি। বিশ ফুট উঁচু পাড় ভেঙে ঢুকে পড়েছে নদীগর্ভে। চারিদিকে জল— স্বচ্ছ বাদামি কালো, স্থির ও বেগবতী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকগুলো পরিত্যক্ত জীর্ণ নৌকো, বুকে জল, জলের ওপর পুরু শ্যাওলায় প্রতিফলিত সূর্য: একগুচ্ছ টানা টানা চোখ, নিষ্পলক চেয়ে আছে ছন্নছাড়া বসতিটার দিকে।

চায়ের দোকানে আমাদের জন্যে অপেক্ষমাণ নকুল সর্দার, বাঁশের মাচায় এক পা মুড়ে হাঁটুর ওপর চিবুক রেখে বসে আছেন। কিছুক্ষণ আগেই দেখা হল, কিন্তু চিনতে পারেন না।

জোয়ার কখন আসবে? পাশে বসে জিজ্ঞেস করি।

সেই রাতের দিকে। তা আপনারা?

কয়েক মুহূর্ত, তারপর গলার স্বর চিনতে পেরে কপালে আঙুল জড়ো করে বলেন—

ওহ্ আপনারা! চিনতে পারিনি! চোখে আলো পড়লে কিছু দেখতে পাইনে আজকাল, কালো কালো কালির ফোঁটা নাচে।

জলের ওপর রোদ পড়ে, সেই দিকে চেয়ে চেয়ে চোখদুটো গেছে। মাছধরাদের এই এক ব্যামো। বাপি জানায়।

ডাক্তার দেখাওনি? কী বলছে?

বলছে ছানি আছে, তবে কাটালেও ঠিক হবে কী না গ্রান্টি নেই। চোখের ভেতরে শিরা নাকি শুকিয়ে গেছে। কমিটি থেকে ছানি কাটার ক্যাম্প করবে বলেছে। তখন একবার দেখাব।

অস্ত সূর্যের আলো সরাসরি নকুলের মুখে এসে পড়েছে। চোখের মণিদুটোয় বুঝি কালো তারাগুলো জলে ধুয়ে সাফ হয়ে গিয়েছে।

ইরিগেশান থেকে বাঁধের কাজ হচ্ছে, দেখবেন তো আসেন। বাপি বলে।

চা শেষ করে আমরা বাঁধের ধারালো পাড় দিয়ে নেমে আসি নদীর কাছাকাছি। আমাদের অনুসরণ করে যেন কিছুটা অনিচ্ছাকৃতভাবেই আসেন নকুল। বাপিকে আমাদের সঙ্গে দেখার পর থেকে কেমন গুটিয়ে গিয়েছেন মনে হয়। সূর্যাস্তের আলোয় জল রাঙা, উষ্ণ ভাপ উঠছে। পেছনদিকে আকাশের গায়ে তাঁবুর সারি, কমিটির বড়ো তাঁবুর মাথায় পতাকা উড়ছে। রক্তিম সূর্যাস্তের প্রেক্ষাপটে যেন কোনো কোম্পানি পেইন্টারের আঁকা সেনাছাউনির ছবি।

একটা যুদ্ধ চলেছে, মানুষের সঙ্গে নদীর। দূরে বোল্ডার বোঝাই ট্রাকের সারিগুলো ভেবে নেওয়া যেতেই পারে সাঁজোয়া গাড়ি। বাঁধ মেরামতের কাজ চলছে। কোনো এককালে নদীর প্লাবনভূমিতে উঁচু বাঁধ দিয়ে খুবলে নেওয়া হয়েছিল চাষবাসের জমি। সেপ্টেম্বরের গেরিলা অভ্যুত্থানে সেই দুর্গপ্রাচীর ভেঙে ঢুকে পড়েছে জল। ফের দুর্গ নির্মাণ চলছে জলকে প্রতিহত করতে। কিন্তু নদীর অটল দুর্দমনীয়তার কাছে এ এক অসম যুদ্ধ। অস্তসূর্যের আলোয় দূর থেকে ক্ষুদে ট্রাকগুলো দীর্ঘ ছায়া টেনে নিয়ে চলেছে। কোথাও পাহাড় ভেঙে পাথরের চাঁই এনে ফেলছে আর নিয়ে যাচ্ছে বালি।

দুই কাজের ঠিকাদার একই, বাপি জানাল। তবে এতে শিবির কমিটির কোনো ভূমিকা নেই। এসব ঠিক হয় ওপরতলা থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাড়া পাড়ে উবু হয়ে বসে আছেন নকুল। নীচু স্বরে জলের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন—

আগে নদী আরও ঢিমে ছিল, জানেন। এমন টান ছিল না। এখন যেন ছোটে। ছুটবেই তো। কুত্তাকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখলে যেমন তেজ বেড়ে যায়, তেমনি করে বাঁধ দিয়ে বেঁধে রেখেছে। খেলার জায়গা নেই, ফুঁসছে। আগে বন্যা হলে আসত পলি, মিহি দইয়ের মতোন। এখন আসে বালি।

ভ্যানরিক্সায় নদীপাড়ে আসার সময় মাঠে পুরু বালির স্তর দেখেছি আমরা। একহাত গভীর গর্ত খুঁড়ে পটলের চারা পুঁতছে চাষি, আশা— আগামী বন্যায় পলিমাটির স্তর ছেয়ে এসে ফিরিয়ে জমি দেবে।

এই কথা নকুলকে বলতে উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠেন।

এটাই নদীর ধরন যে গো! এক বানে বালির কাঁথা চাপা দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখবে, পরের বানে ফের পলি বয়ে এনে জিয়নকাঠি ছুঁইয়ে দেবে। এই দেখেন না, দেখেন।

ভাঙনে খসে-পড়া খাড়া পাড়ের গায়ে হাত বোলান: হলদে বেলেমাটির নীচে সাদা বালির স্তর। জলের আঘাতে উন্মোচিত হয়ে পড়েছে একশো বছরের প্লাবনের ইতিবৃত্ত।

এই দেখ অপু, এখানে এক নবীন ভূমির গল্প লেখা হয়ে আছে; কোনো সুপ্রাচীন সভ্যতার অবশেষ নয়। তেমন কিছু যদি বা থেকেও থাকে, প্লাবনে ভেসে কোথায় হারিয়ে গেছে। হয়তো এই সভ্যতাটাও হারিয়ে যাবে, তারপর এভাবেই একদিন খুলে আসবে জলের ধাক্কায়। কিছুকাল আগে ক্ষমতায় পালাবদল হল, এখন মাটি খুঁড়লে উঠে আসছে নরকঙ্কাল। কত প্রাচীন কঙ্কাল? কোন প্রত্নসময়ের? উনিশশো আটষট্টি? একাত্তর? দুহাজার সাত? নাকি তার ঢের আগে, ছেচল্লিশের দাঙ্গার? নাকি সেসব এতদিনে পলিস্রোতে ভেসে মিশে গিয়েছে গঙ্গারিডি সভ্যতার অবশেষের সঙ্গে। কিংবা তেতাল্লিশের মন্বন্তরে সৎকারের অভাবে যে দেহগুলো ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তার সঙ্গে মিশে যাওয়া সতেরশো সত্তরের মন্বন্তরের দেহ? অথবা মধ্যবর্তী মারী মন্বন্তর যুদ্ধ হত্যা... রাশি রাশি নরকঙ্কালের হাড়ের কাঠামোয় বুঝি দাঁড়িয়ে আছে এই গাঙ্গেয় বদ্বীপভূমি।

আজকাল হিসেবে গরমিল হয়ে যাচ্ছে, নকুল বলেন। জাল টানলে আর মাছ ওঠে না। কোটালের দিন টানা জাল মেরেছিলাম, ভাবলাম এত পাখি আসছে যখন মাছ উঠবে। কী উঠল জানেন? শুধু পেলাস্টিক। বিলিতি পাখিগুলো কি পেলাস্টিক খায়?

পাখিগুলো বিলিতি নাকি? বাপিকে জিজ্ঞেস করি।

কিছু শীতের দেশের পাখি আছে। প্রথমদিকে তো খুব মেরে খাওয়া হল। তারপর বনবিভাগ থেকে এসে বললে এ পাখি মারা চলবে না, মারলে নাকি জেলহাজত হবে। তারপর পুলিশ পিকেট বসাল। বোঝেন— এতগুলো মানুষ ভিটেহারা হয়ে পড়ে আছে, তাদের জন্য পুলিশ নেই পাখির জন্য পুলিশ। এখন তো নাকি বলছে জায়গাটা পাখিরালয় করে দেবে, টুরিস্পট হবে। আমরা বিরোধিতা করছি, তবে শেষমেষ কী যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে কেউ জানে না। জল যদি না সরে তো জমি ফিরে পেয়েই বা লাভ কি হবে? যদি ঠিকঠাক ক্ষতিপূরণ দেয়, যদি টুরিস্পট হয়, তবু কিছু লোক কাজ পাবে। না কি বলেন?

ছবিটা কল্পনা করার চেষ্টা করি: বাঁধের গায়ে সাদা ছোটো ছোটো বাতানুকূল কটেজ। ডুবে-যাওয়া গ্রামের ওপর দিয়ে মোটরবোটে একদল টুরিস্ট নিয়ে চলেছে বাপি, পরনে রিসর্টের ইউনিফর্ম, মাথায় টুপি। বাপি বলছে— ওই দেখুন সাইবেরিয়ান ক্রেন, ওই যে হাইটেনশান খুঁটির ওপর বসে আছে ওটা হল লিফ ওয়ার্বলার, আর ওই দূরে ইঁটের পাঁজার মাথায় ওগুলো স্পুনবিল। ইটের পাঁজাটা ছিল ইস্কুলবাড়ি, এই জায়গাটা খেলার মাঠ, আর ওই যে ওখানে মরা শিমুলগাছের মাথাগুলো জেগে আছে, ওইখানটায় ছিল গ্রামের শ্মশান...

বিচিত্র স্বপ্নসম্ভাবনা থেকে ফিরে আসি নকুল সর্দারের সময়চারিতায়।

আজকাল রাতের দিকে বিলের ওপর আলেয়া জ্বলে। যেদিন খালের মুখটায় জাল দিয়ে রাখি, সেদিন আর রাতে ঘুমোই না। বাঁধের নীচের মাটি কুরে কুরে খায় জল, সেই শব্দ শুনি।

নদীর মাটি খাবার শব্দ?

হ্যাঁ গো। এখেনটায় নদীর বড়ো খাঁই। শুনবেন নাকি? আসেন।

ওঁর দেখাদেখি আমিও ভাঙা পাড়ে নরম মাটিতে কান পাতি। সারাদিন রোদের তাপ শুষে মাটি আশ্চর্য উষ্ণ, যেন জীবন্ত দেহের মতো। উষ্ণ, আর্দ্র মাটি থেকে উদ্ভিদের রসের মতো একটা গন্ধ উঠে এসে আগলে ধরে আমাদের মাথা। এক নিবিড় পেলব আরামের কুঁড়ি ফোটে মস্তিষ্কের কোষে কোষে। কিন্তু অন্য কানে হাওয়ার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাই না।

মাটির নীচে বালি সরছে, শুনতে পাচ্ছেন?

মুখোমুখি নকুল ও আমি, হাঁটু মুড়ে বসেছি, দুজনের কান বাঁধের গায়ে সাঁটা। অস্ত সূর্যের আলোয় মাটির ওপর জেগে থাকা ওর বলিরেখাময় মুখটা মনে হয় যেন টেরাকোটার তৈরি, যেন বালি সরে গিয়ে জেগে উঠেছে কোনো প্রত্নসভ্যতার মৃৎপাত্র অথবা মুখোশ। চোখ বন্ধ করে একাগ্র হয়ে শোনার চেষ্টা করি। অনেক নীচে বুভুক্ষু ইঁদুরের পালের মতো জল কুরে খায় মাটি। ফোঁপরা জমিটা দাঁড়িয়ে থাকে, বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝা যায় না। তারপর একদিন— যেভাবে সম্পর্ক ভাঙে, দাম্পত্য ভাঙে, সমাজ রাষ্ট্র ভাঙে, চেনা চোখে ফোটে অচেনা চাহনি, চেনা হাতে ফোটে হিংসার ফুল, চেনা গলি মহল্লা অচেনা হয়ে ওঠে— আচমকা সবকিছু হুড়মুড় করে ধসে পড়ে জলে। নারকোল গাছ ইস্কুলবাড়ি বিদ্যুতের খুঁটি— সবকিছু। জ্বরতপ্ত মাটিতে কান পাতলে শোনা যায় অদেখা জনপদের ভেঙে পড়ার শব্দ। মটমট করে ভাঙছে কুঁড়ের খুঁটি, আসবাবপত্র, লক্ষ্মীর ভাঁড়, ছবির কাচ ভাঙছে ঝনঝন শব্দে, গরুর আর্তনাদ আর শিশুর কান্না। অনেকগুলো সদ্যোজাত শিশু যেন কাঁদছে একযোগে, আর সেই কর্কশ আর্তকান্নার রোল দিগ্বিদিক ছাপিয়ে ঘন হয়ে আসছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আচমকা টের পাই, শব্দটা আসছে মাটির নীচে থেকে নয়, ওপরের দিক থেকে। মাথা তুলে দেখি আকাশময় অজস্র পাখির ঝাঁক— শিশুর কান্নার মতো ট্যাঁ ট্যাঁ করে ডেকে ডেকে চক্রাকারে উড়ছে মাথার ওপর অনেক উঁচুতে। সাদা ধূসর খয়েরি পাখির দল, বিলের গা ছুঁয়ে পাক খেয়ে উঠে পড়ছে আকাশে, ধোঁয়ার মতো কুণ্ডলী খুলে ছড়িয়ে পড়ছে চক্রবাল জুড়ে। এবারে বুঝতে পারি— বদ্ধ জলার ওপর জেগে-থাকা গাছের ডালে যে ধূসর বাদামি পাতার স্তূপ দেখেছিলাম দূর থেকে, সেগুলি এবার সজীব সাদা ফুল কিংবা তুলোবীজ হয়ে ফুটে উঠেছে, গাছগুলোকে আচমকাই নিষ্পত্র করে দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে ওরা, বৃত্তাকারে ঘুরে ফের ফিরে আসছে, কয়েকটি আবার দলে ভাগ হয়ে উড়ে চলে যাচ্ছে উত্তরের দিকে।

হুররে! নীহারদা চিৎকার করে উঠে ক্যামেরা বাগিয়ে ধরে বাঁধের ওপরদিকে ছোটে।

আমি দেখি, নকুল সর্দার মাটিতে জানু পেতে দুটো হাত উরুর ওপর রেখে আকাশে মুখ তুলে চেয়ে আছেন আজানের প্রার্থনার ভঙ্গিতে। ওঁর চোখের বিবর্ণ মণির ওপর উড়ন্ত পাখিদের ছায়া পড়েছে।

নিষ্পলক চেয়ে থাকেন নকুল, নিশ্চুপ, চোখের ওপর পাখির ছায়া আর ঘনিয়ে আসা অন্ধত্বের কালো ফোঁটাগুলো তফাৎ করতে পারেন না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চম অধ্যায়

বাঘমার্কা ডবলডেকার

বর্ষা শেষ হয়ে শরৎ এসেছে, বাতাসে উৎসবের গন্ধ। কলকাতার আকাশে আশ্বিনের অপরাহ্নের বর্ণময় মেঘ, তার মধ্যে দিয়ে চুঁইয়ে আসছে অদ্ভুত এক মায়াবী আলো, যে আলোয় সবকিছু সিপিয়া প্রিন্টের মতো দেখায়। গোলদিঘির জল সোনালি রাঙতার মতো হয়ে উঠেছে। খানিকক্ষণ আগে একদল খুদে সাঁতারু কলকল করতে করতে জল থেকে উঠে মায়েদের হাত ধরে বাড়ি ফিরে গিয়েছে। ওরা চলে যেতে ঝুপ করে চারপাশটা খুব চুপচাপ হয়ে পড়েছে। পুলের জলও স্থির হয়েছে, তাতে রঙিন মেঘের ছায়া।

ঠিক তখনই ঘটল ঘটনাটা।

মহাবোধি সোসাইটির দিকে পিঠ রেখে বেঞ্চিতে বসেছিলাম। মনটা ভালো ছিল না। কিছুক্ষণ আগে ইউনিভার্সিটির গেটে এক পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল অনেককাল পরে। একটা সময়ে আমার জীবনে অনেকখানি জায়গা জুড়েছিল সে ; বদলে গিয়েছে। একটা গাঢ় অবসাদ ছেয়ে আসছিল। একলা বসে গোলদিঘির জলে মেঘের ছায়া দেখছিলাম। স্থির স্বচ্ছ জল, জলে প্রতিফলিত আকাশ যে এমন মনের শুশ্রূষা হতে পারে সেটা এর আগে কখনো মনে হয়নি। এজন্যই কি আমাদের দেশে বিভিন্ন ল্যান্ডস্কেপশৈলীতে কুণ্ড অথবা জলাশয় অপরিহার্য ছিল ? কথাটা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ জলে ইউনিভার্সিটি সেনেট হলের ছায়া দেখতে পেলাম আমি। চোখ তুলতেই সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। দেখি কলেজ স্ট্রিটের রেলিং বরাবর দোকানগুলো নেই, রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট, আর তার ওপারে পরপর বাড়িগুলো: এক অনির্বচনীয় আলোয় ধোয়া ইউনিভার্সিটি বিল্ডিং, সেনেট হল, হেয়ার স্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজ— দু-চোখ জুড়ে বিখ্যাত সব স্থাপত্যের বিস্তার, গোলদিঘির এপার থেকে দেখা যাচ্ছে শিরীষ মেহগনির পাতার ফাঁক দিয়ে। ফুটপাথে হেঁটে যাচ্ছে গুটিকয় পথচারী, সকলেই পুরুষ, সকলেরই পরনে সাদা ধুতিপাঞ্জাবি, তাদের হাঁটার ভঙ্গিতে এক বিচিত্র শ্লথতা। একটা ট্রাম চলে গেল নিঃশব্দে, তার গায়ে লেখা— Peacock No. 1 Brandy; লাল শালু জড়ানো ঝাঁকা মাথায় হেঁটে গেল এক ফেরিওয়ালা, তার ধুতিটা হাঁটুর অনেক ওপরে তুলে পরা ; হ্যারিসন রোডের দিক থেকে খপখপ করে আসছে একটা ফিটন, ঘোড়া দুটো ছাইরঙের...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বপ্ন এত স্বচ্ছ হয় না কখনো, অনুভব করলাম আমার ইচ্ছাশক্তি কাজ করছে। যে বেঞ্চটায় বসে আছি, যার অন্যপ্রান্তে এইমাত্র এসে বসল যে মানুষটি, মুখ ফেরাবার অনেক আগেই তাকে চিনে ফেলেছি। তাই কোনো বিস্ময়বোধ নেই। চোখে চশমা, দাড়িতে পাক ধরেছে, হাতের শিরাগুলো দড়ির মতো মোটা।

নিজের এই ছবিটা খুব চেনা লাগছে কি তোমার? অনিলের মৃত্যুর পর একবার এই গোলদিঘির বেঞ্চে বসে তুমিও দেখেছিলে অবিকল এইরকম এক অচেনা ব্যক্তিকে। সাঁতারের ম্যাচের খবর জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি। তারপর পরিচয় হল গ্লোবট্রটার সুরেন্দ্রনাথ বসু মল্লিকের সঙ্গে। সেই কবে ছেলেবেলায় মনসাপোতা গ্রামে বসে বঙ্গবাসী পত্রিকায় পড়তে তাঁর বিলাত যাত্রীর চিঠি ; সে কী উত্তেজনা, মনে আছে? তুমিও তাঁর মতো বিশ্বপরিব্রাজন সেরে ফিরেছ— ফিজি সামোয়া তাহিতি... সেখান থেকে আরও দূর দূর দেশে। ফিরে এসেছ এক অচেনা কলকাতায়। তোমায় দেখার আগেই চিনে ফেলেছি আমি। আমিও প্রবীণ হয়েছি, দেখ, তোমারই বয়সি। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সূর্যটা ডুবে গিয়েছে আশুতোষ মিউজিয়ামের বেখাপ্পা চৌখুপি বাড়িটার আড়ালে ; ওখানেই সেনেট হলটা ছিল। আশ্বিনের বিকেলের সিপিয়া আলোয় যে বিভ্রম সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা হারিয়ে গিয়েছে। কলেজ স্ট্রিট ফিরে এসেছে স্বরূপে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাতাখোরদের ঠক জমবে এখানে। চল উঠি, কোথাও গিয়ে একটু মুখোমুখি বসি বরং।

সবকিছু বড়ো বেশি বদলে গিয়েছে মনে হচ্ছে কি? নাকি কিছুই বিশেষ বদলায়নি? কলকাতা শহরটা আরেকটু বুড়ি হয়েছে কি কেবল? এই দেখ, সেই মহাবোধি সোসাইটি। প্যারামাউন্ট শরবতের দোকান ডান হাতে রেখে আমরা গিয়ে উঠব মির্জাপুর স্ট্রিটে। সামনে ওই গলির মুখটা চেনা লাগছে না? কতকাল আগে এই শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের ভেতর বাসা বেঁধেছিল এক তরুণ গ্রাম্য দম্পতি। বড়ো বেদনার এই গলিপথ আমরা মাড়াব না। তার চেয়ে বরং চলো— সংস্কৃত কলেজের দিকটায় কয়েক পা গেলে একটা কফি হাউস আছে, সেই যেখানে অ্যালবার্ট হল ছিল। ওদিকেও যাব না আমরা। তার চেয়ে বরং এই রাস্তার পাশে তোমার প্রিয় সেই ফেবারিট কেবিন— দেখ, অবিকল একইরকম আছে। সেই কড়িবরগা, দেয়ালে মনীষীদের ছবি... তোমার পছন্দের এই চারনম্বর টেবিলটা নজরুলেরও প্রিয় ছিল। কল্লোলের লেখকেরা বসতো ঐ ভেতরের ঘরটায়। স্বদেশীরাও। বোসো, চা বলি। এখনি আড্ডার বন্ধুরা এসে পড়বে। চায়ের সঙ্গে টোস্ট নেবে? চিনি, নাকি মরিচ? এখানে আর কিছু পাওয়া যায় না এখনও। এখনও এখানে দু কাপ চা নিয়ে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দেওয়া যায়।

এই যে, এসে গিয়েছে। আলাপ করিয়ে দিই— অমল, বিমল, কমল এবং ইন্দ্রজিৎ।

হ্যাঁ, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা। বিশ্বরাজনীতি সাহিত্য সিনেমা নিয়ে...

এমনকি এই কলকাতা শহরটাকে নিয়েও।

শহরটা অনেক বদলে গিয়েছে। তুমি দেশ ছেড়ে চলে যাবার পর অনেক কিছু ঘটে গিয়েছে যে পরপর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হল। এদিকে তেতাল্লিশে মন্বন্তর, ছেচল্লিশে দাঙ্গা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাতচল্লিশে দেশভাগ... অনেক দেখেছে এই শহর, অনেক সয়েছে। এখানে বার বার আছড়ে পড়েছে বুভুক্ষু ভিটেহারা স্বজনহারা মানুষের ঢেউ। এখানে রাজপথে ফুটপাথে গলিতে রোয়াকে মানুষ মরেছে পোকামাকড়ের মতো।

শুধু মরেছে বোলো না। বেঁচেছেও। টিকে গিয়েছে। নিজেদের মতো করে গড়েপিটে নিয়েছে জীবন।

হ্যাঁ, সেইসঙ্গে এই কলকাতা শহরটাকেও ভেঙেছে গড়েছে।

সেই ইতিহাস তুমি দেখনি। সপ্তসিন্ধুপারের রোমান্টিক হাতছানিতে তুমি চলে গেলে অক্ষরের অপু। এসকেপিস্ট!

ছায়াছবির অপু কিন্তু ফিরে এসেছিল। প্রথমবার এসেছিল গ্লোব হাতে, আরেকবার গ্রাম্য নববধূর হাত ধরে ঘর বাঁধতে, তারপর ফিরল বালক পুত্রকে কাঁধে নিয়ে।

আর সেই ছায়াছবি চলল বিশ্ব জয় করতে। সেইসঙ্গে ইতিহাসের হাতে বার বার থাপ্পড়-খাওয়া মধ্যবিত্ত বাঙালি জাতির ইচ্ছাপূরণ ঘটল। আমাদের ভাঙা স্বপ্ন, পোড়ো ভিটে, আগলবিহীন ভাঙা দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা মায়াবী আলো হয়ে উঠল আন্তর্জাতিক। কান ভেনিস বার্লিন... লস এঞ্জেলেসে কোডাক থিয়েটারে সাড়ে তিনহাজার দর্শক দেখছে বিশাল পর্দা জুড়ে হরিহরের বিস্ফারিত চোখ। কাট! কাশীর ঘাটে আকাশ জুড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রা উড়ছে। ব্যাকগ্রাউন্ডে সর্বজয়ার গলা— কী হোলো! কী হোলো! আর তারপর সেই অসহ্য তারসানাই। ওওওফ!

কিন্তু কথা হচ্ছিল এই কলকাতা শহরটা নিয়ে। অপুর সংসারে সেই সিনটা মনে কর। কলকাতায় এসে অপু আর অপর্ণা বায়োস্কোপ দেখছে, একটা পৌরাণিক ছবি। পর্দা জুড়ে সেই ছবিটা, তারপর ফেডআউট করে যেতে যেতে ছ-আনার ছ্যাকরা গাড়ির পেছনে আয়তাকার ফোকর— অপু আর অপর্ণা বাসায় ফিরছে। ওই ফোকর দিয়ে ক্রমশ দূরে সরে যেতে থাকা শহরটা হয়ে উঠছে রুপোলি পর্দার দৃশ্যকল্প। এই ধূসর কলকাতা শহরটা সর্বাঙ্গে দারিদ্র্য আর ক্ষয়ের চিহ্ন নিয়ে এক আশ্চর্য মানবিক কাহিনির প্রেক্ষাপট হয়ে উঠছে, হয়ে উঠবে বার বার।

কিংবা মনে কর অপরাজিত ছবির সেই টপ শট— ধোঁয়ায় আবিল আকাশ, নীচে গোছা গোছা রেলের লাইন পাতা। তার ওপর দিয়ে মন্থর গতিতে এঁকেবেঁকে একটি ট্রেন এসে ঢুকছে শিয়ালদহ স্টেশনে। দরজায় এসে দাঁড়াল এক বিহ্বল কিশোর, বগলে বাক্স বেডিং। প্ল্যাটফর্মে জনস্রোতে একটি পলকা কাগজের নৌকোর মতো ভাসতে ভাসতে ব্যস্ত রাজপথে এসে পড়ল সে। মহানগর কলকাতা। জীবনে প্রথম এখানে আসার উত্তেজনায় রাতে ঘুম হয়নি তার। এখন পথের নামফলক দেখে একটি ঠিকানা খুঁজছে সে। উদগ্রীব কিশোর, ডাগর চোখ মেলে দেখেছে এক মলিন বিষণ্ণ শহর, জীর্ণ অট্টালিকার সারি, রোয়াকে বসে আছে অলস বৃদ্ধের দল, টিউবওয়েলে চান করছে বস্তির শিশুরা। মধ্য কলকাতার একটি গলির ভেতর পলেস্তারা খসা এক ছাপাখানার দোতলা ঘরে ঠাঁই পেল এই কিশোর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাপাখানার যান্ত্রিক শব্দ, টিউবওয়েলের গোঙানি, ছেঁড়া পর্দা দিয়ে ভেসে আসা শান্টিং ইয়ার্ডে ইঞ্জিনের কান-ফাটানো হুইশিল, শুয়োরের আর্তনাদ... এইসব শব্দ আর ছবি বুনে তুলছে এক কর্কশ নির্দয় শহরের পটভূমি, যেখানে এক গ্রাম্য কিশোরের স্বপ্ন, এক বেপরোয়া যুবকের কল্পনা বিচিত্র তীক্ষ্ণতায় বেজে ওঠে। তাই না?

হ্যাঁ, বেজে ওঠে আর হয়ে যায় একটা আশ্চর্য উপন্যাসের প্লট। একটি ছেলে, গ্রামের ছেলে, দরিদ্র কিন্তু সেনসিটিভ, বাপ পুরুত, মারা গেল, ছেলেটি শহরে এল, সে পুরুতগিরি করবে না, পড়বে, অ্যামবিশাস...

বাই দা ওয়ে, অপরাজিত আর অপুর সংসারে বেশিরভাগ নগরদৃশ্য কিন্তু তোলা হয়েছিল আউটডোরে। ইন্টারেস্টিং যেটা, উনিশশো পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে কুড়ি-তিরিশের কলকাতাকে অবিকল ফুটিয়ে তুলতে তেমন কোনো সমস্যা হয়নি। বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং, গাড়ির মডেল এইরকম দুয়েকটা খুঁটিনাটি ছাড়া দৃশ্যত শহরটা তেমন বদলায়নি। মাঝখানের কুড়ি-বাইশটা বছরের উত্তাল ইতিহাস সত্ত্বেও। সেই একই ভাঙাচোরা ধোঁয়ায় মলিন ঘরবাড়ি, সেই হাঁপানির শ্বাসটানা শব্দে গড়িয়ে-চলা ট্রাম, ফুটপাথে সেই সাদা পোশাকের জনস্রোত। কলকাতা শহরটা কীভাবে ক্যামেরার সামনে নিজেকে মেলে ধরবে তার সুর বেঁধে দিয়েছিলেন রায়সাহেব। বাকিটা ইতিহাস।

না, এটা ঠিক মানা যাচ্ছে না। তুমি পাশাপাশি ঋত্বিকের নাগরিক দেখ, কিংবা...

নাগরিকে আউটডোর কই?

কলকাতা একাত্তরের সেই শটটা, সেই রাস্তার ওপর ক্যামেরা বসিয়ে মৃণালদা...

দ্যাখ বাপু, কিপলিং থেকে গ্রাহাম লুইস, দমিনিক ল্যাপিয়ের থেকে গুন্টার গ্রাস— কঙ্কালসার ভিখারি, জঞ্জালের পাহাড়, ঔপনিবেশিক ঘরবাড়ি, রাজপথে অন্তহীন মিছিল আর শ্লোগান— এই শহরটা এক কুহকী দুঃস্বপ্ন হয়ে সাহেবদের লেখায় ছবিতে ফুটে উঠেছে বার বার, একই সঙ্গে সম্মোহন আর বিবমিষা সঞ্চার করেছে।

কিন্তু সত্তরের দশকে এসে কলকাতার কপালে পাকাপাকিভাবে সেঁটে বসল এক প্রান্তিক মুমূর্ষু শহরের ইমেজ।

না, মুমূর্ষু শহর কথাটা প্রথম বলেছিল রাজীব গান্ধী। ডায়িং সিটি! সেটা ছিল ছিয়াশি সাল।

ঠিকই, তবে সত্তরের দশকটা খুব কঠিন ছিল। সদ্যোজাত বাংলাদেশ থেকে বাস্তুহারার স্রোত, প্রকাশ্য রাস্তায় রাজনৈতিক হিংসা, এদিকে পুঁজি ছেড়ে চলে যাচ্ছে, কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আটাত্তরে বন্যা, লোডশেডিং, মেট্রো রেলের জন্য খোঁড়া পথঘাট... এক অন্তহীন দুর্দশার মুখচ্ছবি হয়ে উঠেছিল কলকাতা। আর এই ইমেজটা বদলে ফেলার জন্য শহরের কর্তামশাইয়েরা কিছুই করেনি।

না, উলটে বরং সেটাই করেছে যা রায়সাহেব করে গিয়েছেন তাঁর ছবিতে। বলতে পার, এই মালিন্য আর ক্ষয়ের চিহ্নগুলোকে ডীপ ফোকাসে ফুটিয়ে তুলেছে, যাতে তার মানবিক সুরটা গভীর তীক্ষ্ণতায় বেজে ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটা ঠিক বোঝা গেল না...

আচ্ছা, একটা উদাহরণ দিই। আশির দশকের গোড়ায় পত্রপত্রিকায় আকছার দেখা যেত কর্পোরেশনের একটা বিজ্ঞাপন— একটি উলঙ্গ শিশু শহরের ব্যস্ত রাজপথ পার হচ্ছে, আর সেই ছবিটার ওপর সুপারইম্পোজ করা নীরেন চক্কোত্তির কলকাতার যীশু কবিতাটা। লালবাতির নিষেধ ছিল না, তবু... তারপর যেন কী?

আমি বলছি—

লালবাতির নিষেধ ছিল না,
তবুও ঝড়ের-বেগে-ধাবমান কলকাতা শহর
অতর্কিতে থেমে গেল;
ভয়ংকরভাবে টাল সামলে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল
ট্যাক্সি ও প্রাইভেট, টেম্পো, বাঘমার্কা ডবলডেকার।
'গেল গেল' আর্তনাদে রাস্তার দুদিক থেকে যারা
ছুটে এসেছিল—
ঝাঁকামুটে, ফিরিওয়ালা, দোকানি ও খরিদ্দার—
এখন তারাও যেন স্থির চিত্রটির মধ্যে শিল্পীর ইজেলে
লগ্ন হয়ে আছে।
স্তব্ধ হয়ে সবাই দেখছে,
টালমাটাল পায়ে
রাস্তার এক পার থেকে অন্য পারে হেঁটে চলে যায়
সম্পূর্ণ উলঙ্গ এক শিশু।
খানিক আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে চৌরঙ্গীপাড়ায়।
এখন রোদ্দুর ফের অতিদীর্ঘ বল্লমের মতো
মেঘের হৃৎপিণ্ড ফুঁড়ে
নেমে আসছে;
মায়াবী আলোয় ভাসছে কলকাতা শহর।
স্টেট বাসের জানলায় মুখ রেখে
একবার আকাশ দেখি, একবার তোমাকে।
ভিখারি-মায়ের শিশু,
কলকাতার যীশু,
সমস্ত ট্রাফিক তুমি মন্ত্রবলে থামিয়ে দিয়েছ।
জনতার আর্তনাদ, অসহিষ্ণু ড্রাইভারের দাঁতের ঘষটানি,
কিছুতে ভ্রুক্ষেপ নেই;
দুদিকে উদ্যত মৃত্যু, তুমি তার মাঝখান দিয়ে
টলতে টলতে হেঁটে যাও।
যেন মূর্ত মানবতা, সদ্য হাঁটতে শেখার আনন্দে
সমগ্র বিশ্বকে তুমি পেতে চাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতের মুঠোয়। যেন তাই
টালমাটাল পায়ে তুমি
পৃথিবীর এক কিনার থেকে অন্য কিনারে চলেছ।

থ্যাঙ্ক ইউ। বিজ্ঞাপনটার মাথায় থাকত একটি লাইন— কলকাতা, তুমি কার? জাস্ট ভাবো— মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, যার প্রধান কাজ কিনা নাগরিক পরিষেবা আর উন্নয়ন, তাদের দেওয়া বিজ্ঞাপন। দেখলে অ্যাপারেন্টলি কী মনে হবে?

কী মনে হবে?

মনে হবে, যে হতশ্রী খিন্ন দুর্দশার রূপকল্প কলকাতার মুখে এঁটে বসেছে, যেন সেটি ছাড়া আর কোনো মুখচ্ছবি নেই এই নিঃস্ব শহরের। যেন সেই ইমেজটাকে বিচিত্র আত্মশ্লাঘার সঙ্গে মেলে ধরছে সে, যেন কলার তুলে বলছে— হ্যাঁ, এই দেখ, উলঙ্গ গৃহহীন শিশুরা হেঁটে বেড়ায় আমার বুকের ওপর। কিন্তু কী সুতীব্র মানবতা আর কবিতায় স্পন্দিত আমার রাজপথ, দেখ দেখ!

কলকাতার ঠিক এই ছবিটা গুন্টার গ্রাস দমিনিক ল্যাপিয়েরদের হাত ধরে সেই সময় খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তখন, বিশেষ করে পশ্চিমী পর্যটকদের চোখে। শহরের দুই তুমুল আন্তর্জাতিক ম্যাসকট। কে কে বল দিকি?

সত্যজিৎ আর রবীন্দ্রনাথ?

উঁহু, হল না। আচ্ছা, হিন্ট দিচ্ছি। দুজনেই নারী, একজন প্রাণদায়িনী আরেকজন প্রাণনাশিনী।

উমমমম...

মা টেরিজা আর মা কালী!

হা হা হা হা! আরেক রাউন্ড চা হয়ে যাক।

তো এই ছিল শহর কলকাতা। এই কলকাতাকে তুমি সহজে চিনতে পার, অপু। এরপর একটা জাম্পকাট নেওয়া যাক। সন ১৯৯০, কলকাতা পত্তনের তিনশো বছর উদযাপন। ঘোড়ায় টানা ঔপনিবেশিক ট্রামে চড়ে বসলেন কমরেড বসু। তার পরের বছর দেশে আর্থিক উদারীকরণ নীতি চালু হবে, আর তারও চার বছর পরে রাজ্যে নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করবে তাঁর সরকার, বিদেশি পুঁজিবিনিয়োগকে স্বাগত জানাবে। কলকাতা নিজের মুখচ্ছবি দেখতে শুরু করবে এক নতুন আয়নায়।

কমরেড বসু ফি-বছর লন্ডনে যেতে শুরু করলেন।

না, সেটা তিনি আগেও যেতেন। এইবার খোদ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজর একদল শিল্পপতিকে নিয়ে কলকাতায় এল। এ যেন অনেকটা সেই তিনশো বছর আগের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অ্যাকশন রিপ্লে। মেজরকে রাজকীয় অভ্যর্থনা দিয়েছিল এই শহর, যাত্রাপথের দুপাশে বস্তিতে পুলিশ নামিয়ে কার্ফিউ জারি হয়েছিল, যাতে কেউ পথে না নেমে আসে।

সত্যি নাকি?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খবরটা কাগজে বেরিয়েছিল সেইসময়, মিলিয়ে নিতে পার।

ওয়ান্স আ ট্রাজেডি, টোয়াইস আ ফার্স!

আসলে কলকাতা তখন নিজের মুখ দেখতে শুরু করেছে একটি নতুন আয়নায়। এক কন্ত্রোলিনী তিলোত্তমার মুখ দেখতে চাইছিল সে। বদলে কী দেখল?

কী দেখল?

দেখল এক কাগজকুড়ুনি জটাবুড়ির মুখ। মুখভর্তি বলিরেখা, ডুমো ডুমো আঁচিল, আঁচিলের ওপর লোম। এবার তাকে চড়া মেকাপ দেবার তোড়জোড় শুরু হল। দেশের অন্য শহরের সঙ্গে বিদেশি পুঁজি টানার প্রতিযোগিতায় নামতে হবে তো, র‍্যাম্পে হাঁটতে হবে।

মাইরি একটা ছবি চোখে ভাসছে। হি হি! সোনাগাছির অন্ধকার গলির মুখে বুড়ি পতিতা, হাতে-ধরা কেরোসিন লম্ফয় রংলেপা মুখটুকু শুধু আলোকিত।

নতুন মুখ্যমন্ত্রী আদ্যিকালের টানা রিকশাকে নির্বাসন দিতে চাইলেন, কারণ তা অতিথিদের চোখকে পীড়া দেয়। বিরোধী দলের মেয়র, যিনি এখন মন্ত্রী, দশ কোটি টাকার একটি গেটওয়ে অব কলকাতা বানাতে চাইলেন আইফেল টাওয়ারের ধাঁচে। কোনোটিই শেষপর্যন্ত হয়নি অবশ্য। তবে নিউমার্কেটে মাটির নীচে চৌত্রিশ কোটি টাকার একটা কারপার্ক হল, দেশের মধ্যে প্রথম। এছাড়া কলকাতা অনেকগুলো ফ্লাইওভার পেল এইসময়।

তার মধ্যে সবচেয়ে লম্বা যেটা— পার্কসার্কাস থেকে রেসকোর্স— এয়ারপোর্ট থেকে সোজা ইএম বাইপাস দিয়ে অতীব দ্রুততায় শহরের হৃৎপিণ্ডে কিংবা পাঁচতারা তাজবেঙ্গলে পৌঁছে দেয়। ফ্লাইওভার আর বাইপাস— শহরের খিন্ন পরিত্যাজ্য অঞ্চলের ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া, পাশ কাটিয়ে যাওয়া। আধুনিক নগরায়নের প্লাস্টিক সার্জারি বলতে পার।

পাশাপাশি বস্তি উচ্ছেদ। টালি নালা, গোবিন্দপুর...

শুধু তাই না, শহরে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর চরিত্র দ্রুত বদলে যাচ্ছে এইসময়। বিশেষ করে মধ্য আর উত্তর কলকাতায় তিন চার পুরুষের বাসিন্দা নিম্নআয়ের মানুষেরা বাস উঠিয়ে চলে যাচ্ছে। অর্ধেকেরও বেশি ওয়ার্ডে জনসংখ্যা কমছে।

আশির দশকে কর্পোরেশনের সেই বিজ্ঞাপনে একটা প্রশ্ন ছিল— কলকাতা, তুমি কার? এতদিনে উত্তরটা জানা গেল।

পথশিশুদের সংখ্যা কিন্তু বাড়ছিল। জোকার আইআইএম থেকে একটা সমীক্ষা করেছিল, তাতে...

শুরু হল রিয়েল এস্টেট বুম!

তাতে ছিল, কলকাতায় অর্ধেকেরও বেশি শিশু-কিশোর ইস্কুলে যায় না।

রিয়েল এস্টেট শপিং মল মাল্টিপ্লেক্স ক্লাব-ক্লাস স্কুল আর্ট গ্যালারি রেস্টুরেন্ট বুটিক নাট্যশালা...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিক্সথ পে কমিশন...

এতদিনে কলকাতা জানল সে কার।

টালি নালার ধারে কুড়ি হাজার আর...

একটা নতুন সচ্ছল সোচ্চার মধ্যবিত্ত সমাজ, কয়েকটা টিভি নিউজ চ্যানেল...

গোবিন্দপুর রেলকলোনিতে আরও প্রায় তিরিশ হাজার।

একদল নাটুয়া পটুয়া মাস্টার কবিয়াল...

শহরে হাজারখানেক সরকারি প্রাথমিক স্কুলের মধ্যে বত্রিশটিতে মিড-ডে মিল দেওয়া হয়, আইআইএম রিপোর্টে বলছে।

টেম্পল স্ট্রিটে একটা স্কুলে রান্নাঘর নেই বলে পড়ুয়াদের রোজ সিঙাড়া আর জিলিপি... বালাহার!

হা! হা! হা! হা!

একটা সুশীল সমাজ!

একটা লম্বা প্যানশট, শুরুতে লন্ডন থেকে জন মেজর আসছে দলবল নিয়ে...

কলকাতা, তুমি কার?

তারপর একদিন কলকাতা শহরটাই লন্ডন হয়ে গেল!

হা! হা! হা! হা!

হা! হা! হা! হা! হা! হা!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফাইবারগ্লাসের দুর্গা

চায়ের বাষ্প আর সিগারেটের ধোঁয়ায় জড়িয়ে যাওয়া কথার রাশি, ফেবারিট কেবিনের ঘুপচি ঘরে পাক খেয়ে উঠে দপদপ করে মাথার ভেতর, কুরে খায় যেন কড়িবরগার ভেতরে ঘুনপোকা। চলো, বাইরে খোলা আকাশের নীচে হাঁটি, দিনের আলো ফুরিয়ে যাবার আগে, এই শহরের চেনা গলিপথে। পুরোনো এই পাড়ায় কিছুকাল আগেও অনেক আদ্যিকেলে ছাপাখানা ছিল, ট্রেডল মেশিনের শব্দ আর ছাপার কালির কড়া গন্ধ, যা তুমি কলকাতা শহরে এসে জেনেছিলে। তারপরে একদিন এল কম্পিউটার, ডেস্কটপ প্রিন্টিং। কয়েক হাজার কর্মী নিঃশব্দে হারিয়ে গেল, জানো, কোনোরকম পুনর্বাসন ছাড়াই, আমাদের সোচ্চার প্রতিবাদী চিন্তার ঠিকানা এই কলেজস্ট্রিট পাড়া থেকে। কেউ জানে না তারা কোথায় গেল, সেইসব কম্পোজিটর আর মেশিনবয়রা কোথায় রয়েছে এখন। তবে সেই দপ্তরি বাঁধাইকাররা আজও আছে। ওই দেখ, গলির পেটে তস্য গলির একতলার নীচু ঘরে ফর্মা ভাঁজ করে চলেছে তুঁতে-মেশানো ময়দার আঠা জাল দেবার গন্ধে ভারি হয়ে আছে বাতাস। সরু গলিতে নীরব জনস্রোত হেঁটে যাচ্ছে যেন ঘুনপোকার সারি। নিম্ন আয়ের মানুষ, দূরদূরান্ত থেকে রোজ আসে, শহরের খাঁজে-ভাঁজে রুটিরুজি খুঁটে নেয়, বাস মেট্রোর ভাড়া বাঁচিয়ে এইসব গলিপথ দিয়ে শর্টকাট করে ফিরে যায়। এখন ফিরতি লোকাল ট্রেন ধরার তাড়া, সন্ধ্যার অনেক পরে গিয়ে পৌঁছবে কোনো অবসন্ন ঝিঁঝি-ডাকা স্টেশনে।

মধ্য কলকাতার এই গলির জগৎ বুঝি এত বছরেও বদলায়নি কিছুই। উনিশ শতকের মুৎসুদ্দি বেনেদের উঁচু উঁচু ইমারত, পলেস্তারাখসা, গায়ে সাঁটা কর্পোরেশনের বিপজ্জনক বাড়ির নোটিশ, গরাদবিহীন রেলিঙে মেলে-দেওয়া শাড়ি, টবে নয়নতারা, বদরী পাখির খাঁচা, কচি কণ্ঠে গলা-সাধা ধ্বনি, সিংহের মুখওয়ালা ঢালাই লোহার কল, কলহের রোজনামচা, রোয়াকে মুদির দোকান, টিনের বোর্ডে ফিকে হয়ে আসা জবাকুসুমের এলোকেশী, সর্ষের খোল আর ভেলিগুড়ের মিশ্র গন্ধ... এইসব তোমার যেন কবেকার চেনা, যেন সামনে বাঁক ঘুরলে এখনি দেখতে পাবে গ্যাসপোস্টের নীচে সেই ছিপছিপে চেহারার পাড়াগেঁয়ে যুবকটিকে, কলকাতা শহরে তোমার শেষদিন যাকে দেখেছিলে। সেই মুখচোরা নির্বোধ ক্ষুধাশীর্ণ মুখ, যা তুমি আজও ভোলোনি।

গলি ছেড়ে উঠে এস ব্যস্ত রাজপথে, এখানে একটু স্নিগ্ধ পলকা হাওয়া এখন ট্রাফিকের জট পোড়া ডিজেলের ধোঁয়া ঠেলে বয়ে আসছে পশ্চিমের থেকে। ক্ষয়াটে ছাতিম গাছে পাতাগুলো কেমন কাঁপছে, দেখ। ওইদিকে নদী, যার পাড়ে বসে কতকাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি এমন অপরূপ শরতের সূর্যাস্ত দেখেছ। নদীটা মজে এসেছে, জানো, এখন আর সপ্তসিন্ধুপারের দেশ থেকে বড়ো বড়ো জাহাজ আসে না, কলেজের ক্লাস-ফাঁকি-দেওয়া তরুণের বিলাতযাত্রার স্বপ্ন রচিত হয় না। ওদিকে যাব না, বরং এই ফুটপাথেই দুদণ্ড দাঁড়িয়ে রাস্তার ওপারে ব্যান্ডবাদকদের দেখি এস। রুখুসুখু বৃদ্ধদের ওই দলটা, জমকালো জরির সাজে হারিয়ে গিয়েছে পতঙ্গের মতো, কেবল টুপির নীচে ভাঙাচোরা মুখ আর টায়ারের চটির ফাঁকে খড়িওঠা পায়ের পাতা দেখা যাচ্ছে। দেহভঙ্গিতে চাপা উত্তেজনা: ইনকাম হবে, হয়তো ইনাম ভি, সাথমে নাস্তাপানি। দলনেতা স্যাক্সোফোনে সুর ভাঁজছে— আজ মেরি ইয়ার কি শাদি হ্যায়... তোবড়ানো গাল হাপরের মতো ফুলে উঠছে চুপসে যাচ্ছে, বরাত নিকল্‌বে সাত বাজে। এখনও আকাশের কপালে লেগে আছে লালচে আলোর গুঁড়ো, যা ডানায় মেখে নিয়ে চক্রাকারে উড়ছে দুটো চিল, ওই যে হাওড়া ব্রিজের শিরে, যে দৃশ্য দেখবে বলে কাটরা মঞ্জিলের রাজস্থানী ঝুলবারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে এক নারী, যেন মিনিয়েচারের ছবি, তার বাজুতে ভারি কঙ্গনপলা, ফিরোজা রঙের চুন্নী মাথার পিছনে ঠেলে তাকিয়ে রয়েছে নির্নিমেষ।

এবার ব্যান্ড-বাজাদের কেরোসিনের ঝাড়বাতিগুলো জ্বলে উঠেছে। সন্ধ্যা নামছে কলকাতার ফুটপাথে, আলোআঁধারির ভেতর জেগে উঠছে আরেকটা কলকাতা। বালতির উনুনে রান্না চেপেছে, পিচবোর্ডের বিছানায় ঘুম ভেঙে জেগে উঠছে শিশু, হাইড্রেন্টের ধারে বসে সাবান মেখে চান করছে একদল পুরুষ। আরেকটা দল এইমাত্র ফিরে এল অবসন্ন, হাতে হাতুড়ি-ছেনি-কর্নিক, করাত-বাটালি, রেঞ্চ-কল-পাইপের টুকরো। অভুক্ত ম্লান মুখে বসে আছে ওরা, কেউ কেউ ফুটপাথে শুয়ে পড়ছে চট বিছিয়ে।

এদের চিনতে পার কি অপু? সেই কতকাল ধরে দেখা যায় হ্যারিসন রোড আর সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ-এর মোড়ে, ফুটপাথে রোজ সকালবেলায় এসে বসে ওরা, অপেক্ষা করে— রাজমিস্ত্রি, ছুতোর, কলের মিস্ত্রি, বাড়ি ভাঙার সান্তারাস— দুই হাঁটুর ফাঁকে যন্ত্রপাতিগুলো দেখে চেনা যায়। ঠিকাদারেরা এসে দরদাম করে নিয়ে যায় এদিক সেদিক। আজ এরা কেউ কাজ পায়নি, কেবল পেয়েছে সান্তারাসরা। কাজ সেরে এসে মহা ফুর্তিতে হাইড্রেন্টের জলে চান করছে তাই, এরপর খাবে। ফুটের হোটেলে ভাতের ডেক চেপেছে। সান্তারাসরা আজকাল রোজ কাজ পায়। ঠিকাদারের লোক এসে ট্রাকে চাপিয়ে নিয়ে যায় শহরের বিভিন্ন প্রান্তে। চারিদিকে পুরোনো বাড়ি ভেঙে ফেলা হচ্ছে, কাজের অভাব নেই সান্তারাসের। হয়তো কাল সকালে ওই রাজমিস্ত্রি কাঠের মিস্ত্রিরাও কর্নিক করাত রেঞ্চ বাঁধা রেখে শাবল গাঁইতি নিয়ে বসবে মোড়ের মাথায়।

কিন্তু আজ সামনে এই দীর্ঘ রাতটা কী করবে? এতগুলো ভুখা পেট শহরটাকে মন্ত্রবলে থামিয়ে দিতে পারে না তো? এরা কেউ কলকাতার যীশু নয়।

পেটে খিদে, চোখে ঘুম নেই। তবু হাতের ভাঁজে মাথা রেখে শুয়ে পড়া, খিদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে যদি টু-কি দিয়ে ঘুমের কানাগলিতে লুকিয়ে পড়া যায়। না হয় শেষ রাতে ঘুম ভাঙবে যখন খিদের ইঁদুরগুলো কুটকুট করে কাটবে নাড়িভুঁড়ি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেগে উঠে দুই হাঁটুর ফাঁকে মাথা রেখে বসে থাকবে আশ্বিনের শিশিরে ভেজা দেহগুলো, অপেক্ষা করবে আরেকটা ভোরের। আপাতত কনুইয়ে মাথা রেখে নিথর শুয়ে থাকা, মাটির নীচে থেকে উঠে আসা গুমগুম শব্দ শুনে যাওয়া। শহর জুড়ে ভাঙা হচ্ছে বাড়ি, আকাশে ওই টকটকে লাল রং প্রকৃতপ্রস্তাবে ইটের ধুলো। ইতিহাসের গুঁড়ো বাতাসে ভেসে ভেসে সূর্যাস্তকে কেমন অপরূপ রাঙিয়ে তুলেছে, দেখ।

সেই রাঙা আভায় উদ্ভাসিত তোমার মুখে গাঢ় বেদনার রেখা, তুমি চেয়ে আছ রাস্তার ওপারে আলো-ঝলমল পোশাকের দোকানে, কাচের শোকেসে ফাইবারগ্লাসের ম্যানিকুইনটির দিকে: শ্যামলা রং, অতীব তন্বী, বালকের মতো নিতম্ব আর অপুষ্ট বুকের অভাস। প্রগাঢ় লাস্যের ভঙ্গিমায় কোমরে হাত রেখে কাঁধ বাঁকিয়ে থুতুনি ওপরে তুলে সে সরাসরি চেয়ে আছে পথচারীদের দিকে; যেন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে— এস, আমাকে নাও! ওর পরনে মিনিস্কার্ট হ্রস্ব টপ, হনু ঠেলে ওঠা চিবুক, ঠোঁটদুটো ক্ষতের মতো, সামান্য খোলা। দেখে মনে হচ্ছে বুঝি অনেকগুলো মন্বন্তর পেরিয়ে এসেছে? এটাই এখন ফ্যাশন অপু, রূপের নতুন সংজ্ঞা, উদ্ধত যৌনতা! তুমি চেয়ে আছ স্থির, তোমার চোখের কোণে চিকচিক করছে জল, তোমার মনে পড়ে যাচ্ছে সেই মেয়েটির কথা, সেই যে দাঁড়িয়েছিল বুড়ো জামগাছটার তলায়, তুমি বাবা-মায়ের সঙ্গে জীবনে প্রথম চলন্ত ট্রেনের জানলা থেকে দেখেছিলে, সেই মেয়ে আসেনি, যাকে তুমি এতকাল বয়ে বেড়াচ্ছ তাবিজের মতো।

স্মৃতির মরণফাঁদ খোঁড়া আছে এই শহরের রাস্তায়, সাবধানে পা ফেলো।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেলনা রেলের স্টেশন

স্থিরপাড়ায় যাবার বেশ কয়েক বছর পরে একবার কৃষ্ণনগরে গিয়েছিলাম একটি কাজে। ততদিনে শহরটার সঙ্গে আমার একটি ক্ষীণ যোগসূত্র টিকে আছে মূলত উৎপলের সুবাদে। আসার খবর পেয়ে আমায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল শহরের উপান্তে ওর বাসায়। সাত বছর ধরে এখানে নিয়মিত যাতায়াত করেছি, আগে কোনোদিন এদিকটায় আসিনি। কিন্তু জায়গাটা দেখে খুব চেনা লেগেছিল আমার। পরে মনে পড়েছিল।

অপর্ণার মৃত্যুর পর চাঁপদানির কাছে গ্রাম্য ইস্কুলে মাস্টারি নিয়ে তুমি চলে গিয়েছিলে, মনে আছে অপু? অবিকল যেন সেইরকম— না-শহর না-গ্রাম, টিনের চালাওয়ালা খানকতক দোকানঘর, ইটখোলা, ধানখেত, পাটের গাঁটবন্দি কল। এমনকি তোমার সেই বাসার মতো উঠোনের পাশ দিয়ে ন্যারোগেজ রেলের লাইন চলে গিয়েছে শান্তিপুর থেকে নবদ্বীপঘাট। মনে পড়ে, দাওয়ায় বসে তুমি রাতের শেষ ছোট্ট মার্টিনের ট্রেন চলে যাওয়া দেখতে? তারপরেই অন্ধকারে ঘন হয়ে আসত নিঃসঙ্গ ঝিঁঝিপোকার ডাক। পেতলের থালায় রাতের খাবার তেলেভাজা পরোটা দিয়ে যেত বামুনঠাকুর। অপর্ণা নেই, লীলার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। কলকাতা তোমার কাছে বিস্বাদ হয়ে গিয়েছে তখন। জীবনের এক সন্ধিক্ষণে এসে গভীর নৈরাশ্য আর অবসাদের পাঁকে মজে যাচ্ছ তুমি, সামনে কুলিবস্তির পুকুরে মহিষগুলোর মতো। ঠিকানা খুঁজে এসে তোমায় এভাবে দেখে বিস্মিত হয়েছিল বন্ধু প্রণব। কলেজ জীবনের সেই উজ্জ্বল উচ্চাশী রোমান্টিক অপুকে খুঁজে পায়নি সে।

সেবার কৃষ্ণনগরে এসে উৎপলের মুখে নিরাশ নির্লিপ্তি দেখে আমিও অবাক হয়েছিলাম, কয়েক বছর আগের সেই প্রাণবন্ত তরুণকে খুঁজে পাইনি। আরও অবাক হয়েছিলাম ওর চারপাশ দেখে। একটি একতলা টিনের ঘরে মেস করে থাকছিল সে দুই পুরোনো সহপাঠীর সঙ্গে। মতিন ইসলাম আর বিশু হেমব্রম— দুজনেই কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজ থেকে যথাক্রমে সংস্কৃত আর ফিলজফিতে অনার্স নিয়ে পাস করেছে। মতিনের বাড়ি উৎপলের পাশের গ্রামে, বিশুর বাবা আসনসোলে কোলিয়ারিতে কাজ করেন।

একদিক থেকে দেখলে ব্যাপারটা এক চমকপ্রদ সামাজিক বিপ্লব মনে হতে পারে; একজন মুসলমান, আরেকজন সাঁওতাল— সংস্কৃত আর দর্শনশাস্ত্রের মতো দুটি ঘোর একদা-ব্রাহ্মণ্য বিষয় নিয়ে পড়ে ডিগ্রি অর্জন করেছে। কিন্তু বদলির চাকরির সুবাদে অনেক ঘাটের জল খেয়ে ততদিনে আমি জেনে গিয়েছি এর প্রকৃত কারণ। প্রথমত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বত্রই চাহিদার তুলনায় এই বিষয়গুলো বেশ নীচের দিকে থাকে, তাই বিশু বা মতিনের মতো কম নম্বর পাওয়া পড়ুয়ারা অনার্স কোর্সে ভর্তির সুযোগ পায়। দ্বিতীয় এবং মূল কারণটি হল, দুটিই স্কুল সার্ভিস কমিশনে স্বীকৃত বিষয়। বিশু বা মতিনদের মতো, বলা যেতে পারে এ রাজ্যে শতকরা নিরানব্বই দশমিক নয় ভাগ কলেজে পড়তে আসা ছেলেমেয়ের উচ্চাশার শীর্ষবিন্দু হল স্কুল সার্ভিস কমিশন মারফৎ শিক্ষকতার চাকরি। বাস্তব পরিস্থিতি যা, তাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু এর সঙ্গে পঠিত বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ বা অনুরোগের কোনো সম্পর্ক নেই। সস্তা মেড-ইজি আর প্রাইভেট টিউটরের নোটের ভেলায় চেপে পরীক্ষার বৈতরণী পার হয়েছে, এখন আরেকপ্রস্থ মেড-ইজি আর নোটপর্ব চলেছে স্কুল সার্ভিস পরীক্ষার শিকে ছেঁড়ার জন্য।

এর আগে বেশ কয়েকবার পরীক্ষায় বসেছে ওরা, বয়সের উচ্চসীমা এগিয়ে আসছে ক্রমশ। এদিকে প্রতি বছর কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হচ্ছে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে, প্রতিযোগিতা কঠিন হয়ে উঠছে দিন দিন। বিকল্প কর্মসংস্থান কিছু নেই। সম্প্রতি সরকারি প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষক নেবার জন্য পরীক্ষা হয়েছিল, পঁয়ত্রিশ হাজার পদের জন্য আবেদনকারী ছিল আটচল্লিশ লক্ষ। দূরদূরান্তে পরীক্ষাকেন্দ্রে যাবার জন্য কেমন হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল, কীভাবে বাসে ট্রেনে বাদুড়ঝোলা হয়ে, এমনকি ট্রাক ভাড়া করে অনেকে পরীক্ষা দিতে গিয়েছিল, তার সরস বর্ণনা দিচ্ছিল মতিন। কৃষ্ণনগর থেকে বেথুয়াডহরি যাবার পথে ভিড়ের চাপে বাসের ছাত থেকে পড়ে আহত হয়েছিল কয়েকজন। মেসের ঘরে বসে ওদের মুখে সেই গল্প শুনতে শুনতে মনের চোখে ভেসে উঠছিল দেশভাগের ট্রেনে ট্রাকে বোঝাই ছিন্নমূল মানুষের সাদাকালো বেদনাময় ছবি।

কিন্তু ওদের মুখে কোনো বেদনার রেশ ছিল না, বরং ফুটে উঠেছিল এক বিচিত্র রগড়।

অন্য কোনো চাকরির চেষ্টা দেখছ না? জিজ্ঞেস করেছিলাম।

অন্য চাকরি? উৎপল হেসে উঠেছিল। কিছুদিন আগে পিএসসি থেকে চার হাজার শূন্য সরকারি পদে লোক নেবার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। সব গ্রুপ ডি পোস্ট, কোয়ালিফিকেশান ছিল এইট পাস। পিওন, আর্দালি, নাইটগার্ড, দারোয়ান... এইসব আর কি। অ্যাপ্লিক্যান্ট কত ছিল বলুন তো?

কত?

এগারো লাখ!

কতজন ইঞ্জিনিয়ার ছিল সেইটা বল? বিশু বলেছিল।

আর কতজন ডক্টরেট? মতিন যোগ করেছিল।

ওরা তিনজনেই হাসছিল। আবছায়ার ভেতর মুখগুলো ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না, দাঁতগুলো চিকচিক করছিল কেবল।

বাইরে দিন ফুরিয়ে আসছিল, ঘরের ভেতরে জমে উঠেছিল ছায়া। অপরিসর ঘরে তিনটি তক্তপোশ, ময়লা চাদর পাতা। তার ওপরে ডাঁই করা নোটবই, খবরের কাগজ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাকরি সংক্রান্ত পত্রপত্রিকা। দেয়ালে গোটানো মশারি, দড়িতে জামাকাপড়, মেঝের কোনে পোড়া বিড়ির টুকরো। বাইরে একচিলতে ঘেরা বারান্দায় এঁটো বাসন, কেরোসিন স্টোভ, আরশোলা ঘুরছে, একটা চিমসানো গন্ধ।

আমার মনে পড়েছিল ময়ূরভঞ্জের হুড়িশাহী গ্রামের আমিন বানারার কথা, সেই যাকে হায়দরাবাদের ইটভাটায় কাজ করতে নিয়ে গিয়ে প্রতারিত করেছিল ঠিকাদার। তরুণ বয়সেই দুর্দশাকে মুখ বুজে হজম করতে, তার সাধারণীকরণ করতে শিখে গিয়েছিল আমিন। রাগ করতে শেখেনি। যেখানে প্রাণধারণের ন্যূনতম ব্যবস্থা করতেই সমস্ত শক্তি নিংড়ে বেরিয়ে যায়, সেখানে বোধহয় রাগ একটি বিলাসিতা, তা সে শিমলিপালের জঙ্গলেই হোক কিংবা কৃষ্ণনগরের প্রান্তিক পাড়ায়। তিনটি বছর উচ্চশিক্ষা নামক এক যান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে প্রশ্নহীন আপস করতে করতে রাগ করতে পারার ক্ষমতাটাই মরে যায় বোধহয়।

কে জানে।

বাইরে বেরিয়ে এলাম যখন সন্ধ্যা নেমেছে। কুলিবস্তির ধারে কাঁচা কয়লার স্তূপে আগুন জ্বলছে, তার দাউ দাউ শিখা নাচছে নয়ানজুলির কালো জলে। আমায় বাসরাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে আসছিল উৎপল, কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতায় ফেরার লোকাল ট্রেন ধরব। কিছুদূর এসে উৎপল হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে ঘড়ির দিকে তাকাল।

একটা কাজ করবেন? ট্রেনে চেপে স্টেশনে যাবেন?

তার মানে? আমি অবাক হয়েছিলাম।

ছোটো ট্রেনটা এইসময় নবদ্বীপঘাট থেকে ফেরে, শান্তিপুর চলে যায়। আপনি কৃষ্ণনগর স্টেশনে নেমে যেতে পারবেন। যাবেন? বাস কিংবা ট্রেকারের থেকেও তাড়াতাড়ি আর আরামে পৌঁছে যাবেন।

এখানে আসার সময় ঘরবাড়ির ফাঁকে ন্যারোগেজের রেললাইনটা চেখে পড়েছে বটে, কিন্তু ওই লাইন দিয়ে যে এখনও সত্যিই ট্রেন চলাচল করে সেটা মনে ছিল না। নবদ্বীপের ঘাটে যাবার রাস্তার পাশেই ছোট্ট খেলনার মতো রেলের স্টেশন আমঘাটা। নীচু একতলা লাল ইটের বাড়িটা পরিচর্যার অভাবে জীর্ণ হয়েছে, কিন্তু ব্রিটিশ আমলের সেই পিকচার পোস্টকার্ড স্থাপত্য অটুট আছে। ঘন জালে ঢাকা টিকিটঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে ভেতরটা দেখা যায় না, কিন্তু টাকা গুনে নিয়ে খুটুং শব্দে টিকিট পাঞ্চ করে দেয় একটি হাত, কব্জিতে লাল তাগায় বাঁধা রুদ্রাক্ষ। প্ল্যাটফর্মটা লাইন থেকে চার আঙুল উঁচু, একপাশে জ্বালানি কাঠ চ্যালা করে শুকোতে দেওয়া হয়েছে। ছাউনির নীচে অন্ধকারে এক উলঙ্গ পাগলি একরাশ ছেঁড়া ন্যাকড়াকানি জড়ো করে সংসার পেতেছে। আমরা ছাড়া আর কোনো যাত্রী নেই।

সন্ধ্যার নীলাভ ছায়ায় রেললাইনের ওপর নালি ঘাস অদ্ভুত উজ্জ্বল হয়েছিল। তার ওপর দিয়ে রুনুঝুনু রুনুঝুনু শব্দে একটি ছোট্ট দুকামরার ট্রেন যে গড়িয়ে আসতে পারে, সেটা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। ঘন সবুজ রঙের কামরা, ভেতরে টিমটিমে আলোয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক কীর্তনের দল চলেছে পোঁটলাপুঁটলি খোলকরতাল নিয়ে। কপালে রসকলি আঁকা একদল বয়স্কা বিধবা, ঠোঁট পানের রসে রঞ্জিত; চিমসানো অধিকারীটির একমাথা ঝাঁকড়া চুল, গায়ে বাসন্তী রঙের ঝুটো সিল্কের পাঞ্জাবি।

সব দেখেশুনে আমার উত্তেজনা ঠাওর করে হাসি ফোটে উৎপলের ঠোঁটে। অনেকদিন ধরে ও আমায় চেনে; শুধুমাত্র সময়ের সাশ্রয় হবে বলে যে এখানে আনেনি, সেটা আমি আগেই বুঝেছি।

কিন্তু ঠোঁটে হাসি সত্ত্বেও ওর চোখে একটা ম্লানিমা লেগেই থাকে। সেদিকে তাকিয়ে আমি বারো বছর আগে কলেজে এক প্রথম বর্ষের ছাত্রের উৎসুক চোখদুটো খুঁজি। স্থিরপাড়ার কথা জানতে চেয়েছিলাম, কথার ধরণ থেকে বুঝেছি অনেককাল গ্রামের বাড়ি যায় না উৎপল। এখানেই পড়ে থাকে। কয়েকটা টিউশানি করে আর ভুলে ভরা ইংরেজিতে চাকরির দরখাস্ত লিখে বিভিন্ন জায়গায় পাঠায়। স্থিরপাড়ায় ওর জন্য কিছু নেই। সদর শহরের উপান্তে থেকে একটি সুযোগের অপেক্ষায় তবু দিনগুলো একরকম কেটে যায়।

ট্রেন ছাড়ার আগের মুহূর্তে জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ওর কাঁধ ছুঁয়েছিলাম, বলেছিলাম—

এখানে এভাবে পড়ে না থেকে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে থাকলেই তো পার।

কী হবে?

কেন? বাড়িতে বাবা মা দাদারা আছে তো। তাছাড়া স্থিরপাড়ায় তোমার কটা টিউশানি ঠিক জুটে যাবে।

গ্রামে লোকে টাকা দিতে চায় না, সবাই চেনাশোনা যে। ফিরে গেলে তাঁতে বসা ছাড়া আর কোনো রাস্তা থাকবে না। ওটা আর পারব না স্যার।

ছায়াবিদীর্ণ মুখে বলেছিল উৎপল।

ওর বাবা ও দুই দাদা পেশায় তন্তুবায়। বাড়ির ছোটো ছেলেকে তাঁতে না বসিয়ে ইংরেজি সাহিত্য পড়ে তথাকথিত ভদ্রলোক পেশার দিকে এগিয়ে যেতে দিয়েছিলেন ওর বাবা। পুঁজি আর নতুন উদ্যোগের অভাবে তাঁতশিল্প ধুঁকছে, এর মধ্যে কোনো ভবিষ্যৎ দেখতে পাননি তিনি। তবু শহরে থেকে উৎপলের বিএ পড়ার খরচের যোগান এসেছিল পারিবারিক শিল্প থেকেই। তিন বছর পড়ে ডিগ্রিটা পেয়েছে সে, কিন্তু চার লাইন নির্ভুল ইংরেজি লিখতে শেখেনি; চাকরির পরীক্ষায় কৃতকার্য হবার দক্ষতা অর্জন করেনি। পনেরো হাজার শিক্ষক পদের জন্য সাড়ে তিন লাখ আবেদনকারীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে বাসের ছাতে চেপে যে পরীক্ষা দিতে গিয়েছিল উৎপল, সেখানে তিন হাজার পদ ভর্তি হয়নি যোগ্য প্রার্থীর অভাবে। তাঁতির ঘরের ছেলের বৈপ্লবিক উচ্চাশা পূরণ হয়নি। কিন্তু এই পরাজয় উৎপলের একার নয়, ওর পরিবারেরও নয়। এই পরাজয় আমারও। কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজে উৎপল ছিল আমার ছাত্র। তিনটে বছর ওকে এলিয়ট কীটস আর মেটনিমি সিনেকডকি শেখানোর চেষ্টা না করে যদি কীকরে স্বচ্ছ নিখুঁত ইংরেজিতে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঋণের আবেদন লিখতে হয় শেখাতে পারতাম, যদি বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের দুর্বোধ্য ভাষায় লেখা দিস্তে দিস্তে বিজ্ঞপ্তি আর শর্তাবলির থেকে জরুরি তথ্যগুলো ছেঁকে বুঝে নেওয়ার বিদ্যা আয়ত্ত করত উৎপল, যদি বিভিন্ন অনুদানকারী সংস্থার সঙ্গে লেনদেন করার মতো শিক্ষা আর আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে পারত, তাহলে হয়তো ওদের মুমূর্ষু পারিবারিক বৃত্তিটাকে বাঁচাতে পারত। যদি সেই সঙ্গে নতুন নতুন প্রকরণ আর নকশার খোঁজে তথ্যপ্রযুক্তির দুনিয়ায় ছানবিন করতে শিখত, যদি রপ্তানিকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারত, তাহলে, কে বলতে পারে, হয়তো এক উজ্জ্বল সাফল্যের গল্প হয়ে উঠতে পারত সে। দশটা লোকের কর্মসংস্থান ঘটাতে পারত।

তিনটে বছর কলেজের পর একটা ডিগ্রির কাগজ ছাড়া ওকে আর কিছুই দিতে পারিনি আমরা। তার বদলে কেড়ে নিয়েছি হস্তশিল্পের এক অনুপম শৈলী, কতগুলো প্রজন্ম ধরে অর্জিত, যা দেশভাগের সময় টাঙ্গাইল থেকে নিয়ে এসেছিল ওর পরিবার।

বড়ো বেশি সিনিক হয়ে পড়ছি কি? কে জানে। তবু তো ছেলে পড়িয়ে মেসের খরচ, চাকরির জন্য গোছা গোছা দরখাস্ত ছাড়ার ডাকখরচ মেটাচ্ছে উৎপল। মতিনের গ্রামে শিক্ষার চাহিদা এত কম, সেখানে গিয়ে টিউশনিও জোটে না ওর। শুনেছি ইদানীং সে ছাত্র রাজনীতিতে যোগ দিয়েছে, ভর্তির সময় ওকে কলেজ ক্যাম্পাসে দেখা যায়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারেন্ট নুন

বছর পঁচিশ পরে একবার নিশ্চিন্দিপুরে ফিরেছিলে তুমি। সঙ্গে ছিল পুত্র কাজল। সেই ধঞ্চেপলাশগাছির কাঁচা রাস্তা ধরে, সোনাডাঙার মাঠ পেরিয়ে, তারপর মধুখালির বিল... একেকটি নাম যেন ধুলোপড়া গ্র্যান্ডপিয়ানোর চাবিতে আঙুলের চাপ— ঠাকুরঝি পুকুরের সেই ঠ্যাঙাড়ে বটগাছটা পার হতেই বুকে রক্ত-চলকে-ওঠা, অপূর্ব অনুভূতিতে দেহ অবশ-হয়ে-আসা নিশ্চিন্দিপুর।

তোমার মতো শৈশবের স্বপ্নলোক আমার নেই, যেখানে তেঁতুলতলার ঘাটে বড়ো বড়ো ঝিনুকতোলা নৌকোর গায়ে আলকাতরা আর গাবের রসের গন্ধে জড়িয়ে থাকে কতকাল আগের ফুরিয়ে যাওয়া বিকেলবেলা, জাওয়া বাঁশের বন সন্ধ্যার রক্তাকাশে লায়ার পাখির লেজের মতো খাড়া হয়ে থাকে, কাঁটা কলাইয়ের ডালের মতো অচেনা লতার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে ঝিঁঝিপোকাদের পাড়ায়, নারকোল গাছের পাতায় চুরচুর হয় বৈশাখ রাতের জ্যোৎস্না। এসব কিছুই নেই আমার। কেবল ছেলেবেলার সেই ইস্কুলবাড়িটা আছে, ফেলে-আসা বাল্যকৈশোরের চরম সুখের চরম দুঃখের মিউজিয়াম। সেখানে রাখা আছে নিজের ফাটা নাক গড়িয়ে নামা রক্তের স্বাদ আর ত্বকে গলা-জড়িয়ে-ধরা বন্ধুর ঘামের স্পর্শ।

স্মৃতি মেদুর হয়ে নস্টালজিয়া হয়ে উঠতে যতদিন সময় লাগে, জীবনের ততদিন সময় পেরিয়ে আসার পর কোনো একদিন নিজের পুরোনো ইস্কুলে ফিরে লোহার ভারি গেটটা ঠেলে পা রাখলেই ভেতরটা আচমকা নরম হয়ে আসে জেলি লজেন্সের মতো। ভুলে যাওয়া প্রথম প্রেমের মতো অনুষঙ্গগুলো ফিরে আসতে থাকে: লম্বা টানা বারান্দায় কতকালের পেনের কালি, ঘাম আর ধুলোর গন্ধ, সেইসঙ্গে টিফিনবেলার পর যোগ হতো চুড়মুড় আর হজমিগুলির গন্ধ, একেকটা ক্লাসঘরে দিনের বিভিন্ন প্রহরে বদলে-যেতে-থাকা আলোয় বিশিষ্ট ভয় আর পাপবোধের স্বাদ, শত শত পায়ের ঘর্ষণে সিঁড়ির ক্ষয়ে যাওয়া ধাপগুলো, ল্যাবরেটরির দিক থেকে ভেসে আসা অম্ল গন্ধ, বাঁধানো উঠোনের ফাটলে চেনা আগাছারা, টিচার্সরুমের দেয়ালে মহাপুরুষদের গম্ভীর ঝাপসা ছবিগুলো (যাঁদের চিনতে শিখে গেলেই ছবিগুলো সজীব রহস্যময়তা হারায়), ক্লাসঘরে পেছনের দেয়ালে কত প্রজন্মের মাথার তেলের কালো দাগ যা ফুটে থাকে চুনকামের ভেতর দিয়ে— এই সবকিছু যেন টিফিনবেলার কালো কারেন্ট নুন, স্মৃতির কোষে কোষে চিড়িক চিড়িক করে বার্তা পাঠায়।

এমন মাদক উল্লাস আর বিষণ্ণতায় মেশা অনুভূতির জন্য পাহাড় ডিঙোনো যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতএব স্কুলের সার্ধশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে প্রাক্তনী হিসেবে নেমন্তন্ন পেয়ে যে লাফাতে লাফাতে গিয়ে হাজির হব, তাতে আর আশ্চর্য কি।

দেড়শো বছর আগে যখন স্কুলটা তৈরি হয়, আমাদের এই গঙ্গাতীরবর্তী মফস্সল শহর ছিল সংস্কৃতচর্চার জন্য প্রসিদ্ধ। অনেক টোল চতুষ্পাঠী ছিল, নব্যন্যায়ের একটি শাখার উদ্ভব হয় এখানকার শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের হাতে। সেইসময়, অর্থাৎ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের জোয়ার এসে পৌঁছয় কলকাতা ছাড়িয়ে উত্তরে হুগলি নদীর পাড় বরাবর। দুইপারে ক্ষমতাবান ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত প্রাচীন জনপদগুলো বাদ দিয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মূলত জেলেকৈবর্তদের গ্রাম উৎখাত করে চট আর কাগজের কল বসায় স্কটল্যান্ডের সাহেবরা। আমাদের ছোট্ট বসতির দুপাশে ঘিরে আসে মিলকারখানা। ধ্রুপদী ভাষা আর আধুনিক শিল্পের এ এক বিচিত্র সহাবস্থান ; সেইসঙ্গে ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামি আর ছুৎমার্গের জন্য কুখ্যাতিও ছিল।

ইতিমধ্যে ঔপনিবেশিক সমাজ অর্থনীতি দ্রুত বদলাচ্ছে, সংস্কৃত জ্ঞানচর্চার সুদিন শেষ হয়ে আসছে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের আধিপত্যও শিথিল হচ্ছে ক্রমশ। টোল-চতুষ্পাঠীগুলো রাজানুগ্রহের অভাবে মুমূর্ষু হয়ে পড়ছে, তখন, অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় নতুন সূর্যোদয় হচ্ছে। টুলো পণ্ডিত পুরোহিত আর যজমানি ব্রাহ্মণরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে দেরি করেনি। গড়ে উঠল আধুনিক শিক্ষার ইস্কুল। সেজন্য জমি আর অর্থ জুগিয়েছিল এলাকার ক্ষত্রিয় ভূস্বামীরা, যারা বংশপরম্পরায় ছিল এদের শিষ্য। সবক্ষেত্রেই যা হয়, সামন্ততন্ত্রের তলানি থেকে আসে নবজাগরণের রথের জ্বালানি।

আমাদের পুরুষানুক্রমিক পেশা ছিল টুলো পণ্ডিতি আর জ্যোতিষচর্চা, কিন্তু সে অনেককাল আগের কথা। আমি যে শহরতলিতে বড়ো হয়েছি, সেখানে সেই অতীতের ছিটেফোঁটাও ছিল না। পশ্চিমে গঙ্গা, পুবে রেলের লাইন আর উত্তরে দক্ষিণে ঘিঞ্জি চটকলবস্তিতে ঘেরা একটি ছোট্ট প্রাচীন ক্ষয়িষ্ণু জনপদ, অনেকটা কাশীর মতো সরু অলিগলির দুপাশে উঁচু উঁচু জরাজীর্ণ শরিকি বাড়ি, কৃচিৎ দুয়েকটা আম জাম নারকেলের বাগান, পুকুর, স্মৃতি আগলে টিকে থাকা বুড়োবুড়ি আর ভাঙাচোরা হেরে-যাওয়া মানুষের বাস। আধুনিক প্রজন্ম বেশিরভাগ লেখাপড়া শিখে দেশেবিদেশে ছড়িয়ে গিয়েছে ভাগ্যের সন্ধানে। যথাসময়ে আমিও গিয়েছি। তারপর যতবার ফিরে এসেছি, প্রতিবারই দেখেছি ক্ষয় আর মালিন্য ক্রমশ আমার বাসভূমিতে ছেয়ে আসছে কালচে শ্যাওলার মতো। পুরোনো মানুষজন একে একে হারিয়ে গিয়েছে, বাইরে থেকে এসে বসেছে নতুন মানুষ, নতুন তাদের রুচিবোধ। আগেকার সেই মোটা দেয়াল আর কড়িবরগার স্নিগ্ধ ছড়ানো দালানকোঠাগুলো ভেঙে গজিয়ে উঠেছে গায়ে-গা-লাগানো চৌকোনা সব বাড়ি, তাদের গায়ে সোচ্চার রং আর স্টিল-সেরামিকের সাজ। আমার বিষণ্ণতায় যোগ হয়েছে বিবমিষা, ফিরে আসার টানটা আরও আলগা হয়েছে।

সেজন্য স্কুল থেকে ডাক পাবার পর মনে একটা সংশয় ছিল। তিরিশ বছর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকটা সময় ; তিরিশ বছরে সময়ও শুকিয়ে মারা যায়, ধুলো হয়ে যায়। কিন্তু ভারি লোহার গেটটা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখি এক পরম বিস্ময় আমার স্মৃতি আগলে বসে আছে। আমাদের সেই পুরোনো দারোয়ান রামশরণজীর মতো।

রামশরণজী মারা গিয়েছে, এখন গেট আগলায় ওর ছেলে। তার নামও রাম, রামসহায়— চুমরনো গোঁফজোড়া অবিকল বাবার মতোই ; তাতে পাক ধরেছে, ঠিক রামশরণজীর যেমন ছিল। এবং বিস্ময়ের যেটা, আমাদের সেই তিনতলা ইস্কুলবাড়িটা যেমন ছিল অবিকল ঠিক তেমনটিই আছে। কোনোরকম সংস্কার হয়নি, বাড়বৃদ্ধি হয়নি, দেখে মনে হয় যেন রঙের পোঁচও পড়েনি তিরিশ বছরে। সেই হলদে এলামাটির রং, যা ক্রমশ ফিকে হতে হতে বালির পলেস্তারার সঙ্গে মিশে গিয়ে সিপিয়া ছবির মতো সমঞ্জস সৃষ্টি করে। পাঁচিলের ধার ঘেঁষে দেবদারু গাছগুলো দীর্ঘকাল না ছাঁটার কারণে ডালপালা মেলে পশ্চিমের ঘাসজমিটায় ছায়া বিস্তার করেছে, বাস্কেটবলের পোস্টগুলো মরচে ধরে ভেঙে গিয়েছে, প্রাইমারি সেকশনের ছোটো গেটের পাশে পানীয় জলের সেই পেতলের কলগুলো নেই, তার বদলে একটি টিউবওয়েল বসেছে, শিক্ষকদের বসার ঘরে পাখাগুলোয় সেই হাঁপানি রোগীর শ্বাসটানা শব্দ অবিকল আছে। সবকিছু হুবহু একইরকম আছে, শুধু যেন একটু মলিন হয়েছে শুধু, অদ্ভুত যেটা, আকারে কেমন যেন ছোটো হয়ে গিয়েছে।

চোখের ওপর থেকে নস্টালজিয়ার রঙিন চশমাটা ঠেলে সরাতে পারলে নজরে আসবে ইস্কুলবাড়িটার সর্বাঙ্গে উপেক্ষা আর অবহেলার ছাপ।

তার কারণটা ক্রমশ স্পষ্ট হয় যখন পুরস্কারবিতরণী অনুষ্ঠানে এ বছরের কৃতী ছাত্রদের নামগুলো মাইকে ঘোষণা হতে থাকে... বাপন দুলে, সম্বিত ঘরামি, অখিলেশ সিং, শঙ্কর বাগদি, সইফুদ্দিন মণ্ডল... সাদা-নীল ইউনিফর্মপরা ছেলেরা একে একে উঠে আসতে থাকে মঞ্চের ওপর।

আমার এক সহপাঠীর নাম ছিল সম্বিত, ক্লাসে বরাবর ফার্স্ট হতো, মাধ্যমিকে রাজ্যে দ্বিতীয় হয়েছিল। কিন্তু ওর পদবী ছিল গোস্বামী। বারো বছরের ইস্কুল জীবনে ঘরামি পদবীর কোনো সহপাঠী ছিল না। দুলে বা বাগদি পদবীর কেউ ছিল কি? মনে করতে পারি না। তবে গোটা ইস্কুলে কোনো মুসলমান ঘরের ছেলে পড়ত বলে মনে হয় না। সিং পদবির একজনকে চিনতাম— জীতেন্দ্র সিং, মিলবস্তি থেকে আসত। ওর বাংলায় হিন্দি টান নিয়ে মশকরা করতেন শিক্ষকেরা। ক্লাস এইটে উঠে পড়া ছেড়ে দেয় জীতেন্দ্র। এছাড়া নাথ বিশ্বাস প্রামাণিক গুছাইত ইত্যাদি পদবির সহপাঠী ছিল। তারা কেউ কোনোদিন ফার্স্ট-সেকেন্ড হতো না। অনেকে রেললাইনের ওপার থেকে আসত, পেছনদিকের বেঞ্চে বসতো, টিফিনবেলায় অ্যালুমিনিয়ামের কৌটো খুলে বাড়ি থেকে আনা রুটি খেত। আমাদের বেশিরভাগেরই বাড়ি ছিল স্কুলের কাছে, টিফিনবেলায় গিয়ে খেয়ে আসা যেত। এছাড়া গেটের বাইরে চুড়মুড় হজমিগুলি ঘুগনি ইত্যাদি ছিলই। তবু কখনোসখনো কৌতূহলবশে ওদের টিফিনবাক্সে রুটিতে ভাগ বসাতাম। এক বন্ধুর রুটি-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলুভাজায় রেলগাড়ির ধোঁয়ার গন্ধ থাকত। ওদের কোয়ার্টারটা ছিল শান্টিং ইয়ার্ডের পাশে, বাবা ছিলেন কয়লার ইঞ্জিনের ড্রাইভার। অনেকেরই রুটির স্বাদ ছিল নোনতা। সে কথা বাড়িতে একদিন মাকে বলতে মা বলেছিলেন— রুটিতে নুন মেশানো থাকলে তরকারিপাতি বিশেষ কিছু লাগে না, এমনিই খাওয়া চলে। এই বাড়িতে রুটিতে নুন মেশানো হয় না, বিয়ের পর থেকে কোনোকালে দেখিনি। পরে জেনেছিলাম, আমাদের বাড়িতে রুটিও খাওয়া হতো না তেতাল্লিশের মন্বন্তরের আগে। কিন্তু সে ভিন্ন গল্প।

পুরোনো দিনের সেইসব স্মৃতিরা সার বেঁধে উঠে আসে সভামঞ্চে কৃতী ছাত্রদের মতো। সেইসব দিন হারিয়ে গিয়েছে, সময় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ইস্কুলবাড়িটার থেকে।

শুধু সময়ই বা বলি কেন? স্থানীয় যেসব মানুষ এই প্রতিষ্ঠানটির পৃষ্ঠপোষকতা করত, রাজনীতির পরিভাষায় যাদের বলা হয় এলাকার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিক, তারাও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে প্রায় দুদশক আগে। তাদের পরের প্রজন্ম বাসে পুলকারে চেপে পড়তে যায় দূরের প্রাইভেট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। আমাদের এই ইস্কুলটা এখন মূলত প্রান্তজীবী মানুষের— রিকশাওয়ালা, ছোটো ব্যবসায়ী, ঠিকে কাজের মাসি কিংবা মিলশ্রমিক। তাদের কাউকে কাউকে দর্শকের সারিতে দেখা যায়: আড়ষ্ট বসার ভঙ্গি, পরনে সস্তা পোশাক, একেকটি নাম ডাকা হলে, একেকটি ছেলে মঞ্চে উঠলে একেকটি পোড়-খাওয়া মুখে দপ করে জ্বলে উঠছে এক অনির্বচনীয় আলো।

মঞ্চে উপবিষ্ট ব্যক্তিরা অবশ্য একইরকম আছে, আমাদের সময়ে যেমন ছিল— সেই মুখুজ্যে বাঁড়ুজ্যে ভটচায্যি চক্কোত্তিরা। স্কুল পরিচালন সমিতির সদস্য ছাড়াও স্থানীয় গণ্যমান্য, যারা পরিবর্তনশীল কালের সঙ্গে তাল রেখে নিজেদের উচ্চ বর্ণ ক্ষমতার রাজনীতির বর্ণে ছুপিয়ে নিয়েছে। পুরস্কার প্রদানের পর যখন বক্তৃতাপর্ব শুরু হয়, তারা একে একে উঠে দীর্ঘ ভাষণ দিতে থাকে পরিশীলিত মান্যচলিতে, রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর উদ্ধৃত করে, মঞ্চের নীচে মাটিতে বসা ছাত্রদলের মাথার ওপর দিয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে সামনের সারির বিশিষ্ট অতিথিবর্গের দিকে। পিছনে অভিভাবকদের সারিতে, যেখানে বসেছে শ্যামবর্ণ দড়িপাকানো চেহারার নারীপুরুষেরা, যারা তাদের ঘর মোছে বাসন মাজে রিক্সায় চাপিয়ে নিয়ে যায় স্টেশনে বাজারে, সেদিকে ভুলেও চোখ ফেরায় না।

তাতে অবশ্য এই শ্যামবর্ণ দড়িপাকানো চেহারার মানুষগুলোর কিছু যায় আসে না। অনেকদূর থেকে, এই শহরটার আনাচেকানাচে গুঁজে-থাকা আরেকটা শহর থেকে তারা আজ এখানে এসেছে। এতদূর থেকে এসে পৌঁছতে লেগে গেল দেড়শো বছর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাগজের এরোপ্লেন

আচ্ছা বলো দিকি, পিঠে বেত পড়ার সময় কী করলে ব্যথা কম লাগে?

নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকলে? আমি বলি।

ঠিক বলেছ! গুডবয়!

আর কান ধরে টেনে এনে বেত মারতে শুরু করলে হাতদুটো তুলে মাথাটা আড়াল করতে হবে, দ্বিতীয়জন বলে।

আচ্ছা এটা বলো। ডাস্টার দিয়ে কনুইয়ে মারলে হাত ঝিনঝিন করে তো? তখন কী করতে হয়?

এর উত্তর আমার জানা নেই।

এটা তো খুব সোজা। জোরে জোরে চুলকোতে হবে। তৃতীয়জন বলে।

আচ্ছা, এবার আমি একটা জিজ্ঞেস করি? আমি বলি। বল তো, কাঁকরের ওপর নীল-ডাউন হতে বললে কী করতে হবে?

ওরা তিনজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। বলতে পারে না। পারার কথাও নয়। এখন ইউনিফর্ম হয়েছে— সাদা জামা, নীল প্যান্ট আর বুটজুতো। আমাদের সময়ে ছিল না। আমরা যেকোনো পোশাক আর হাওয়াই চটি পরে ইস্কুলে আসতাম। কাঁকরে জমিতে কান ধরে নীল-ডাউন হতে বললে চটি খুলে হাঁটুর নীচে পেতে নিতাম।

কোনো কোনো স্যার অবশ্য সেটা করতে দিতেন না। তাঁরা এখন আর নেই। আমাদের সময়ের কোনো শিক্ষকই আর নেই। তাঁদের জায়গায় আজ যাঁদের দেখলাম তাঁরা অনেকেই তরুণ, ফিটফাট শার্টপ্যান্ট পরা। আমাদের শিক্ষকেরা বেশিরভাগ ধুতিপাঞ্জাবি পরতেন। তখন নিয়মিত বেতনক্রম ছিল না, কারো কারো পোশাকে আর চেহারায় দারিদ্র্যের ছাপ ছিল স্পষ্ট। সামান্য মাইনের কটা টাকায় সংসার চালানোর চাপে মাঝে মাঝে মেজাজ হারিয়ে অযথা শাস্তি দিতেন। সেটা সেই বয়সেই বুঝতে পারতাম। আবার অযাচিত স্নেহের স্পর্শও পাওয়া যেত। সব মিলিয়ে আমাদের মাস্টারমশাইরা প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন একেকটি বিশিষ্ট আর্কিটাইপ, আমাদের কিশোর মনোজগৎ অনেকখানি অধিকার করে থাকতেন তাঁরা। এখনও কি তেমন হয়? আমার জানতে ইচ্ছে করে।

হ্যাঁ রে, সব স্যার মারেন? আমি জিজ্ঞেস করি।

সবাই মারে না, ঢ্যাঙা ছেলেটি বলে। তুহিনস্যার মারে আর অজয়স্যার মারে।

আর ক্লাসে কথা বললে তথাগতস্যার বেঞ্চির ওপর কান ধরে দাঁড় করিয়ে রাখে— দ্বিতীয়জন বলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর অভিজিৎস্যার ?

অভিজিৎস্যার কখনো মারে না। বকেও না। শুধু ফর্মুলা না বলতে পারলে বলে সিলিফুল !

অভিজিৎস্যারের সঙ্গে কিছুক্ষণ আগেই আলাপ হয়েছে। অত্যন্ত সপ্রতিভ আর স্মার্ট তরুণ, রসায়নের শিক্ষক, কাল্টিভেশান অব সায়েন্স থেকে গবেষণা করছেন। আমাদের রসায়ন পড়াতেন সত্যেনস্যার। অভিজিতের সঙ্গে কথা বলার সময় আমার বারে বারে মনে পড়ে যাচ্ছিল তাঁর কথা। একটু খ্যাপাটে আত্মমগ্ন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, অকৃতদার। ওঁর মাইয়োপিয়া ছিল, বেশিদূর দেখতে পেতেন না, তালশাঁসের মতো পুরু কাচের চশমা পরতেন। ওঁকে আমরা মোটেই ভয় পেতাম না। ক্লাসে হইচই কাগজের গোলা ছোঁড়াছুঁড়ির মধ্যে একমনে ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে ফিরে জৈব আর অজৈব বিক্রিয়ার লম্বা লম্বা ফর্মুলা লিখে যেতেন সত্যেনস্যার, গোলমাল খুব বেশি হলে বোর্ড থেকে মুখ ফেরাতেন ক্লাসের দিকে। মোটা কাচের ভেতর ওঁর বিস্ফারিত অসহায় চোখদুটো দেখে চুপ করে যেতাম আমরা। নিশ্চয়ই অভিজিতের মতো মেধাবী ছিলেন না তিনি। টেস্ট পেপারের প্রশ্ন সমাধান করার সময় অনেক উত্তর চটজলদি দিতে পারতেন না, বাড়িতে দেখে এসে পরদিন বলে দিতেন।

চোখে দেখতেন না, অথচ পিছনের বেঞ্চে কোন ছাত্রের বই কেনা হয়নি, কার বাবার চটকলে লকআউট চলেছে, ঠিক টের পেতেন সত্যেনস্যার। ক্লাসের শেষে তাদের আলাদা করে ডেকে বুকলিস্ট চেয়ে নিতেন, তারপর বলতেন—

মন দিয়ে শোন, সামনের রোববার সকাল দশটায় সরস্বতী বুকস্টলে চলে আসবি, বুঝলি ? আমি থাকব।

পরের সপ্তাহে দেখতাম ওদের হাতে নতুন বই।

অভিজিৎস্যারের কি তেমন কোনো বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি আছে ?

স্বভাবতই সেটা আর জিজ্ঞেস করিনি। তখনও সভামঞ্চে বক্তৃতাপর্ব চলছে। দীর্ঘক্ষণ ঠায় একভাবে বসে জাতির মেরুদণ্ড গঠনে শিক্ষার অপরিহার্যতা প্রসঙ্গে একের পর এক ভাষণ শুনতে শুনতে নিজেরই মেরুদণ্ড টনটন করছিল। চেয়ার ছেড়ে উঠে চলে গিয়েছিলাম প্যান্ডেলের পিছনদিকে। আমায় করিডোরে ইতস্তত ঘোরাফেরা করতে দেখে এগিয়ে এসেছিলেন অভিজিৎ।

কিছু দরকার লাগলে বলবেন কিন্তু, হাসিমুখে বলেছিলেন। আর টয়লেটটা ওইদিকে, টিচার্সরুমের ভেতর দিয়ে ডানদিকে।

আমি হেসে উঠেছিলাম।

জীবনের বারোটা বছর এখানে কাটিয়েছি আমি, এই বাড়িটার মানচিত্র মাথায় খোদাই হয়ে আছে ক্লাস থ্রিতে সুর করে পড়া নামতার মতো। পরিচয়ের পর জানা গেল, আমি ইস্কুলের গণ্ডি পার হবার তিন বছর পরে অভিজিতের জন্ম।

আচ্ছা, তার মানে আপনি সম্বিত গোস্বামীর ব্যাচমেট ! অভিজিতের গলায় বিস্ময় ফুটে উঠেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাধ্যমিকে সন্বিতের মতো রেজাল্ট গত তিরিশ বছরে এই ইস্কুল থেকে আর কেউ করেনি। ওর মতো পরিবার থেকে কেউ এতদূর উঠে আসেনি। এমনকি, ওর মতো জীবনযাপন এবং সেই জীবনের এমন পরিণতিও কারোর হয়নি।

এত ব্রাইট একজন মানুষ, কী প্যাথেটিক এন্ড। তাই না?

যেন আমার মনের থেকে কথা তুলে নিয়ে অভিজিৎ বলেন।

টিচার্সরুমের দেওয়ালে সন্বিতের একটি ছবি টাঙানো হয়েছে, তাতে জড়ানো কবেকার শুকনো বেলফুলের মালা। ছবিটা বছর দশেক আগে তোলা, তখনো মোটামুটি একটা স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে সে। তবে ঠোঁটের দুপাশে তিক্ততার রেখা জমতে শুরু হয়েছে। যদিও বিস্ময় আর কৌতুকে মেশা চাহনিটা একইরকম আছে, যে চাহনির নেশায় মজে থাকতাম আমরা। ছবির কাচের ভেতর সেই পুরোনো চোখদুটো মেলে সন্বিত চেয়ে আছে লম্বা নির্জন করিডোরের দিকে। সেখানে দেবদারুর পাতার ফাঁক দিয়ে একটুকরো রোদ এসে পড়েছে। একটা কাঠবেড়ালি মাটি থেকে কী একটা বীজ দুহাতে তুলে কুটকুট করে খাচ্ছে আর রোদের ঝিরিঝিরি কাঁপনে থেকে থেকেই সচকিত হয়ে পড়ছে। সকলেই রয়েছে প্যান্ডেলে, বিশাল ইস্কুলবাড়িটা একা পড়ে আছে; যেন এক মোহিনী নারী, পরনে ফিনফিনে স্মৃতির মসলিন, আমাকে ইশারায় ডাকে।

অভিজিতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি এগিয়ে চলি। ওপরে ওঠার সিঁড়িতে সিমেন্টের জাফরি দিয়ে আসা রোদ বহুকালের চেনা নকশাটা আজও বুনেছে। তার ওপর দিয়ে পা ফেলে উঠে আসি দোতলায়। লাউডস্পিকারে অতিমন্দ্র স্বর ফাঁকা ক্লাসঘরগুলোয় প্রতিধ্বনি করে সমুদ্রঝিনুকের মতো হয়ে উঠেছে। তিনতলায় উঠে বাঁক ঘুরতেই দেখি বারান্দার শেষপ্রান্তে রেলিঙের ধারে তিনটি বালক।

সকলের চোখ এড়িয়ে ওরা পালিয়ে এসেছে এখানে, খুব নিবিষ্টভাবে কাগজের উড়োজাহাজ বানিয়ে একটি একটি করে বাতাসে উড়িয়ে দিচ্ছে। কোনো পুরস্কার ওরা জেতেনি, কিন্তু এই অনুষ্ঠানটা ওদের সামনে এক দারুণ সুযোগ এনে দিয়েছে। তিনতলার এই উচ্চতা থেকে নিশ্চিন্তে, নিষেধের রক্তচক্ষু ছাড়াই, এরোপ্লেন ওড়ানোর কৌশল পরখ করছে। হঠাৎ সিঁড়ির মুখে আমায় দেখতে পেয়ে খুব ঘাবড়ে গিয়ে পালাবার চেষ্টা করে। অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে, শেষকালে দু-জোড়া ডানাওয়ালা উড়োজাহাজ বানিয়ে দিয়ে আশ্বস্ত করি ওদের। তবুও যেন মনে হয় ওরা পুরোপুরি বিশ্বাস করে উঠতে পারে না যে এই বয়স্ক চেহারার লোকটা কোনোকালে ওদের মতোই ছাত্র ছিল, এই ইস্কুলেই, ওরা যা যা করে সেই সবকিছু করতে ভালোবাসত।

ওরা ক্লাস সিক্স, বি সেকশন। আমাদের সময়ে তিনতলার কোণের দিকে যে ঘরটা ক্লাস সিক্স বি সেকশন ছিল সেখানে নিয়ে যাই ওদের। আমার সেই পুরোনো জায়গাটায় গিয়ে বসি। দ্বিতীয় সারি, বাঁদিকের বেঞ্চির ডান ধার। শিরীষকাঠের আদ্যিকেলে বেঞ্চিগুলো সেই একইরকম আছে, হিজিবিজি কালির দাগ আর খোদাই চিহ্নে ভরা। সেই ঘন প্যালিম্পসেস্টের মধ্যে আমার নিজের কাটা কোনো আঁকিবুকি খোঁজার চেষ্টা করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওরা আমাকে ওদেরগুলো দেখায়— ব্যাটম্যানের মুখোশ আর $(a+b)^2$-এর ফর্মুলা: হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষার সময়ে একফোঁটা চোট্টামি। আমাদের সময়ে পেন্সিল আর ফাউন্টেন পেন ছিল, ডটপেন সবে আসছে। এখন শুধুই ডটপেন। ব্ল্যাকবোর্ডটা উপর্যুপরি খড়ির পরতে ধূসর হয়েছে; ড্যাফোডিল কবিতার ভেতর দিয়ে ঝাপসা ফুটে আছে ইলেকট্রিক কলিং বেলের সার্কিট ডায়াগ্রাম।

ওদের মধ্যে একজন কাগজের পাখা বানিয়ে সেটি পেনের ক্লিপে আটকে বনবন করে ঘুরিয়ে দেখায়। আমাদের সময়ে পেনের ঢাকনায় একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকত। বুনো কুলের ছোট্ট আঁটি সেই ছিদ্রের মুখে ধরে ঢাকনায় ফুঁ দিলে সূচিমুখ বাতাসের মাথায় কুলের আঁটি ভেসে থাকত কয়েক সেকেন্ড। এখনও টিফিনবেলায় বুনো কুল আর কারেন্ট নুন পাওয়া যায়, আঁটি ছড়িয়ে আছে ক্লাসঘরের মেঝেয়। কিন্তু এখনকার পেনের ঢাকনায় ছিদ্র থাকে না। আমি তাই ওদের খড়ি দিয়ে একটিমাত্র রেখা টেনে রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ প্রোফাইল এঁকে দেখাই। তারপর আমরা শিক্ষকদের শাস্তিপ্রদানের ধরন ও আত্মরক্ষার বিবিধ কৌশল নিয়ে মতবিনিময় করি।

বারান্দার প্রান্তে চারতলার ছাতে ওঠার সিঁড়ি, পায়াভাঙা চেয়ারটেবিল ডাঁই করা আছে। ছাতের দরজাটা সবসময় তালাবন্ধ থাকত, এখনও তাই থাকে। একবার ভিনগ্রহের একটি মহাকাশযান ইস্কুলের ছাতে নেমে এসেছিল, তারপর থেকে দরজায় তালা দিয়ে রাখা হয়েছে। এই ঘটনাটার কথা আমরা নীচু ক্লাসে পড়ার সময়ে খুব জনপ্রিয় ছিল, কিন্তু ওরা সেটা জানেনা দেখলাম। সেই সময়টা হারিয়ে গিয়েছে, সময়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা পুরাণকথাও শুকিয়ে গিয়েছে। তাছাড়া জায়গাটা তখন যেমন ছিল এখনও অবিকল তেমনই আছে— সেই একই পাঁশুটে অন্ধকার আর রোদসেঁকা বাতাসের গন্ধ, সিঁড়ির ধাপে পুরু পায়রার বিষ্ঠা আর পালক ছড়ানো, সেই টিনের চালে ফুটো দিয়ে নেমে আসা সূর্যালোকের শলাকা, পায়ের ধাক্কায় ভাসমান ধূলিকণা চিকচিক করছে। এত বছরে শলাকার সংখ্যা বেড়েছে কেবল।

ওরা তিনজনে ছটফটে হাত বাড়িয়ে শলাকা খামচে ধরার খেলা খেলে, ঠিক আমরা যেমন খেলতাম। এছাড়াও আমরা আলোর ফলার নীচে তালু পেতে দিতাম, হাতের হাড়মাস ফুঁড়ে পেছনদিকের চামড়ায় রক্তাভ আলোর বৃত্ত ফুটে উঠত। খেলাটা আমি ওদের দেখাতে চেষ্টা করি, হয় না। বয়সের সঙ্গে আমার চামড়া মোটা হয়ে গিয়েছে। আমার দেখাদেখি ওরা চেষ্টা করে, হয় না। ওদের শ্যামবর্ণ চামড়া ফুঁড়ে আলো ঢোকে না।

নীচে নামার জন্য সিঁড়ির দিকে যাচ্ছি, ওরা আমায় আরেকটি দু-জোড়া ডানাওয়ালা উড়োজাহাজ বানিয়ে দিতে বলল। আমি কাগজ ভাঁজ করতে লাগলাম। মধ্যাহ্নের সূর্য পশ্চিমে ঢলেছে, গঙ্গার দিক থেকে তাজা হাওয়া বইতে শুরু হয়েছে। সেই হাওয়ার পিঠে সওয়ার হয়ে উড়োজাহাজটা একটি দীর্ঘ বৃত্তচাপ এঁকে দেবদারু গাছের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যেতে ওরা হাততালি দিয়ে উঠল। আমার মুখ দিয়ে অনবধানে বের হয়ে এল এক বিচিত্র হর্ষধ্বনি, যা বুকের মধ্যে জমে ছিল তিরিশটা বছর; আমি জানতেই পারিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তালডোঙা

একটি আশ্চর্য উপন্যাস। একটি ছেলে, মফস্‌সলের ছেলে। বাবা ছিল চটকলের হাজিরাবাবু, মারা গেল। বাড়িতে ছেলেটির মা আর দিদি— ঠোঙা বানিয়ে, কাঁথা সেলাই করে সংসার চালায়। ছেলেটি ইস্কুলে পড়ে। অত্যন্ত মেধাবী সে, ক্লাসে প্রতিদ্বন্দ্বীদের অনেক পিছনে ফেলে সব পরীক্ষায় প্রথম হয়। কিন্তু সাধারণত ফার্স্টবয়রা যেমন হয় ঠিক সেরকম নয়। বেপরোয়া স্বভাবের, উদ্ধত, কিন্তু সেনসিটিভ। অ্যামবিশাস। শিক্ষার ভেতর দিয়ে, স্ট্রাগলের ভেতর দিয়ে, আমরা দেখতে পাচ্ছি জীবনকে জানার, তাকে নিয়ন্ত্রণ করার একটা তীব্র খিদে তৈরি হচ্ছে তার মধ্যে। সেইসঙ্গে আমাদের এই বেঠিক সমাজব্যবস্থার প্রতি পুঞ্জীভূত একটা রাগ। কিন্তু তার কল্পনাশক্তি আছে, অনুভূতি আছে, হয়তো মহৎ একটা কিছু করার ক্ষমতাও আছে...

চেনা গল্প। কিন্তু দুর্গা এখানে মরেনি। সর্বজয়াও না। অপুই চলে গিয়েছে জীবন ছেড়ে। এক প্রাচীন ক্ষয়িষ্ণু শহরে ভগ্নপ্রায় পৈতৃক বাড়ির এঁদো ঘরে দুই রুগ্ন নারী, মা ও মেয়ে, সারাদিন কাগজে আঠা লাগিয়ে ঠোঙা বানায়, পুরোনো জ্যালজেলে শাড়ি দিয়ে কাঁথা বোনে। আর যখের ধনের মতো আঁকড়ে থাকে এক অপুর গল্প।

AMARBOI.COM

*

তোকে নিয়ে এই লেখাটা কোনো এলিজি নয়, যদিও এলিজি তোর প্রিয় ফর্ম ছিল। লোরকাকে নিয়ে নেরুদার লেখা, কিংবা অডেনের ফিউনেরল ব্লুজ...

> স্টপ অল দ্য ক্লক্‌স, কাট অফ দ্য টেলিফোন
> প্রিভেন্ট দ্য ডগ ফ্রম বার্কিং উইথ আ জুসি বোন
> সায়লেন্স দ্য পিয়ানোজ অ্যান্ড উইথ মাফল্‌ড্ ড্রাম
> ব্রিং আউট দ্য কফিন, লেট দ্য মোর্নার্স কাম...

তোর চিলেকোঠার ঘরে, তোর ঠোঁটনিঃসৃত এইসব লাইন কত রাত চাবুকের মতো জাগিয়ে রাখত আমাদের। সেই কড়িকাঠ থেকে ঝুলন্ত নগ্ন বাল্‌বের আলো, বিড়ির গাঢ় নীল ধোঁয়া, জানলার বাইরে ফিকে জ্যোৎস্নায় আমাদের ঘুমন্ত মফস্‌সল শহর যেন ক্যানভাসে আঁকা। তার ওপর দিয়ে ভোরের আগে চটকলের সাইরেন আর আজানের যথাক্রমে মেরুন ও নীল তুলির আড়াআড়ি টান।

বাল্যের সাথি, কৈশোরের ঈশ্বর, আমার থেকে ঠিক তিন মাসের ছোটো ছিলি তুই,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু প্রাজ্ঞতায় মজবুড়ো-অরণ্যদেবের সেই মজবুড়ো। আমি যখন ম্যানড্রেক হাঁদাভোঁদা, আর কিশোর ভারতী, তুই আমায় জীবনানন্দ চেনালি। তারপর কীভাবে যেন তোর বাড়িটা হয়ে উঠল আমার ২১নং ঝামাপুকুর লেন। তখন দেখেছি কেমনভাবে মাসিমা, তোর মা, বড়ি দিয়ে ঠোঙা বানিয়ে সংসার চালাতেন। দিদিটার বিয়ের বয়েস পেরিয়ে গেল। তখন তুই বারমুখো— প্রন্ত শক্তি বোদলেয়ার, লাইনপারে বাংলার ঠেক গাঁজা হাংরিদের ছায়া লিটল ম্যাগাজিন। মাধ্যমিকে দ্বিতীয়, তারপর উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম কুড়ি জনের মধ্যে থাকার পর সবাইকে হতবাক করে দিয়ে বাংলা অনার্স পড়তে গেলি প্রেসিডেন্সি কলেজে। তোর ঠিকানা হল হিন্দু হোস্টেল, আর মধ্যরাতের রেললাইন ধরে ভরপেট রাম-গোমাংসের পর সিগারেটে টান দিতে দিতে—

একটা আশ্চর্য উপন্যাস লিখব ভাবছি, একটা কাব্যোপন্যাস, যা হবে একাধারে বুদেনব্রোক্স আর ফ্লর দু ম্যল। কী বললাম বুঝলি?

তুই ছিলি আমাদের অপু, আমাদের না-লিখতে-পারা কবিতা, তুই ছিলি বাংলার শেষ ইয়ং বেঙ্গল।

না, তোকে নিয়ে এই লেখাটা কোনো এলিজি নয়, যদিও এলিজি তোর প্রিয় ফর্ম ছিল। স্তুতিকাব্য করব না, যা ছিল তোর বিরক্তিকর। তোকে স্বচ্ছ চোখে দেখার চেষ্টা করব, সার্জারি ছুরির মতো, যা লাশকাটা ঘরে ঠান্ডা স্টেনলেস স্টিলের টেবিলে কাটাছেঁড়া করেছে তোর দেহ, যেমন তুই করতিস চারপাশের সব মানুষকে।

সেই উপন্যাসটা লেখা হয়ে ওঠেনি। তোর সব শব্দ আর ইমেজগুলো ছড়িয়ে গিয়েছে, গড়িয়ে গিয়েছে খালাসিটোলায় আর প্রমোদদার ক্যান্টিনে। কিন্তু তাতে করে একের পর এক পরীক্ষার বৈতরণী সসম্মানে পার হতে কোনো অসুবিধা হয়নি। হবার কথাও নয়। ছাত্রাবস্থাতেই বিখ্যাত হয়েছিলি তুই, বু-ব কিংবা সমর সেনের মতো। কিছুদিন কলেজে মাস্টারি, তারপর বিখ্যাত সংবাদ সংস্থায় মোটা মাইনের সহকারী সম্পাদক— অব্যাহত ছিল তোর সামাজিক উত্থান। এমনকি লীলাকেও পেয়েছিলি, যা অপু পায়নি।

মধুজার একনিষ্ঠ গৃহিণীপনায় তোর জীবনটা গুছিয়ে উঠেছিল, তোর যাবতীয় উৎকেন্দ্রিকতার পেছনে ও ছিল শক্ত বনিয়াদ। এমনকি তুই যে বাড়ির সঙ্গে নাড়ির সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলি, এটা মধুজা চায়নি। গোপনে মা দিদির সঙ্গে যোগাযোগ রাখত, সাহায্য পাঠাত।

এসব জেনেছিলাম পরে, তখন আমরা সবাই জানতাম তুই আনন্দয় আছিস। তুই যে বিষাদেও আছিস এটা আমরা কেউ কেউ জানতাম। পুরোনো বন্ধুদের এড়িয়ে চলতিস। কাগজে মাঝে মাঝে তোর বাইলাইন পড়তাম। তোর লেখার মধ্যে ক্রমশ ফুটে উঠছিল একধরনের চিটচিটে শ্লেষ, আত্মরতির মতো, কল্পনার রংগুলো হারিয়ে যাচ্ছিল। সেটা এতই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে নাম না থাকলেও পড়ে বলে দেওয়া যেত তোর লেখা।

কলকাতা তোকে কিছু দিল না, তোর কল্পনার রামধনুটা কেড়ে নিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিন কলেজ স্ট্রিটে তোর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল এক শরতের বিকেলে। সেদিন কলকাতার আকাশে আশ্চর্য বর্ণময় মেঘ, সিপিয়া আলোয় চারদিক মায়াবী হয়ে আছে। একথা সেকথার পর জিজ্ঞেস করেছিলাম তোর সেই উপন্যাসটার কথা, সেই কাব্যোপন্যাস, যা হবে একই সঙ্গে বুদেনব্রোক্স আর ফ্লর দু ম্যল।

ধুস! কী হবে? ঠোঁট উলটে বলেছিলি তুই।

কীসে কী হবে? আমি জানতে চেয়েছিলাম।

তুই খপ করে আমার কব্জি খামচে ধরে ফুটপাথের ধারে নিয়ে এসে কলেজ স্ট্রিটটা দেখিয়ে বলেছিলি—

এই যে রাস্তাটা দেখছিস, এই সূর্য সেন স্ট্রিটের মোড় থেকে মহাত্মা গান্ধী রোড, এই একশো মিটার স্পেসটায় রাজত্ব করতে হবে। তাহলেই আবহমান বাঙালি সংস্কৃতির পোঁদে আঙুল দিয়ে বাঁদরনাচ নাচানো যাবে। কী বললাম বুঝলি?

তোর সেই পুরোনো মুদ্রাদোষ। কিছু বুঝিনি, কিন্তু কথার ভেতরে চাপা দীর্ঘশ্বাসটা শুনতে পেয়েছিলাম। তোর এত ভালো রেজাল্ট থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় তোকে চাকরি দেবে না, একচ্ছত্র মিডিয়া হাউসের ঘরের লোক হওয়া সত্ত্বেও খ্যাতির বৃত্ত তোকে নেবে না, সেটা তুইও বিলক্ষণ জানতিস। তার কারণ দুর্মুখ বলে একটা পরিচিতি তোর সঙ্গে সারাক্ষণ লেপটে থাকত ছায়ার মতো। অনেক কৃতী মানুষকে সামনাসামনি অবজ্ঞাসূচক আক্রমণ করে নিষ্ঠুর আনন্দ পেয়েছিস তুই। মূর্তি ভাঙার সান্তারাস হিসেবে তোর প্রতিভা চারপাশে স্তাবকবৃন্দ জুটিয়েছিল সেই কলেজ ক্যাম্পাস থেকেই। যারা তোকে ভালোবাসত, এমনকি ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও রেহাই ছিল না তোর বাঁকা চাহনি থেকে, নির্মম জিভ থেকে। ভেতরে ভেতরে রক্তাক্ত হলেও তোর কাছে বার বার ফিরে যেতাম, কারণ তুই ছিলি আমাদের অপু।

অপুও একদিন ঠোঁট বেঁকিয়ে পুলুক বলেছিল— তুই বিলেত যাবি, তারপর মোটা মাইনের চাকরি করবি...

সেই কথাগুলো মনে পড়ে গেল সেদিন কলেজ স্ট্রিটে, যখন তুই দ্বারভাঙা বিল্ডিঙের দিকে মুখ তুলে নাক কুঁচকে বললি—

ছাগলগুলো সব বসে থাকে ইন্টারভিউ বোর্ডে। কী বললাম বুঝলি? ছাগলে বোঝাই হয়ে আছে। বোকাপাঁঠার গন্ধ পাচ্ছিসনে?

না, পাইনি। কিন্তু দিনের বেলাতেও মদের গন্ধ পেয়েছিলাম তোর মুখে। আমার ভ্রুকুঞ্চন দেখে ব্যাগ থেকে বের করে দিয়েছিলি ভদকা মেশানো জলের বোতল।

নে চুমক দে!

আমি প্রত্যাখ্যান করায় একটা অশ্রাব্য গালি দিয়ে বলেছিলি, ভদকাও ছুঁবি না? তারপর নিজের গলায় বেশ খানিকটা ঢেলে বলেছিলি, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!

আমি জানতে চেয়েছিলাম মধুজার কথা। মুখে সেই বিখ্যাত তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটিয়ে বলেছিলি— বাদ দে! তারপর বলেছিলি—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধু খুব ভালো মেয়ে। কিন্তু আমি যে ভালো নই। কালীঘাটের পটের বাবু করে তুলতে চেয়েছিল ও আমায়। কিন্তু শালা আমি সম্বিত গোস্বামী কীকরে কালীঘাটের বাবু হব বল দিকি?

কিন্তু রোরোর কথা জানতে চাওয়ায় খুব দুমড়ে গিয়েছিলি তুই। তোর মেয়ে রোরো, চাইবাসার সেই ছোট্ট নদীটার নামে নাম রেখেছিলি।

আমাকে রোরোর কাছে যেতে দেয় না ওরা, জানিস? বলেছিলি তুই। তেষ্টায় আমার ছাতি ফাটে।

আমি জানিনা তুই মেয়ের কথা বলেছিলি নাকি নদীর কথা। চাইবাসায় রোরো নদীর ধারে আমাদের সেই তীব্র যৌবন, ঝমঝমে তারায় ভরা আকাশের নীচে সারারাত, নুড়িপাথরে কলকল ছলছল শব্দে শক্তির লাইন—

রোরো নদীর ধার থেকে ওই একটি বালক
কুড়িয়ে পেয়েছিল রঙিন বুকের পালক
এবং একটি পাথর পেয়ে সেই পালকে
জড়িয়ে ছুঁড়ে দিয়েছিল এপার থেকে...

লাইনগুলো তোর তখন আর মনে থাকার কথা নয়, নেশা খেয়েছে তোর কবিত্বস্মৃতি। ইতিমধ্যে একটা রিহ্যাব ক্লিনিকে ভর্তি ছিলি কিছুকাল, লাভ হয়নি। সেদিন কলেজ স্ট্রিটে দেখা হবার পর থেকেই আমাকে ফোন করতিস মাঝরাতে, প্রলাপ বকতিস। শুধু আমাকেই নয়, পুরোনো বন্ধুদের অনেককেই। ত্রাস হয়ে উঠেছিলি সবার। সেই মনোলগ চলত দীর্ঘক্ষণ, কখনো রাত কাবার হয়ে যেত। হুঁ হাঁ করে সাড়া দিতে দিতে তলিয়ে যেতাম আচ্ছন্ন তন্দ্রায়, ফোন বন্ধ করে দিতে পারিনি কখনো। ঘুমের নিঃসীম চরাচরে তোর কথাগুলো ওড়াউড়ি করত, তোর জীবনের অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি, যা পালামৌয়ের অরণ্য পাহাড়ে উড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছিল অপু, পাতাগুলো হাওয়ায় ভেসে ভেসে ছড়িয়ে যাচ্ছিল দূর বনানীর মাথায়।

শেষ বছরটা বাড়িতে ফিরে এসেছিলি, কলকাতায় যেতিস না। চাকরিটাও চলে গিয়েছিল শুনেছি। আবার সেই মা আর দিদির আশ্রয়— সর্বজয়া সর্বংসহা, আর দিদি দুর্গা দশভুজা। সারাদিন মদ খেতিস সেই চিলেকোঠার ঘরে বসে। আবার কবিতা লিখতে শুরু করেছিলি। মাঝরাতে ফোন করে শোনাতিস সেসব।

তখন তোকে বলতে পারিনি, আজ বলছি— ওগুলো কবিতা হতো না। শুধু আমার নয়, অনেকেরই এটা মনে হতো। কিন্তু বিশ্বাস কর, ভয়ে কেউ তোকে একথা বলতে পারেনি। আর যে কথাটা কেউ বলতে পারেনি, আজ বলছি— তোর অবিমৃশ্যকারিতা, তোর বেপরোয়া ঔদ্ধত্য, যা প্রথম যৌবনে ছিল তোর অলঙ্কার, সেটা বয়সের সঙ্গে আর মানাচ্ছিল না। তুই আজীবন ইয়ং বেঙ্গল হয়েই থেকে গেলি, থেকে যেতে চাইলি। ওরে, সেকালের ইয়ং বেঙ্গলেরা সুবোধ হয়ে ঘরে ফিরেছিল; ব্রাহ্ম হয়েছিল, সুরাপান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিবারণী সভা করেছিল। তোর আর ঘরে ফেরা হল না। তুই রাতের রেললাইন ধরে হেঁটে চললি, আর বাতাসে বুনে চললি একটা আশ্চর্য উপন্যাস— একটি ছেলে, গ্রামের ছেলে... দরিদ্র কিন্তু সেনসিটিভ... ভেতরে মহৎ একটা কিছু করার ক্ষমতা আছে... সম্ভাবনা আছে...

যেটা কোনোদিন তোকে বলতে পারিনি, আজ বলছি— তুই চারপাশের মানুষদের দেখতিস তাদের করে-ওঠা কাজগুলো দিয়ে, তাদের প্রকাশিত লেখাগুলো দিয়ে। কিন্তু চাইতিস তোকে দেখা হোক তোর ভেতরের সম্ভাবনা দিয়ে, লেখক সন্বিত গোস্বামীকে বিচার করা হোক তার ভেতরে জমে-থাকা, না-লিখে-ফেলা, বইগুলো দিয়ে।

সেই বইগুলো তুই লিখতে পারিস নি। হয়তো একদিন টের পেয়েছিলি, সেই বইগুলো কোনোদিনই লিখে উঠতে পারবি না; কারণ সেই বইগুলো নেই।

খুব অস্থির ছিলি তুই, খুব তাড়া ছিল গন্তব্যে পৌঁছনোর। আর তাই পথের ধারে দাঁড়িয়ে রইলি স্থানুবৎ। আমরা যে যার মতো বাস অটো ট্রামে উঠে পড়লাম। তুই দাঁড়িয়েই রইলি, হয়তো কোনো অলীক দ্রুতগতি যানের অপেক্ষায়।

তুই কি জেনে গিয়েছিলি তেমন কোনো যান নেই? সেজন্যেই চলে গেলি?

তোর গল্প আসলে আমার গল্প, সন্বিত, আমাদের গল্প। আমরা, যাদের দাদারা হারিয়ে গিয়েছিল জ্যোৎস্নায়, বনে, বসন্তের মৃদু শীতল সমীরণে, তারপর খালের কালো জলে ভেসে উঠেছিল উপুড় হয়ে, পিঠে মোমবাতির শিখার মতো জেগে থাকা ছুরির বাঁট, যারা পৃথিবীতে আসার আগে আমাদের বাবাদের চোখে আলোর বিন্দু হয়েছিল, আর পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবার পরে আমাদের মায়েদের চোখের নীচে ছায়া হয়ে রয়ে গেল, তাদের উত্তরসূরি এই আমরা। আমাদের তাড়া ছিল গন্তব্যে যাবার, তাই দাঁড়িয়েই রইলাম পথের পাশে, এক অস্ফুট সম্ভাবনা হয়ে।

AMARBOI.COM

তোর সঙ্গে আমরাও মরে গেলাম রে, মড়কের ইঁদুরের মতো, লাশকাটা ঘরের বাইরে বসে ফালা ফালা হতে লাগলাম অনন্ত অপেক্ষার প্রহর।

তোকে নিয়ে এলিজি লিখতে বসিনি, যদিও এলিজি তোর প্রিয় ফর্ম ছিল। লোরকার মতো তোকে মারতে আসেনি ঘাতকেরা, ফাটা বেদানার মতো তোর হৃৎপিণ্ড ছেতরে যায়নি ভোরের আকাশে। গভীর রাতে, যে সময়ে তুই ফোন করে নিপাট স্বপ্নহীন গার্হস্থ্য ঘুম থেকে আমাদের ডেকে তুলতিস, সেই রাতচরা পেঁচার প্রহরে কোনো অনির্দেশ্যের থেকে কল এসেছিল তোর ফোনে। তারপর একগাছ দড়ি, একটি নিখুঁত ফাঁস— মৃত্যু এসেছিল মোক্ষম অন্ত্যমিলের মতো। সেটা কিছু বিস্ময়ের নয়, সেটা তোর লব্ধ শৈলী। আশ্চর্য যেটা, তোদের চিলেকোঠার সেই উইয়ে ফোঁপরা কড়িবরগা তোর দেহের ভার বইতে পেরেছিল।

তার দিনকয়েক আগে তুই নাকি খুব উত্তেজিত ছিলিস একটি খবরে— মঙ্গলগ্রহে জলের সন্ধান পাওয়া গেছে। গলির মুখে সাইবার কাফেতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ মাউস নেড়েচেড়ে দেখতিস মঙ্গলের বুকে শুকনো হ্রদ, নদীর খাত— নাসার ক্যামেরায় তোলা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাফে চালায় যে ছেলেটি, সে পরে বলেছে আমায়। কম্পিউটার ব্যবহারে আনাড়ি ছিলি তুই, ইন্টারনেট ছেনে ওই এনে দিত মঙ্গলের পীতাভ মানচিত্র।

মৃত্যুর পর তোর ঘর থেকে একটা সুইসাইড নোট পাওয়া যায়, একটা কবিতা। ঠিক কবিতা নয়, একটা চিঠিও বলা যায়— রোরোকে লেখা। তুই লিখেছিস, মঙ্গলগ্রহে জলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, তুই সেখানে চললি তালডোঙায় চেপে। ছায়াপথ দিয়ে ভেসে ভেসে সেখানে যেতে বেশ কিছুদিন সময় লাগবে। পৌঁছনোর পর আপাতত নদীখাত ধরে ভেসে চলব, তারপর হয়তো কোনো হ্রদের ধারে ভেড়াতে পারি ডোঙা— লিখেছিস। ওখানে জলে একরকম হলুদ ফুল ফোটে, অনেকটা বাংলার গ্রামদেশে দহে বিলে যে হোগলগুঁড়ি পাওয়া যায় তার মতো। নৌকোয় করে সেই হলুদ পরাগ সংগ্রহ করে গুড় মেখে খাওয়া হয়। সেইরকম পরাগরেণু পাঠাবি তুই, রোরোকে লিখেছিস, মঙ্গলগ্রহের হ্রদে অচেনা ফুলের পরাগ। ওর দিদা, তোর মা, গুড় দিয়ে মেখে দেবে।

তুই কথা রাখিস না, রোরো সেটা আজন্ম জানে। পরাগরেণু কোনোদিন আসবে না মঙ্গলগ্রহ থেকে। কিন্তু তালডোঙায় ভেসে ছায়াপথ দিয়ে মহাকাশে যাবার এই ছবিটা তোর মেয়ের স্মৃতিতে চিরকাল আঁকা হয়ে থাকবে আদিম গুহাচিত্রের মতো। তোর এই লেখাটা উৎরে গিয়েছে রে!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিনগ্রহের জীব

প্রতি রাতে ঠিক এগারোটার সময় একাদশ শ্রেণির ছাত্রী সুমিতা প্রামাণিক বইপত্র গুছিয়ে নিয়ে অপেক্ষা করে বিদ্যুৎ আসার জন্য। আলো জ্বলে উঠলেই দ্রুত পরীক্ষার পড়া করে নিতে হয় ওকে। ঠিক দুটোর সময় আবার বিদ্যুৎ চলে যায়। রং কারখানায় লেবার কোয়ার্টারে একমাত্র সুমিতাই গতবছর মাধ্যমিক পাস করেছে। এবং পড়াশোনা ছেড়ে দেয়নি।

এ হল আমার শহরের আনাচেকানাচে গুঁজে-থাকা অন্য এক শহরের গল্প। উনিশশো সত্তরের দশক পর্যন্ত ব্রিটিশ মালিকানায় ছিল এই কারখানা, উচ্চ মানের রং প্রস্তুত করত। আশি এমনকি নব্বইয়ের দশকেও বড়ো বড়ো বিজ্ঞাপনে নজর কাড়ত একটি শ্লোগান—

Whenever You See Colour, Think of Us

এখানে তাকালে যে রং চোখে ভেসে ওঠে তা ধূসর পাটকিলে কালচে পাঁশুটে সবুজ— ক্ষয় আর হতাশার রং।

জুন মাসের এক শুক্রবার ওয়ার্ক সাসপেনশন হল, তার ঠিক তিন মাস পরে একদিন কোয়ার্টারে জল আর বিদ্যুতের সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গেল। তারপর মালিকপক্ষের কাছে অনেক আবেদন নিবেদন করে এই পাওয়া যাচ্ছে এখন— দিনে দুবার দশ মিনিট করে সরু সুতোর ধারায় জল আর মাঝরাতে তিনঘণ্টার জন্য আলো। সুমিতার বাবা অরূপ প্রামাণিক জানালেন।

বাইশ বছর একটানা দক্ষতার সঙ্গে ইলেক্ট্রিশিয়ানের কাজ করার পর কোম্পানি এখনও যা দিচ্ছে তা এই— বিশ মিনিটের জল, তিন ঘণ্টার আলো আর একটি জীর্ণ দুকামরার কোয়ার্টার। অথচ শিল্প আইন অনুসারে কোনো কারখানায় লকআউট বা ছাঁটাই ঘোষণা হলে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের নিয়মিত ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য, যতদিন না বিষয়টি বোর্ড অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল রিকনস্ট্রাকশন (বিআইএফআর) দ্বারা মীমাংসা হচ্ছে। এছাড়াও শ্রমিকরা তাদের প্রাপ্য গ্র্যাচুইটি ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের পূর্ণ হকদার। কিন্তু এক্ষেত্রে যেহেতু 'অস্থায়ী' কর্মবিরতি হয়েছে, লকআউট বা ছাঁটাই নয়, তাই তারা কিছুই পাচ্ছে না বেশ কয়েক বছর। অনেকেই ছেড়ে চলে গিয়েছে। সুমিতাদের মতো যাদের কোথাও যাবার নেই, তারা এখনও পোড়ো কোয়ার্টার আঁকড়ে পড়ে রয়েছে। চারিদিকে ঘন আগাছা, আর্বজনার স্তূপ, পরিত্যক্ত ঘরগুলোয় সাপখোপ ভামবেড়ালের বাসা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটার জন্যেই চিন্তা, বললেন ওর মা শোভা। ইস্কুল থেকে টিউশন পড়তে যায়। এদিকে কী বলব দাদা, সন্ধ্যা হলেই জায়গাটা একদম ভুতুড়ে হয়ে যায়, মদ জুয়োর ঠেক বসে। ওর বাবা যেদিন থাকে না হলে আমি, মাস্টারের বাড়ি থেকে সঙ্গে নিয়ে ফিরি।

মা ও মেয়ের চোখে অজানা আশঙ্কার ছায়া ফোটে। এই ছায়াটা খুব চেনা।

রাত সাড়ে তিনটেয়, সুমিতা যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, স্বামীস্ত্রী বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েন। শোভা জলের পাত্রগুলো কলের সামনে সারি দিয়ে রাখতে থাকেন, আর অরূপ জগদ্দলে চটকল অঞ্চলে ঠিকা কাজের খোঁজে যাবার জন্য তৈরি হয়ে নেন। এখান থেকে জগদ্দল পাঁচ কিলোমিটার পথ, পায়ে হেঁটে গেলে বাসভাড়াটা বাঁচে। তাছাড়া ভোরের প্রথম বাস চালু হবার আগে পৌঁছে যেতে পারলে মিলগেটের লাইনে সামনে দাঁড়ানো যায়। সকালের আলো ফুটলে দেখা যায় মা ও মেয়ে বাড়ির বাইরে বসে ছেঁড়া টায়ার থেকে নাইলনের সুতো ছাড়াচ্ছে। দুজোড়া চটপটে হাত ঘণ্টা দুয়েকে টাকা দশেকের সুতো ছাড়াতে পারে। ইতিমধ্যে মায়ের ঘরকন্না ও মেয়ের ইস্কুলে যাবার সময় হয়ে যায়।

বন্ধ রং কারখানায় প্রায় চারশো শ্রমিক পরিবারে মোটামুটি এই হল রোজনামচা। বিগত কুড়ি বছর ধরে যে কাহিনিটি লেখা হয়ে চলেছে এই শিল্পাঞ্চল এলাকায়, তার একটি অধ্যায়মাত্র। কয়েক পা দূরে গৌরীপুর জুট মিল, বন্ধ হয়ে আছে এক দশক হয়ে গেল। মিলটা তৈরি হয়েছিল ১৮৮৫ সালে, যখন হুগলি নদীর পাড় বরাবর শিল্পায়নের নতুন সূর্যোদয় হচ্ছে। এর নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ছিল, ওপার বাংলা থেকে পদ্মা মেঘনা দিয়ে সুন্দরবন হয়ে বড়ো বড়ো পাটের বোট আসত। এককালে বাইশ হাজার শ্রমিক কাজ করত এখানে। পাশেই কন্টেইনার অ্যান্ড ক্যাপ্স লিমিটেড, নশো শ্রমিক কাজ করত, তার পাশে ইন্ডিয়ান পেপার অ্যান্ড পাল্প, আরও প্রায় হাজার খানেক শ্রমিক। খানিক দূরে নদীয়া জুট মিল, সেটিও বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। আরও কিছুটা দক্ষিণে গেলে জগদ্দলের বিস্তীর্ণ শিল্পাঞ্চল, বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের এক অনু-ভারতবর্ষ। ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের ঢেউ সাগর পেরিয়ে হুগলি নদীর জোয়ারের পিঠে চেপে এসেছিল এতদূর, উপমহাদেশের অর্থনীতি আর কর্মসংস্থানের চুম্বক হয়ে উঠেছিল একটি ভূখণ্ড, দক্ষ শিল্পশ্রমিক তৈরি হয়েছিল কয়েক প্রজন্ম ধরে। সেই ইতিহাসের কঙ্কালের হাড়গোড় ছড়িয়ে আছে চারপাশে।

এই ইতিহাসটা যে জানে না, তার কাছে জায়গাটা শহরের ধারে যে কোনো একটি মামুলি বস্তি ছাড়া আর কিছু মনে হবে না— বলছিল শুভাশিস, আমার বাল্যবন্ধু, স্থানীয় শিল্পাঞ্চল বাঁচাও কমিটির সেক্রেটারি। অথচ দ্যাখ, এই ছিল ভারতবর্ষের প্রথম এসইজেড।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে যোগ করে—

এখনও এসইজেড, তবে ভিন্ন অর্থে। এখন এ হল স্পেশাল এক্সটিংকশন জোন।

ইতিহাসের সেই নদীটা মজে এসেছে, তার বুকে এদিকে ওদিক জেগে উঠেছে বালির চর। এখন আর আগের মতো পাটের গাঁট নিয়ে বড়ো বড়ো গাদাবোট আসে না। পাড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বরাবর সারি দিয়ে মিলের জেটি আর ক্রেনগুলো রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ভেঙে দুমড়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে জলে। কারখানার উঁচু উঁচু ইটের চিমনির মাথায় বটগাছ, চিলের বাসা। নদীর সমান্তরাল যে রেলের লাইনগুলো ঢুকে গিয়েছে কারখানার ভেতর, যার ওপর দিয়ে এককালে মালগাড়ির সারি চলে যেত বন্দরের দিকে, সেখানে গজিয়ে উঠেছে মহিষের খাটাল। দুপাশে লোহালক্কড় আর বয়লারের ছাইয়ের পাহাড় পেরোলে সারি দিয়ে মজদুর লাইনের একতলা ইটের ঘর। বেশিরভাগ তালাবন্ধ, কিংবা শুয়োরের খোঁয়াড়।

বিহার উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা শ্রমিকেরা অনেকেই গ্রামদেশে চাষবাসে ফিরে গিয়েছে, শুভাশিস জানায়। যারা পড়ে আছে তারা কেউ কেউ শুয়োরের চাষ করছে, নদীতে মাছ ধরা কিংবা রিক্সা চালানোর কাজও করছে।

এ এক বিচিত্র বি-শিল্পায়ন। ইতিহাসের রথের চাকা পিছনদিকে ফিরেছে নিঃশব্দে, সামনের দিকে এগোনোর মতো শিঙা ফুঁকে নয়।

মজদুর লাইন ছাড়িয়ে আমরা মিলগেটের কাছে একটি চায়ের দোকানে এসে পৌঁছই। সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন বৃন্দাবন প্রসাদ ও তাঁর মতো আরও কয়েকজন ছাঁটাই শ্রমিক।

ষাটোর্ধ ক্ষয়াটে চেহারার বৃন্দাবনজী গৌরীপুর জুট মিলে সিনিয়ার ফিটার ছিলেন, লকআউটের আগে পর্যন্ত মাস গেলে পাঁচ হাজার টাকা বেতন পেতেন। আইন মোতাবেক তিনি ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকারী।

কিন্তু লেবার ডিপারমেন্টে যখন অ্যাপিলের হিয়ারিং উঠল, ততদিনে আমার বয়স আটান্ন হয়ে গিয়েছে। তাই বাবুরা বললে, তুমি তো এখন কেবল রিটায়ারমেন্টের পাওনা পেতে পার। কিন্তু যে কাজটাই আর নেই, তার থেকে আবার রিটায়ার করি কেমন করে বলুন তো?

বৃন্দাবনজী হো হো করে হেসে ওঠেন, যেন খুব একটি মজার গল্প বলছেন।

যে কাজ নেই, তার থেকে কীভাবে অবসর নেওয়া যায়? ঘরে যার একদানা খাবার নেই, সে কীভাবে অনশন ধর্মঘট করে? এর থেকে মজার গল্প আর কিছুই হতে পারে না, যদি ভেবে ফেলা যায় ঘটনাটা ঘটেছে অন্য কারোর জীবনে, যদি নিজেকে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া যায়, যেমন নাকি একবার রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন একটি কাঁকড়াবিছে কামড়ানোর পর। যন্ত্রণা সয়ে বেঁচে থাকার এ এক দুর্লভ শৈলী। কিছুকাল হল রিউমাটয়েড আর্থরাইটিসের তীব্র যন্ত্রণা সয়ে এভাবেই বেঁচে আছেন বৃন্দাবনজী।

অনেকেই অবশ্য অনাহারে অর্ধাহারে বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছে; তাদের নামের একটি তালিকা তৈরি করছে শুভাশিসরা। কেউ কেউ অশক্ত শরীরে টিকে আছে এখনও, তবে উপার্জনক্ষম নয় আর। তারা সন্তানদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে বেঁচে আছে কোনোমতে। বৃন্দাবনজী কিছুকাল সল্টলেকের সেক্টর ফাইভে একটি সিকিউরিটি এজেন্সিতে রক্ষীর কাজ করেছেন। কঠিন বাতের রোগটা শুরু হবার পর আর পারেন না। সেই কাজ এখন করছে তাঁর ছেলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোয়ান ছেলে তো, আমায় যা দিত তার থেকে কিছু বেশিই দিচ্ছে ওকে। দারোয়ানের চাকরিতে মিলের বুড়ো ফিটারের দাম কি আছে বলুন না?

আরেক চোট হেসে ওঠেন বৃন্দাবনজী।

বেশিরভাগ চটকল বন্ধ হয়ে পড়ে আছে এক দশকেরও বেশি সময়। মালিকপক্ষ শ্রমিকদের প্রাপ্য প্রভিডেন্ড ফান্ড গ্র্যাচুইটির এক পয়সাও মেটায়নি। তাদের রক্ত-জল-করা কোটি কোটি টাকা পড়ে আছে ট্রাস্টি বোর্ডের ঘরে। তার থেকে অনেক বেশি টাকা অবশ্য মেরে দিয়েছে মিলমালিকেরা। তার সামান্য কিছু বখরা দিয়ে নেতাদের মুখ বন্ধ করেছে। ইতিমধ্যে চুপিসারে মিলগুলো হাতবদল হয়েছে। এখনও যে দুচারটে টিমটিম করে চলছে, সেগুলো যারা চালায়, তাদের অনেকেই পাটের ফোড়ে, কেউই শিল্পপতি নয়। তাদের অভিসন্ধি হল মিলগুলোকে চিরকালের জন্য অচল করে দিয়ে সেখানে রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা করা, যেমনটা হয়েছে সোদপুরে কামারহাটিতে। রাতের অন্ধকারে ব্রিটিশ আমলের যন্ত্রপাতি সরিয়ে নিয়ে বেচে দেওয়া চলেছে নিয়মিত।

চায়ের দোকানে জড়ো হওয়া মানুষগুলোর মুখে এই কথাগুলো কোনো অ্যাবসার্ড নাটকের কোরাসের মতো শোনায়। সামনেই তালাবন্ধ মিলের গেট, দেয়ালে পোস্টার শ্লোগান রোদ বৃষ্টিতে ছিঁড়েখুঁড়ে বিবর্ণ হয়ে জুতসই প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে। কুড়ি-তিরিশ বছর ধরে এই জায়গাটা ছিল এঁদের জীবনের চাকার কেন্দ্র, দিনের বিভিন্ন প্রহরে সাইরেন বাজার সঙ্গে ঘুরত। সেই চাকাটা থেমে গিয়েছে, তবু পুরোনো অভ্যাসে জড়ো হন এখনও। একটিই চায়ের দোকান কোনোক্রমে চলছে।

শুভাশিস বলে—

জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন করে পশ্চিমবঙ্গ থেকে শিল্পকে তাড়ানো হয়েছে বলে যে কথাটা আমরা সবাই মেনে নিয়েছি, সেটা কিন্তু অর্ধসত্য।

বাকি অর্ধসত্যটা কী? আমি জিজ্ঞেস করি।

এই রাজ্য চিরকালই শিল্পপতি মিলমালিকদের কাছে স্বর্গ, তখনও এখনও!

একথা কেন বলছিস?

হিসেব করে দ্যাখ, গত কুড়ি-পঁচিশ বছরে শ্রমিকদের শুধুমাত্র পিএফের যত হাজার কোটি টাকা মেরে দিয়েছে সেটা কিন্তু ভারতে আর কোথাও হয়নি। মালিকরা কিন্তু বেশিরভাগ এই রাজ্যেই আছে, কেউ কেউ ব্যবসা পালটেছে। মিডিয়া জগতে প্রভাব বিস্তার করেছে, এমনকি আর্ট গ্যালারিও খুলেছে। ক্ষমতায় যেই আসুক তাদের কাছেকাছেই থাকে এরা। এদের দেওয়া পার্টিতে সেলিব্রিটি শিল্পী বুদ্ধিজীবীদের দেখা যায়।

আর ইউনিয়ানের যে নেতারা টাকা খেয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে বেইমানি করেছে?

তারাও দিব্যি আছে, কেউ কেউ রং বদলেছে! ওঁদের মধ্যে থেকে একজন বলে ওঠেন।

বড়ো নেতাদের তো নাগাল পাওয়া যায় না, তারা দূরে থাকে। লোকাল নেতারা সব এখানেই আছে। যাবে আর কোথায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ কেউ দশমহলা বাড়ি তুলেছে, পাশ থেকে একজন যোগ করেন।

স্থানীয় নেতা যারা, তাদের এই মিল অঞ্চলে বহুকালের বাস, শুভাশিস বলে। অনেকেরই পূর্বপুরুষ মিল পত্তনের সময় আড়কাঠির কাজ করেছে, বিহার উত্তরপ্রদেশে নিজেদের গ্রাম থেকে লোক নিয়ে এসে কাজে ঢুকিয়েছে। বংশপরম্পরায় তারা ছিল মিলবস্তির সর্দার। এরা বেশিরভাগ উঁচু জাত— ক্ষত্রিয় ভূস্বামী সম্প্রদায়। ডান বাম সব রাজনৈতিক দল এদের হাত ধরে শ্রমিক সংগঠনটা করে। এইভাবে বলতে পারিস শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যেই রয়ে গিয়েছে সামন্ততন্ত্রের রেশ। সর্ষের মধ্যে ভূত!

আমাদের আলোচনাটা জটিল তাত্ত্বিক খাতে বাঁক নিচ্ছে দেখেই হোক কিংবা বিষয়টা স্পর্শকাতর বলে, বৃন্দাবনজী আমাদের মজদুর লাইনের এক প্রান্তে ওঁর ঘরে আপ্যায়ন করে নিয়ে যান। চায়ের দোকানে বসেছিলেন যখন খেয়াল করিনি, আর্থরাইটিসে পায়ের আঙুলগুলো এমনভাবে বেঁকে গিয়েছে যে বাঁশের লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটেন।

চারিদিকে আগাছা আবর্জনা আর বাতিল ছেঁড়া টায়ারের স্তূপের মাঝে টানা একসারি ঘর, পেছনে ভাঙা পাঁচিলের ওপাশে লেবার অফিসারদের পরিত্যক্ত বাবু কোয়ার্টার্স— লাল ইটের সুঠাম ভিক্টোরিয়ান স্থাপত্যে অসংখ্য সাপের মতো জড়িয়েছে মোটা মোটা বটের শিকড়, ঝোপঝাড়ের ভেতর উঁকি দিচ্ছে জংধরা দোলনা, বাচ্চাদের খেলার স্লিপ ঢেঁকি, বাস্কেটবল কোর্টে কংক্রিট ফাটিয়ে উঠেছে শিয়ালকাঁটার ঝাড়। তাতে হলুদ ফুল ফুটে আছে।

একসময় চারশো পরিবার এখানে থাকত, বৃন্দাবনজী বলেন। এখন বড়োজোর পনেরো-বিশটা।

বৃন্দাবনজীর ঘরের বাইরে ইটবাঁধানো উঠোন, একটা খর্বাকৃতি বটগাছ, নীচে ছোট্ট হনুমানের মূর্তি কমলা তেলসিঁদুর লেপা। গাছের নীচে খাটিয়া পেতে বসান আমাদের। তাঁর বর্ষীয়ান স্ত্রী মাথার ঘোমটা সামলাতে সামলাতে পেতলের থালায় ঠেকুয়া আর লোটায় করে জল এনে রাখেন। কিছুদিন আগে ছটপুজো হয়ে গিয়েছে, তার প্রসাদ।

বিহার ঝাড়খণ্ড ওড়িশা মধ্যপ্রদেশ এমনকি তামিলনাড়ু থেকে আসা বহু ভাষা আর ধর্মের এক শ্রমিক সমাজ এখানে গড়ে উঠেছিল একটি কারখানাকে কেন্দ্র করে, তৈরি হয়েছিল পারস্পরিক সম্প্রীতি আর আদানপ্রদানের এক সংস্কৃতি। সেসব আজ অতীত।

বৃন্দাবনজীর কথায় মৈথিলী টান আছে, কিন্তু ভালোই বাংলা জানেন। ওঁর স্ত্রী একেবারেই বাংলা বলতে পারেন না।

চলে যাওয়া দিনগুলোয় ছটপুজোর সময় দশ-দশ কিলো আটা ঘিয়ের ঠেকুয়া বানাতাম, বলেন বৃন্দাবনজীর স্ত্রী। রাত থাকতে মেয়েপুরুষের লম্বা জলুস বের হতো মজদুর লাইন থেকে— সবার খালি গা, মাথায় কুলোভর্তি ফল মিঠাই ধুপ দিয়া। দেশোয়ালি গান গাইতে গাইতে সবাই একসাথে গঙ্গা মাইয়ার ঘাটে যাওয়া হতো। কোথায় গেল সেইসব দিন?

দুটো হাত তুলে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন— উ সব দিন কঁহা!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথার টান আর দেহভঙ্গি মিলে যে গভীর বিষণ্ণ ইমেজ সৃষ্টি হয়েছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই।

ফাল্গুন মাসে হোলি, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, মাঘ মাসে পোঙ্গল, তারপরে ঈদ... সব উৎসবে শামিল হতাম আমরা, হাতের কর গুনে বলছিলেন। হফতার দিন মীনাবাজারের মাঠে ভারী মেলা বসে যেত, গঙ্গার ওপার থেকেও লোকে ফেরি চেপে আসত মজা নিতে। কোথায় গেল সেসব দিন ? লোকজন নেই, দুটো কথা বলার লোক নেই, মিলের সাইরেন নেই, সকাল বিকেল এত চুপচাপ, এমন সন্নাটা ছেয়ে থাকে, রাত্রিবেলা শেয়াল ডাকে হুক্কাহুয়া— মনে হয় যেন শ্মশানে বাস করছি, চারিদিকে কেবল ভূতপ্রেত। এখানে থাকতে থাকতে আমরাই সব ভূত হয়ে গেছি। জীবন্ত ভূত !

জিন্দা ভূত !— শব্দদুটো বার দুয়েক জিভের ডগায় ঘোরাতে ঘোরাতে উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠেন অবিকল বৃন্দাবনজীর মতো। শাড়ির প্রান্ত মুঠো করে মুখের সামনে ধরে আড়াল করেন, কিন্তু নাকে রুপোর নথ চিকচিক করে ওঠে দেখা যায়। এই পোড়ো পরিত্যক্ত ক্ষয়ের মাঝে দুটি প্রাণী, দুজনেই বৃদ্ধ, গভীর বিপন্নতার ভেতর থেকে উঠে আসা এই হাসি ওঁদের বেঁধে রাখে।

*

হুড়িশাহীর আমিন সিং-এর মুখে ম্লান হাসি, যাকে হায়দরাবাদে ইটভাটায় কাজ করিয়ে মজুরি দেয়নি প্রতিবেশী ঠিকাদার ; অথবা শেখপাড়ার উচিয়ার আলির অসহায় হাসি, যখন জানতে চাওয়া হয়েছিল, ছেলেটা স্কুল-ছুট হয়ে পড়বে কী না ; ডুমুরদি গ্রামে সাবিত্রী মুণ্ডার মুখে নীরব হাসি, যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম সাক্ষর হওয়া সত্ত্বেও ও কেন বাচ্চাদের পড়ালেখায় সাহায্য করে না ; কিংবা আমাদের সেই ফাঁপা অট্টহাসি, যা বনের মধ্যে শূন্য স্কুলবাড়ি থেকে ছড়িয়ে গিয়েছিল এক ঝাঁক বাদুড়ের মতো ; সুন্দরবনে সেই নিজঝুম খাঁড়ির সবুজ আলোয় দুলালের মুখে অপ্রতিভ হাসি, যখন জানতে চেয়েছিলাম শুচিস্মিতা নামে এক নারীর কথা ; জলবন্দি আশ্রমে সামান্য বিস্কুটের প্যাকেট হাতে সেই বৃদ্ধাদের দন্তহীন মুখে হাসি যেন জলে প্রতিফলিত আলোর মতো ; বড়ো হয়ে সে কী হতে চায়, জানতে চাইলে স্থিরপাড়ার মাম্পি দাসের ঠোঁটে প্রজাপতির তিরতিরে ডানার মতো হাসি ; অথবা ছেড়ে-যাওয়া স্বামী এখন টাকা চাইতে আসে, সে কথা বলার সময় ভারতীর মুখে বিচিত্র রহস্যের হাসি ; মেডিকেল কলেজের মেঝেয় বসে গৌরাঙ্গদার শুকনো ঝরাপাতার মতো হাসি, যখন সে বলছিল কীভাবে টিভির সাংবাদিক ওকে শুয়ে পড়তে বলে মুখের ওপর ক্যামেরা বাগিয়ে ধরে জানতে চেয়েছিল— যারা মেরেছে তারা কোন দল ; কিংবা নকুল সর্দারের সেই অননুকরণীয় হাসি, যখন সে বলেছিল কীভাবে ভাগীরথী মাগিটা তাকে কিছুতেই তিষ্ঠোতে দেয় না, অথচ একে ছেড়ে দূরে কোথাও গিয়ে সে থাকতেও পারে না ; কৃষ্ণনগরে উৎপলদের মেসে তিন বেকার তরুণের মুখে তিক্ত হাসি, যখন ওরা বলছিল কতগুলো আর্দালি আর দারোয়ানের পদের জন্য কত লাখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবেদনকারী, তাদের মধ্যে কতজন ইঞ্জিনিয়ার আর ডক্টরেট ; আমার ইস্কুলের অনুষ্ঠানে সেই শ্যামবর্ণ মানুষগুলোর মুখে দপ করে জ্বলে ওঠা হাসি, যখন পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা হচ্ছিল...

কত রকমের যে হাসি আছে, জানো অপু, আমাদের এই পোড়া দেশে। হাসি আমাদের বিষহরি, আমাদের আশ্চর্য মলম।

*

একটা চওড়া মাটির রাস্তা দিয়ে বৃন্দাবনজীর পাশে হাঁটতে থাকি নদীর দিকে। মজদুর লাইনটার শেষ প্রান্তে দোতলা গণশৌচালয়, ব্রিটিশ আমলে তৈরি, এখনও অটুট রয়েছে। বাদামি ইটের শক্তপোক্ত স্থাপত্যের খুঁটিনাটি গোচরে আসতে আমার মনে পড়ে যায় মেজকার সেই কথাগুলো। মজদুর লাইনে প্রতিটি ঘরের ছাতে বায়ুচলাচলকারী পোড়ামাটির বাঁকানো চিমনি থেকে শুরু করে পাকা নর্দমা ও গণশৌচালয় একধরনের শ্রমিক কল্যাণমুখী দৃষ্টিভঙ্গির আভাস দেয়, যা ঔপনিবেশিক মিলমালিকদের ছিল, যা হয়তো উৎপাদন আর মুনাফার সঙ্গে জড়িয়েই ছিল, কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনে স্থান পায়নি। পাবার কথাও নয় বোধহয়। সেই আন্দোলনে রয়ে গিয়েছে যে গ্রামীণ সামন্ততন্ত্রের রেশ, সেখানে এখনও খোলা মাঠে শৌচ করাটাই দস্তুর।

ল্যাট্রিনগুলোর চারপাশে জমে আছে ঘোলা কালো জল, শুয়োর চরছে। আমরা হাঁটতে হাঁটতে নদীর পাড়ে চলে আসি। এখান থেকে মিলের পরিত্যক্ত বিদ্যুৎকেন্দ্রের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়।

একসময় এখানে সাত মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি হতো— শুভাশিস জানায়— মিলের প্রয়োজন মিটিয়ে আশেপাশের এলাকায় সরবরাহ হতো।

আমার মনে পড়ে যায় সত্তর-আশির দশকে রাজ্যজুড়ে লোডশেডিং-এর দাপটের যুগে আমরা পাওয়ার কাট কাকে বলে জানতাম না, সেটা এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের সুবাদে। বড়ো বড়ো ঝুরি-নামানো বট অশ্বত্থ আর ঘন ঝোপঝাড়ের আড়ালে হারিয়ে যাওয়া ইমারত, অতিকায় কলকব্জা, মোটা মোটা পাইপের গা বেয়ে জড়িয়ে ওঠা আগাছা, মুখ-থুবড়ে-পড়া জেটি থেকে ছাউনির ভেতরে ঢুকে যাওয়া ট্রলির লাইন কাঁটাঝোপে ঢাকা... এক পরাবাস্তব স্বপ্নদৃশ্য দেখতে দেখতে আমার তারকোভস্কির স্টকার ছবির কথা মনে পড়ে যায়। সেই ছবিতে ট্রলিলাইন দিয়ে অবিকল এইরকম এক জগতে ঢুকে পড়েছিল তিন চরিত্র। আর আমি আমার চিরচেনা, আজন্ম বেড়ে-ওঠা শহরটার প্রান্তে এই অজানা জগতের সন্ধান পেলাম।

ভেতরে শেয়ালের পাল থাকে ছানাপানা নিয়ে, বৃন্দাবনজী বললেন। রাত্রিবেলা প্রহরে প্রহরে ডাকে।

ওপারে পতুর্গিজদের পত্তন-করা শহর, যার নামে নদীর নাম, কিন্তু এপার থেকে দেখা যায় না। পাড় বরাবর টানা রাশিকৃত আর্বজনায় দৃষ্টি আটকে যায়। যে চওড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাটির রাস্তাটা মজদুর লাইনের পাশ দিয়ে নদীর ধারে এসেছে, তার ওপর দিয়ে রোজ পৌরসভার ডাম্পার ট্রাক এসে খালাস করে যায় শহরের জঞ্জাল।

গঙ্গার পাড়ে যেখানে যেটুকু ফাঁক জায়গা রয়েছে, সেখানে সর্বত্র এই এক জিনিস চলেছে— শুভাশিস বিরক্তির স্বরে বলে। এব্যাপারে গ্রীন বেঞ্চের স্পষ্ট আদেশনামা আছে। কিন্তু তাতে কার কী এসে গেল ?

ঠিক ! তাতে কার কী এসে গেল ? বৃন্দাবনজী ফের হেসে ওঠেন। এই নদীটা একসময় নারা (নাভিরজ্জু) ছিল এই দেশটার, এইসব কলকারখানা তৈরি হয়েছিল তার ধারে। সেই নারা শুকিয়ে যাচ্ছে, তাতে কার কী এসে গেল ?

একটি মৃত শিল্পাঞ্চল, একটি মুমূর্ষু নদী। কার কী এসে গেল ? যেখানে দুবেলা বাতিল টায়ারের থেকে সুতো ছাড়িয়ে পেটের ভাত জোগাড় করে কয়েকশো মানুষ, সেখানে সবকিছুই বিক্রয়যোগ্য। এমনকি মৃত্যুও।

বাতিল জিনিসপত্র আর জঞ্জাল ঝাড়াইবাছাই করে চালানের ব্যবসা এখানে চলেছে রমরমিয়ে। সেখানে যারা কাজ করছে তাদের অধিকাংশই বন্ধ কলকারখানার শ্রমিক। চারিদিকে ছড়ানো স্তূপাকার লোহালক্কড় প্লাস্টিক কাঠ টিন, কাবাডিওয়ালাদের মাথা গোঁজার পলিথিন ঝুপড়ি। ধুলো আর পলিপ্যাক ওড়ে এলোমেলো হাওয়ায়, নদীপাড়ের ধূসর আকাশ জুড়ে জেগে থাকে উঁচু উঁচু বাঁশের তেকাঠিতে ঝুলন্ত অতিকায় দাড়িপাল্লার সারি।

কাঠের দরজা জানলার ফ্রেম বলুন, লোহার রেলিং পাইপ বলুন, অ্যাসবেস্টাস রড টিন বলুন, সবকিছু পাবেন এখানে— বৃন্দাবনজী জানান। কারখানার ভেতর থেকে বিলিতি পেতল-তামার কলকব্জা দিনদুপুরে চুরি করে এনে বিক্রি হয়ে যায়।

পুরোনো বাতিল জিনিসপত্র ঝাড়াইবাছাই হয়ে নৌকোয় চাপিয়ে চলে যাচ্ছে এদিক সেদিক।

বলতে পারিস এটাই এখন এখানকার সবথেকে চাঙ্গা শিল্প, শুভাশিস বলে।

সব শিল্পেরই কিছু অনুসারী শিল্প থাকে। ঘুরতে ঘুরতে তেমন এক জায়গায় এসে পড়ি আমরা। কাবাডিওয়ালাদের কর্মব্যস্ততা ছাড়িয়ে, বয়লারের ছাইয়ের পাহাড় ডিঙিয়ে এক খাবলা উষর জমি— কালচে বাদামি, চকোলেটের মতো মাটি। একটিও গাছ নেই, ঝোপঝাড় আগাছা নেই, এমনকি একটি ঘাসও নেই। শুয়োর কুকুর নেই। এক অদ্ভুত শূন্যতা আর নিস্তব্ধতা।

দশ-বারোজন অস্থিচর্মসার নারীপুরুষ মাটিতে উবু হয়ে বসে কব্জি নেড়ে নেড়ে কী যেন করছে। দূর থেকে ওদের দেখে আমার মনে পড়ে যায় আনন্দর মুখে শোনা সেই ভাগাড়ের শকুনদের ; কোন কল্পনার তালবীথি থেকে বুঝি নেমে এসেছে। ওদের বিচিত্র শ্লথ ভঙ্গি ; নারীদের মাথার ঘোমটাগুলো হাওয়ায় ফুলে উঠছে ডানার মতো। কাছে গিয়ে দেখি সকলেই বেশ বয়স্ক, কেউ কেউ রীতিমতো বৃদ্ধ, সকলেরই হাতে একটি করে ঝুড়ি আর বাতিল মাইক্রোফোনের চুম্বক। বন্ধ কারখানার মেঝে খুঁড়ে আনা হয়েছে ধুলোমাটি, ঘন বাদামি রঙের, তাতে মিশে আছে বহুকালের তেলকালি আর ছোটো ছোটো লোহার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টুকরো। মানুষগুলো চুম্বক দিয়ে ধুলোর মধ্যে ছেনে দোমড়ানো পেরেক স্ক্রু নাট বল্টু ঝুড়িতে জড়ো করছে। সকলেই কাজ করে অসম্ভব মন্থর কিন্তু বিরামহীন গতিতে, কারোর মুখ দিয়ে একটি শব্দও বের হয় না। বিশীর্ণ কঙ্কালসার হাতগুলো, কোনো কোনো আঙুলে জড়ানো ন্যাকড়াকানি, ধুলোর ভেতর দিয়ে হাতড়ে চলে অন্ধের মতো।

এদের মধ্যে অনেককে বৃন্দাবনজী চেনেন, আশেপাশের কারখানায় দক্ষ শ্রমিক ছিল ওঁরই মতো। মাটি থেকে চোখ তুলে একটিবারের জন্যেও ওরা কেউ তাকায় না আমাদের দিকে। আমাদের ছায়াগুলো লম্বা হয়ে পড়ে ধুলোর ওপর, যান্ত্রিক হাতের নড়াচড়ায় একটা স্নায়বিক চাপ ফুটে ওঠে টের পাওয়া যায়, একটা চাপা অস্বস্তি। সেটা সঞ্চারিত হয় আমাদের মধ্যেও।

কিছু পুছতাছ করবেন নাকি? বৃন্দাবনজী আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করেন।

কী জিজ্ঞেস করব? কী জিজ্ঞেস করা যায়? আমাদের ইস্কুলের ছাতে যে মহাকাশযান নেমেছিল, তার ভেতর থেকে যদি ভিনগ্রহের জীবেরা বেরিয়ে আসত, তাদের কী জিজ্ঞেস করতাম, কোন ভাষায়, এই নিয়ে ছেলেবেলায় কত জল্পনা করেছি। তখন কিছুতেই কিছু ভেবে বের করতে পারিনি।

এখনও পারলাম না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্ন্যাসী কাঁকড়া

প্রথমে মনে হয়েছিল ওর ছেঁড়াফাটা পোশাক আর জটপাকানো চুলদাড়িতে ঢাকা চেহারা দেখে কুকুরগুলো চীৎকার করছে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর কারণটা বোঝা গেল। বীচে কাঁকড়ার গর্তে ওদের শিকারে ভাগ বসিয়েছে মানুষটা। সরু গাছের ডাল দিয়ে গর্ত খুঁচিয়ে লাল কাঁকড়া বের করে আনছে, তারপর দাঁড়াগুলো ভেঙে ভরে নিচ্ছে প্লাস্টিকের প্যাকেটে। এর আগে কুকুরদের শিকারপর্ব দেখেছি আমরা। বিচ জুড়ে ছুটোছুটি করে, কাঁকড়ার গর্তে মুখ ঢুকিয়ে, সামনের দুটো পা দিয়ে বালি সরিয়ে অনেক কসরতের পর কদাচিৎ সফল হচ্ছিল। সেই তুলনায় লোকটার কৌশল ঢের দক্ষ আর অব্যর্থ। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্লাস্টিকের প্যাকেটটা ভরে উঠল উজ্জ্বল ডালিম ফুলের মতো কাঁকড়ায়। হয়তো সেজন্যেই কুকুরগুলো একযোগে চীৎকার করতে করতে তেড়ে যাচ্ছিল ওর দিকে।

সেসবে দৃকপাত না করে অবিচল পায়ে জলের ধারে হেঁটে গেল মানুষটা, দূর চক্রবালের দিকে চেয়ে রইল। পেছনে এলোমেলো হাওয়ায় কুকুরের ডাক, পায়ের পাতায় ফেনায়িত ঢেউয়ের কামড়। নীচু হয়ে ফুটো প্যাকেটের ভেতর জল ভরে ভরে কাঁকড়ার গা থেকে বালি ধুয়ে নিল, থেঁতলানো দাঁড়াগুলো ছুঁড়ে দিল কাকেদের দিকে। তারপর ভিজে বালিতে পায়ের ছাপ এঁকে কাঁকেদের ওড়াউড়ির ভেতর দিয়ে কোনাকুনি হেঁটে চলে গেল দক্ষিণের ঝাউবনে। ওদিকটায় পাড় ভাঙছে, সমুদ্র গিলে নিচ্ছে বসতভিটে। পরিত্যক্ত বাড়িঘরের দখল নিচ্ছে বালি আর নোনা জলের বাসিন্দারা।

পাড় ভাঙছে এদিকেও। তবে এই নবীন পর্যটনকেন্দ্র রক্ষা করার জন্য বাঁধ দেওয়া হচ্ছে। এখানেই একটি বেসরকারি টুরিস্ট লজে এসে উঠেছি কয়েকদিন হল, যদিও আমরা ঠিক সেই অর্থে টুরিস্ট নই। বাদাবনের কোল ঘেঁষে গ্রামগুলোয় সারাদিন রুটিন কাজের পর নৌকোয় ভ্যানরিক্সায় কিংবা ট্রেকারে চেপে দিনের আলো ফুরোবার আগে এখানে ফিরে আসি, বেলাভূমিতে সূর্যাস্ত দেখি, মানুষের মেলা দেখি। সন্ধ্যা নামলে খাবারের দোকানগুলো চালু হয়ে গিয়ে জমজমাট হয়ে ওঠে বিচে যাবার রাস্তা। শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে ভিড়টা ফাঁপতে থাকে, সোমবার সকাল থেকে আবার থিতিয়ে আসে। এখানে নদীতে খাঁড়িতে জোয়ারভাটা হয় দিনে দুবার, এই পর্যটনকেন্দ্রে হয় সপ্তাহে একবার। জোয়ারে ভেসে-আসা শহুরে বাবু-বিবিদের জন্য হাপিত্যেশ অপেক্ষা করে বসে থাকে লজমালিক থেকে শুরু করে দোকানদার চা-ওয়ালা ডাব-ওয়ালা ভ্যানরিক্সার চালকেরা। আমরা যেহেতু টুরিস্ট নই, আবার স্থানীয় মানুষও নই, এই খুঁটিনাটিগুলো নজরে পড়ে। এভাবেই সেদিন দেখতে পেলাম কাঁকড়াশিকারি মানুষটাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষটা পাগল না কি ভবঘুরে ?

বিচরাস্তার মুখে গোলপাতার মনোহারী-কাম-চায়ের দোকানে নিয়ম করে সন্ধ্যাবেলা এসে বসি। দোকানি তপন উঠতি যুবক, আধুনিক ছিমছাম দোকানটির মতোই তার বেশভূষা ও কথাবার্তা। বিচের ওই লোকটার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বলে—

কত রকম পাবলিক আসে। সবার খোঁজ রাখা কি যায় ? তবে মনে হয় পাগল। নইলে ওই নোনা কাঁকড়া আবার কেউ খায় নাকি ?

খায় না ?

দূর দূর ! মেটে কাঁকড়া খাবেন তো বলেন, আনিয়ে দেব। যা টেশ না, গলদা চিংড়িকে বলে— যারা হঠকে !

আর কী কী আনিয়ে দিতে পার ?

এনিথিং !

বাঘের দুধ ?

তপন হাসে— বললাম তো, এনিথিং !

কী কী 'এনিথিং' তোমার খদ্দেররা চায় ?

সে অনেককিছু। হপ্তাভর খাটাখাটনির পর এখানে একটু রিল্যাক্স করতে আসে তো।

আমরা তপনের দোকানে পণ্যসামগ্রী দেখে মুখে মুখে একটি তালিকা বানাই। বিভিন্ন ধরনের বিস্কুট, চানাচুর, চিপস ও মুখশোচকের প্যাকেট, চকোলেট ও ক্যান্ডি, চিজের কিউব, কন্ডোম, সোডার বোতল, ইন্সট্যান্ট নুডলস্, শ্যাম্পু, গুটখার পাতা, ব্যাটারি, ফিল্মের রোল, ফলের রস, জেলুসিল, টিনের রসগোল্লা, স্যানিটারি ন্যাপকিন, হজমোলা, চীনে টর্চ...

এগুলো প্রদর্শিত। দেখা যায় না এমন আরও কিছু পণ্য আছে মাটির কুলুঙ্গিতে ছোট্ট লাল ফ্রিজে। আরও যে কী আছে, কে জানে ? ঝুপড়ির দোকানের পেছনদিকে দর্মাঢাকা অংশটায়, কিংবা তারও পেছনে ঝোপঝাড়, আবর্জনার স্তূপ, প্লাস্টিকের বোতল আর পলিপ্যাকে ভর্তি নিকাশি নালা, তার ওপারে ছায়া ছায়া গ্রাম... কতদূর ছড়িয়ে আছে তপনের দোকান ?

কোথায় যেন পড়েছিলাম, একজন মার্কিন নাগরিক একজন ভারতীয়ের থেকে গড়ে তিরিশগুণ বেশি প্রাকৃতিক সম্পদ নিঃশেষ করে ; বর্জ্য সৃষ্টি করে সেই অনুপাতেই, যা কিনা বছরের হিসেবে তার নিজের দেহের ওজনের দশগুণ। বেশিরভাগই জীবাণুবিয়োজ্য নয়। সাগর, বাদাবন আর মনুষ্যবসতির মাঝে মরীচিকার মতো এই বিচ রিসর্টে পর্যটকদের ধরলে অবশ্য হিসেবটা গুলিয়ে যায়। এখানে 'রিল্যাক্স' করতে আসা উপভোক্তাদের পণ্য ব্যবহারের হার মার্কিনীদের সঙ্গে তুলনীয়।

তপনের অবশ্য এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই। সন্ধ্যা পেকে এলে ওর দোকানে প্রকাশ্য বিক্রিবাটার পাশাপাশি একটু আড়াল রেখে চলে বিয়ার ও মদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিকিকিনি। লাইসেন্সপ্রাপ্ত অফশপটা দূরে। তাছাড়া বেড়াতে এসে লোকের হিসেব ঠিক থাকে না, স্টক ফুরিয়ে যায়। তপন ত্রাতা। বোতলপিছু বিশ-তিরিশ টাকা কমিশন নেয় সে। ওর দোকানে মাটির কুলুঙ্গিতে লাল টুকটুকে বেবি ফ্রিজে ঘুমিয়ে থাকে কিংফিশারের বোতল।

কিংফিশার ব্র্যান্ডের মাছরাঙা এই তল্লাটে প্রচুর দেখা যায়। জালের খুঁটির ডগায় হত্যে দিয়ে বসে থাকে। থেকে থেকেই জলের ওপর রামধনুরঙা বিদ্যুৎ খেলিয়ে ফিরে আসে। চপস্টিকের মতো ঠোঁটে রুপোলি মাছ ছটফট করে কয়েক মুহূর্ত।

কিংফিশারের বোতলে চুমুক দিয়ে রাতের সী-বিচে গাড়ি ছোটাবার সময়ও কি মাথায় অমন রামধনুর বিদ্যুৎ খেলে? গাড়িগুলো পাড়ের ঝুরো বালি ছেড়ে নেমে যায় জলের ধারে, ভিজে শক্ত বালির ওপর দিয়ে ছুটোছুটি করে, স্টিরিওয় গুলিয়ে ওঠে উচ্চগ্রামে মিউজিক, হেডলাইটের তীক্ষ্ণ আলোয় ফেটে যায় সফেন ঢেউয়ের বিক্ষোভ। ততক্ষণে অবশ্য বিচ ফাঁকা হয়ে আসে, ঝুপড়ি দোকানগুলোয় ঝাঁপ নেমে যায়, সমুদ্রের পেট ছুঁয়ে দমকা হাওয়া ছোটে বাদাবনের দিকে। সেই হাওয়ায় সোডিয়াম ভেপারে ঝলমল শুনশান বিচের ওপর প্রেতাত্মার মিছিলের মতো ওড়ে চিপসের প্যাকেট, পাক খেয়ে ওঠে প্লাস্টিকের বোতল, আর কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে তাড়া করে যায়। সারারাত ঝাউয়ের বনে শুকনো ঝরা পাতার মতো জমতে থাকে প্লাস্টিক আবর্জনা...

রোববারে ভিড় হয়েছিল ভালোই, সোমবার বিকেলের পর আলো-মরে-আসা ঝাউয়ের বনে আবার দেখতে পেলাম লোকটাকে— প্লাস্টিকের স্তূপে খুঁচিয়ে কী যেন খুঁজছে। বিস্তর আবর্জনা জমেছে উইকেন্ডে। পরদিন ঠিক ওই সময়ে আবার দেখা গেল— সোনালি সূর্যাস্তের প্রেক্ষাপটে মগ্ন পদচারণায় হেঁটে যাচ্ছে নির্জন সৈকতে, পেছনে কুকুরের ডাক, মাথার ঠিক ওপরে উড়ছে একটি কাক। দিনদুয়েক পরে আবার একদিন ভোরবেলায় কাঁকড়া শিকার করতে দেখলাম; হাতে গাছের ডাল আর পলিপ্যাক, সেই এক কৌশল। হোগলার ঝুপড়িগুলোর পেছনে যে টিউবওয়েল আছে, সেখানে একদিন দুপুরবেলায় দেখলাম তাকে। পরনে শতচ্ছিন্ন শার্ট আর কার্ডিগানটা নেই, উদোম গা, প্যান্টে নারকোলদড়ি বাঁধা; হাতলে চাপ দিয়ে মুখ নামিয়ে জল খাচ্ছে। কাঁধের কাছে চোখ পড়তে দেখি পুরোনো ক্ষতের গভীর দাগ...

মধ্যপ্রদেশের অরণ্যে ছাওয়া পাহাড় থেকে সেই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি উড়িয়ে দিয়েছিল অপু। পাতাগুলো উড়ে উড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল গাছের মাথায় ঝোপেঝাড়ে শুকনো পাতা বিছানো বনপথে। মানচিত্রে বাংলার বদ্বীপগুলির পায়ের কাছে সুন্দরবনের এই দ্বীপগুলো ঠিক যেন পাশাপাশি সাজিয়ে রাখা কাগজের টুকরো: এক আশ্চর্য উপন্যাস, যার প্রতিটি পাতায় লেখা রয়েছে একটি কাহিনির অংশ, অসমাপ্ত, বারে বারে লেখা আর মুছে ফেলা চলেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গঙ্গার মোহনা আর বঙ্গোপসাগরের মাঝে এই দ্বীপটা যেমন। দশ-বারো বছর আগেও সমুদ্রতটে ছিল ঘন বাদাবন আর কাদায় জেগে থাকা শ্বাসমূল, ঝাউয়ের শিকড়। জলে নামা যেত না। কিছুকাল হল সেখানে দিব্যি একটি মিহি বালির বিচ তৈরি হয়েছে, আরেকটি নতুন সৈকত হয়েছে কলকাতার হাতের কাছেই। দ্বীপ আর মূল ভূখণ্ডের মাঝে একটা সরু মজে-আসা খাঁড়ি, তার ওপর দিয়ে কংক্রিটের সেতু তৈরি করে রাস্তার সংযোগ হয়েছে। পর্যটনের তালিকায় যোগ হয়েছে একটি নতুন ঠিকানা। বেশ কয়েকটি নতুন হোটেল আর লজ গজিয়ে উঠেছে সম্প্রতি (কোস্টাল রেগুলেটারি জোন সংক্রান্ত আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, বলাই বাহুল্য)। সৈকতে সোডিয়াম আলোর স্তম্ভ, গোলপাতার ঝুপড়ি দোকানে ঝিনুকের সামগ্রী আর ঠান্ডা পানীয়, প্লাস্টিকের চেয়ার, বিচ-ছাতা, ভ্যানরিক্সায় ডাবের পিরামিড, গোলাপি বুড়ির-চুল বিক্রেতা বালক— সব মিলিয়ে এক ছিমছাম বিচ রিসর্ট, বাদাবন আর মানুষের বসতির টানাপোড়েনে যতটা ছিমছাম হওয়া যায়।

উপর্যুপরি লেখা আর মুছে ফেলা চলেছে। একদিকে পাড় ভাঙছে, বেশ কিছুটা এলাকা চলে গিয়েছে মোহনার করাল গ্রাসে। এই নবজাতক রিসর্টকে রক্ষা করার জন্য অতিকায় প্লাস্টিকের পাইপে বালি ভরে উপকূল বরাবর কৃত্রিম বাঁধ দেওয়া হচ্ছে। অত্যাধুনিক বিদেশি প্রযুক্তি, খুবই খরচসাপেক্ষ, এর কার্যকারিতাও নাকি সেভাবে পরীক্ষিত নয়। আমাদের লজের পেছনে একফালি ঝাউয়ের বনসৃজন, তারপরেই বালি আর জল। সেখানে কয়েকটি যন্ত্রদানব কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো বালি তুলে পাম্পে জল মিশিয়ে পাইপে ভরে দিচ্ছে রাতভর জোরালো সার্চলাইটের আলোয়।

আমার মনে পড়ে যায় অযোধ্যা পাহাড়ে সেই পাম্প স্টোরেজ প্রকল্পের কাজ। সে কথা বলতে মুচকি হাসে অমিতাভ। সেসব এখন দূরের স্মৃতি, এখন বাদাবনের নোনা জল মাটি বইছে ওর শিরায়। ডুমুরদি থেকে উৎখাত হবার পর গত তিন বছর এখানেই অমিতাভর ঠিকানা। সাতটা দ্বীপে জীবন জীবিকা সংক্রান্ত প্রকল্পে কাজ হচ্ছে, তাতে যুক্ত বাইশজন কর্মী। তবে পুরুলিয়ার নবীন মাছোয়ারি ফিরে গিয়েছে নিজের গ্রামে; এখানকার নোনা জলহাওয়া ওর সয়নি।

আয়লার পর সুন্দরবনের সঙ্গিন পরিস্থিতি বিশ্ববাসীর গোচরে এসেছে, প্রভূত খয়রাতির টাকা আসছে। তবে এসব নতুন নয়। পশ্চিমবঙ্গের এই একটি অঞ্চলে যত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কাজ করে, যত ধরনের প্রকল্প চলে, ঘনত্বের বিচারে সারা ভারতে তেমন আর কোথাও নেই। কিন্তু, অমিতাভর আক্ষেপ, কলকাতার এত কাছে এই অঞ্চল আর তার বাসিন্দারা আমাদের রাজ্য রাজনীতিতে কোনোদিন একটি জলজ্যান্ত বিষয় হয়ে উঠল না, চিরপ্রান্তিক হয়েই রয়ে গেল। সুন্দরবন উন্নয়নের নামে একটি সরকারি দপ্তর আছে যদিও, একজন মন্ত্রী আছেন, বাঁধ তৈরি আর মেরামতির নামে কোটি কোটি টাকাও নয়ছয় হয় ফিবছর। এহ বাহ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসলে সকলে ধরে নিয়েছে এটা একটা লস্ট কেস, অমিতাভ বলে। সুন্দরবন ডুবছে, মানুষ ছেড়ে চলে যাচ্ছে...

মঙ্গল থেকে বৃহস্পতি, তিনদিনে একবারও বিচের আশেপাশে কাঁকড়াশিকারিকে দেখতে পেলাম না। দোকানদার ভ্যানওয়ালাদের কাছে খোঁজখবর করে কোনো হদিশ মিলল না। হয়তো অন্যত্র চলে গিয়েছে। খাঁ খাঁ করছে বিস্তীর্ণ বালুবেলা, এমনটাই হয়ে থাকবে শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত। একশোটার মতো দ্বীপ, তার অর্ধেকে মানুষের বাস, যেকোনো একটিতে চলে যেতে পারে সে। মেছোদের নৌকোয় কিংবা সাঁতার দিয়ে চলে যেতে পারে: যেমন বাঘেরা যায়; মানুষেও যাওয়া-আসা করে। বিএসএফ ম্যাপ কাঁটাতার কোস্টগার্ড ওয়াচটাওয়ার— ভাটির দেশে চিহ্নগুলো ঝাপসা হয়ে আসে জেলেডিঙিতে বিধিসম্মত জাতীয় পতাকার মতো। ছইয়ের গায়ে শুকোয় গামছা, তার পাশে কঞ্চির ডগায় তেরঙ্গা কিংবা সবজে-লাল পতপত করে ন্যাকড়াকানির মতো। মাঝির পো ভাত খেয়ে কুলকুচি করে মুখ মোছে।

প্রথমদিন বিচে দেখার পর থেকেই মানুষটা মাথার মধ্যে সারাক্ষণ ঘুরঘুর করছে একটা নাছোড় গানের কলির মতো। বয়স কত হবে? চল্লিশ? পঞ্চাশ? বিশ-তিরিশ বছর একটা মানুষ উন্মুক্ত প্রকৃতির ভেতরে থাকলে তার চেহারা কেমন হয়? কালো রোদে পোড়া চামড়ায় মাছের আঁশের মতো খড়ি উঠছে, জটাপড়া চুলদাড়ি লালচে পাটের মতো, পাক ধরলেও বোঝার উপায় নেই। কপালে গভীর রেখাগুলো নোনা হাওয়া আর জলে প্রতিফলিত আলোয় একাগ্র হয়ে খাবার খোঁজার জন্যেও হতে পারে।

যদি চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে বয়স হয়, তাহলে উনআশি সালে সে ছিল বালক কিংবা কিশোর। যে বয়সে অপু চার ক্রোশ পথ হেঁটে মামজোয়ানের ইস্কুলে যেত, সেই বয়সে ভাটির দেশে দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে পরিব্রাজন কিছু অসম্ভব ছিল না। হয়তো একটি দলের সঙ্গে ঘুরত সে। আর সবাই কি মরে হেজে গিয়েছে, হারিয়ে ছড়িয়ে গিয়েছে?

কাঁটাতারে ঘেরা সুরক্ষিত বাদাবন। এককালে গোটা দ্বীপ জুড়ে রাজত্ব ছিল এই গাছেদের, এখন এইটুকুই টিকে আছে। ভেতরে কাঠের খুঁটির ওপর বনদপ্তরের বিট অফিস, নারকোল বাগিচা, পুকুর। তার ধারে একটি দুধসাদা লগকটেজ কৃচিৎ বড়োসাহেবদের পদধূলির জন্য। একদিকে কিছুটা জায়গা উঁচু জালে ঘিরে মৃগউদ্যান, ভেতরে চার-পাঁচটি চিতল হরিণ চরছে। তার গা ঘেঁষে কাচ গ্রানাইট আর স্টেনলেস স্টিলের ইউরোপীয় দুর্গস্থাপত্যের আদলে একটি সরকারি পর্যটক আবাস তৈরি হচ্ছে। নুড়িবিছানো ড্রাইভওয়ের দুপাশে ফাইবারের বাঘ আর হরিণ, তাদের পেটের ভেতর কুড়াদান, বুকে লেখা— USE ME। বনপথের ধারে ধারে ফ্লেক্সবোর্ডে আফ্রিকার সাভানা অরণ্যের ডিজিটাল প্রিন্টের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওপর বিভূতিভূষণের আরণ্যক উপন্যাসের লাইন। পাশ দিয়ে পঞ্চায়েতের ইটবাঁধানো রাস্তা চলে গিয়েছে গ্রামের দিকে। তার ওপর দিয়ে লাফিয়ে চলে ভ্যানরিক্সা। বাদাবন বাঁদিকে রেখে কিছুদূর এগোলে বিদেশি অনুদান সংস্থার টাকায় গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প: দু-তিন একর জায়গা জুড়ে সূর্যমুখী ফুলের চাষ হয়েছে, পেছনে সারি দিয়ে উইন্ডমিলের খুঁটি। হাওয়া থেকে বিদ্যুৎ তৈরি শুরু হয়নি এখনও, তবে ফুলের বীজ কিনে নিচ্ছে ওই সংস্থা। মাঠ জুড়ে উজ্জ্বল হলুদ ফুল এসেছে ঝেঁপে, বাতাসে ঢেউ খেলে যাচ্ছে, উইন্ডমিলের পাখা খুব ধীরে ধীরে ঘুরছে। পেছনে বালিয়াড়ি, ঘন ঝাউবনের মাথা, তারপরেই সমুদ্র...

ভাটির দেশের পুরোনো মানুষরা সবাই ওদের চেনে— দুলালের বাবা বলেছিলেন— ভিখমাঙা হয়ে দুয়ারে এসে দাঁড়ালে ফেরায় না কেউ।

কিন্তু তপন ওকে চেনে না। তপন নতুন প্রজন্ম, তাছাড়া এই জায়গাটা জমে ওঠার পর বাইরে থেকে এসে দোকান দিয়েছে সে।

লোকটা যে ভিখারি নয়, তার প্রমাণ পেলাম হাতেনাতে। ভোরবেলার নির্জন বিচে কাঁকড়া ধরতে দেখেছিলাম পর পর দুদিন। দ্বিতীয় দিন এগিয়ে গিয়ে কথা বললাম, কোনো উত্তর দিল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, কপালে রেখাগুলো গভীর হয়ে ছায়া পড়ল চোখের ওপর। গলায় ক্যামেরা ঝোলানো ছিল আমার, একটা ছবি নেব ভাবছিলাম। তার আগে পকেট থেকে পার্স বের করে একটা দশ টাকার নোট বের করে দিতে গেলাম, নিল না। কয়েক সেকেন্ড চেয়ে রইল নোটটার দিকে, তারপর গা থেকে চামড়া ছাড়ানোর মতো করে ছেঁড়া শার্ট কার্ডিগান খুলে জলে নেমে গেল। ওর পিঠের পেশিগুলো দড়িপাকানো, ঠেসমূলের মতো কশেরুকার দুপাশ দিয়ে নেমে গিয়েছে, কাঁধে দুদিকেই গভীর পুরোনো ক্ষতচিহ্ন।

বালিতে ছেড়ে রাখা ওর কার্ডিগানের পকেট থেকে উঁকি মারে বিবিধ জিনিস: একটি চ্যাপ্টানো দেশলাইয়ের খোল, জংধরা পকেট ছুরি, খানিকটা জালের সুতো, দলা পাকানো কাগজের টুকরো, লোহার চাকতি, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, নুড়িপাথর, ফিল্মের কৌটো, ঠান্ডা পানীয়ের স্ট্র...

বুক পর্যন্ত জলে নেমে দুপাশে হাত ছড়িয়ে চান করছিল লোকটা। ঢেউয়ের ধাক্কায় প্রসারিত হাতদুটো দুলছিল ঠিক যেন ডানার মতো। ছবিটা আমার মাথায় গিঁথে গেল...

সমুদ্র সৈকত বাঁদিকে রেখে রিসর্ট থেকে যে পথটা জলমগ্ন বসতির দিকে চলে গিয়েছে, পাড় ভাঙছে যেদিকটায়, সেদিকে পরপর বাগদার ভেড়িগুলো রয়েছে। একটি ছাড়া আর সবকটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে আর্থিক মন্দা শুরু হবার পর। পুরো চাষটাই বিদেশে রপ্তানি হতো।

ছুটন্ত ভ্যানরিক্সা থেকে পরিত্যক্ত ভেড়িগুলো দেখা যায়। শুকনো মজা, কোনো-কোনোটির মাঝখানে আয়নার টুকরোর মতো জল, তাতে প্রতিফলিত বিকেলের সূর্য,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবজেটে শ্যাওলা আর মরা গাছের শিকড়, একাকী পানকৌড়ি বসে আছে। দেখে বোঝা যায় ঘন বাদাবন ছিল এখানে, সেই বন কেটে সাফ করে জল বেঁধে হয়েছিল ভেড়ি। মরচেধরা লকগেট, কংক্রিটে বাঁধানো খাল, বিজলি বাতির খুঁটি হেলে পড়েছে, রাস্তার পিচ ফাটিয়ে ছেয়ে এসেছে লতানে আগাছা। কোনো এককালে পথের ধারে বোগেনভেলিয়া ইত্যাদি শৌখিন গাছ লাগানো হয়েছিল, সেগুলো ঝোপ হয়ে গিয়েছে। এইভাবে বহুকাল পড়ে থাকতে থাকতে হয়তো এক বিশেষ ধরনের বাস্তুতন্ত্র সৃষ্টি হয়ে উঠবে এখানে, কিন্তু সেই বাদাবন আর ফিরবে না কোনোদিন...

কার্বাঙ্কল থেকে চামড়ায় স্থায়ী ক্ষতচিহ্ন দেখা যায়, কিন্তু দাগদুটো দুই কাঁধেই রয়েছে, বাহুসন্ধি থেকে তিন আঙুল করে সমদূরত্বে। প্রথম যেদিন দেখি, খালি গায়ে টিউবওয়েলে হাতল চাপছিল, দাগগুলো যেন জীবন্ত চোখের মতো হয়ে উঠেছিল। গভীর ঘা থেকে হতে পারে, কিংবা... বাঘের আক্রমণ থেকে হতে পারে কি? পেছন থেকে অতর্কিত আক্রমণে দুটো থাবা কাঁধের ঠিক ওইখানে এসে পড়বে। আবার কুড়ুলের মতো কোনো ভারি অস্ত্রের কোপ পড়লেও হতে পারে। সেক্ষেত্রে কোপ নামবে ওপর থেকে, আঘাতকারীকে দাঁড়াতে হবে উঁচুতে— গাছের ওপরে, ঘোড়ার পিঠে কিংবা নৌকোয়। জলে ভেসে এসে নৌকোর গলুই আঁকড়ে ধরলে কুড়ুলের কোপ ঠিক ওইভাবে পড়বে।

জানা গেল না, জানার কোনো উপায়ও নেই। লোকটা কোন ভাষায় কথা বলে? দিনের পর দিন বিজন দ্বীপে থাকতে থাকতে কাক ঝাউগাছ আর হাওয়ার ভাষায় কি?

একটা জলযাত্রার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তিনদিন জলে ভেসে ভেসে কয়েকটি দ্বীপে যাওয়া, রাত্রিবাস বোটে। একটি মাঝারি মাপের ডিজেল-চালিত ভুটভুটি, তার খোলে কাঠের লম্বাটে কেবিন, ওপরে ত্রিপল ছাওয়া ডেক, জল জ্বালানি রেশন পারমিট মজুত করে প্রস্তুত। এখন একজন গবেষকের যোগ দেবার অপেক্ষা; সুন্দরবনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে কাজ করছেন তিনি।

অমিতাভর সংস্থায় ইন্টার্ন হিসেবে কাজ করার সংস্থান আছে, কিন্তু গবেষকটির নিজের বৃত্তি রয়েছে। তাছাড়া ওদের সমীক্ষার ক্ষেত্র সমান্তরাল, কিন্তু এক নয়। এভাবে যৌথ ফিল্ড ট্রিপে একজনের সময় আর খরচের সাশ্রয় হয়, অন্যজনের প্রাপ্তি অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর তথ্য। অর্থাৎ কিনা, শালমহুয়া হোক কিংবা বাদাবনের দেশ, অমিতাভর শেখার প্রক্রিয়া অব্যাহত।

প্রায় সোয়া ছফুট লম্বা এই ছেলেটিকে কোথায় যেন দেখেছি কিছুতেই মনে করতে পারি না। অমিতাভ আলাপ করিয়ে দেয়—

এই হল অয়ন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুল অব ওসানোগ্রাফিক স্টাডিজে রিসার্চ ফেলো। সুন্দরবনে ডুবে যেতে থাকা দ্বীপ নিয়ে কাজ করছে। ওর আরেকটা পরিচয় আছে...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অমিতাভ থেমে আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকায়, ছেলেটি মুখ টিপে হাসে।

অয়ন আমার ছেলে, অমিতাভ বলে।

মুখটা অবিকল ওর মায়ের মতো, কিন্তু অয়নকে আমি এর আগে কখনো দেখিনি। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে আগে প্রতিষ্ঠিত হয় অমিতাভ, বিয়েও করে সবার আগে। ও তখন কর্পোরেট জীবনযাপন করছে, বিয়েও করেছিল সেইরকম একটি পরিবারে। চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানির পারিবারিক ব্যবসা ছিল নন্দিতাদের।

মনে আছে, টলি ক্লাবে রিসেপশানের দিন একঘর লোকের মাঝে সস্মিত অমিতাভকে বলেছিল—

পুরুষাঙ্গ বাঁধা রাখতে হবে বলে সমর সেন শ্বশুরের টাকায় বিলেত যায়নি, আর তুই দেশে থেকে শ্বশুরকে পাছার চামড়া বেচে দিলি?

যথারীতি সেদিনও যথেষ্ট পরিমাণে চড়িয়ে এসেছিল সস্মিত।

অতটা তীব্রভাবে না হলেও অমিতাভর নতুন জীবনযাত্রায় বিরক্তি জমেছিল আমাদের মধ্যেও। এখন ভাবলে হাসি পায়, কিন্তু সেইসময় একরকম বিশ্বাসঘাতকতার অনুভূতি হয়েছিল। আসলে বসন্তের বজ্র নির্ঘোষে হারিয়ে-যাওয়া, খালের জলে ভেসে-ওঠা তরুণদের পরের প্রজন্ম বলে তখনও ভাবি আমরা নিজেদের। তার কিছুকালের মধ্যেই অমিতাভ আমাদের সেই অনুভূতিকে থাপ্পড় মেরে চাকরি ছাড়ল, একটা স্বেচ্ছাসেবি সংস্থায় কাজ নিয়ে চলে গেল সুন্দরবনের অঞ্চলে। সেটা জানতে পেরে ভালো লেগেছিল, সেইসঙ্গে একটু আত্মধিক্কারও ছিল। মানুষের মধ্যে বিস্মিত করতে পারার যে অফুরান ক্ষমতা রয়েছে, সেটা প্রায় ভুলতে বসেছিলাম। যে যাই হোক, ইতিমধ্যে অয়ন জন্মেছে। নন্দিতার সঙ্গে অমিতাভর সম্পর্ক আলগা হয়ে আসে এই সময়েই...

অয়নের হাতে উপগ্রহচিত্র ইঙ্গিত দিচ্ছে, হুগলির মোহনায় ঘোড়ামারা দ্বীপের আশেপাশে কমপক্ষে নটা সমুদ্রমুখী দ্বীপ তলিয়ে যাবে আগামী পনেরো বছরের মধ্যে, সত্তর হাজার মানুষ ভিটে ও জীবিকা হারাবে। ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হারিয়ে গিয়েছে দুটি দ্বীপ, লোহাচরা আর সুপারিভাঙা, ওরফে বেডফোর্ড। সুপারিভাঙা ছিল জনহীন বাদাবনে ঢাকা, কিন্তু লোহাচরায় মানুষের বাস ছিল। উষ্ণায়নের কারণে বিশ্বের প্রথম মনুষ্যবসতিপূর্ণ দ্বীপ মানচিত্র থেকে হারিয়ে গেল, এই খবরটা ব্যাপক আন্তর্জাতিক প্রচার পায়। ২০০৭ সালে হলিউডে অস্কার অনুষ্ঠানে বিখ্যাত তারকাদের হাত তুলে দেওয়া হয়েছিল এই লোহাচরা দ্বীপের মডেল।

সুন্দরবনের যা পরিস্থিতি তাতে কয়েক সেন্টিমিটার জলস্তর বাড়লে বিস্তীর্ণ এলাকা বসবাসের অনুপযোগী হয়ে যাবে, অয়ন জানায়। মানুষ ঘরবাড়ি হারাবে। এখন প্রতি বছর তিন মিলিমিটার করে সমুদ্রে জলস্তর বাড়ছে, এদিকে এখানকার দ্বীপগুলোয় পলিমাটি বসে যাচ্ছে বছরে প্রায় পাঁচ মিলিমিটার করে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে আট মিলিমিটার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনলে মনে হয় যেন অমোঘ নিয়তির সঙ্গে নিষ্ফল লড়াই।

হ্যাঁ, কিন্তু এতে মানুষের অবদানও কম নয়— অয়ন বলে। দ্বীপগুলো ঘিরে উঁচু বাঁধ দিয়ে জমি হাসিল হয়েছে দেড়শো-দুশো বছরে। নদীগুলো যে পলি বয়ে এনে দ্বীপ গড়ত, সেই পলি এখন ছড়াতে না পেরে জমা হচ্ছে খাতে। এর ফলেও জলস্তর উঠছে।

এর থেকে পরিত্রাণ কি? বাঁধগুলো ভেঙে দেওয়া? মানুষগুলো তাহলে যাবে কোথায়? আমি জানতে চাই।

অয়ন হাসে, উত্তর দেয় না।

পরিত্রাণ কিছু নেই, পরিণাম আছে— অমিতাভ বলে। সেটাই দেখাব তোকে। এখন মানুষগুলো কোথায় যাবে, এইটা হল কথা।

দ্বীপ হারিয়ে ছিন্নমূল মানুষ অন্য দ্বীপে গিয়ে উঠছে। আমাদের বোটের সারেঙ তারক ভুঁইয়াদের তিন পুরুষের বাস ছিল লোহাচরায়। ভিটে জমি সব হারিয়ে ওর ঠিকানা এখন সাগরদ্বীপের জীবনতলা কলোনি। বছর তিরিশের হাসিখুশি স্বাস্থ্যবান তারকের মুখে অবশ্য শ্রীকৃষ্ণপুরে বাঁধের শরণার্থী শিবিরের সেই বিবর্ণ আশাহীন মানুষগুলোর মতো ছায়া নেই। ভুঁইয়া পদবিটা এসেছে ভুঁই অর্থাৎ ভূমি থেকে, তারকেরা বংশপরম্পরায় কৃষিজীবী। গ্রীষ্মের দুটো মাস বাদ দিলে বছরের বেশিরভাগ সময়টা এখন ওর এই বোটেই কাটে।

শীতের মাঝামাঝি মোহনার কাছে সাগরে অদ্ভুত শান্ত নিস্তরঙ্গ জল। সকালের নরম আলোয় তার সবজেটে আঙুরের মতো রং বেলা বাড়ার সঙ্গে ধূসর কাদাগোলা হয়ে উঠেছে। আমাদের ভুটভুটিটা বাঁধের ধার ঘেঁষে এগোতে থাকে। ফিশিং হারবারে অনেকগুলো ট্রলার দাঁড়িয়ে আছে। চারপাশে মানুষের ব্যস্ত আনাগোনা, বোটের ইঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে শোনা যায় মৌচাকের মতো একটা ধ্বনি। দুপুরের পর কোটালের জোয়ারে ভেসে পড়বে, তার আগে জাল জল জ্বালানি বরফ টেনে তোলা হচ্ছে। ট্রানজিস্টার রেডিয়োয় ভেসে আসছে যাত্রা কোম্পানির বিজ্ঞাপন, উলু আর শাঁখের ধ্বনি। বড়ো বড়ো ড্রাম বাক্স দড়িদড়ার ফাঁকে দেখা যায় পুরোহিত এনে প্রদীপ ভাসিয়ে পুজো করছে জেলেপাড়ার একদল বউ। পক্ষকাল সাগরে ভেসে পড়ার আগে জরুরি সাংসারিক কথাবার্তা সেরে নেয় জেলেদম্পতি, কাঁখে শিশুসন্তান। এই দৃশ্য দেখে নেয় ট্রলারের ছুঁচলো ডগায় আঁকা টানা টানা চোখ।

হারবার পিছনে ফেলে ঝাউয়ের বনের পেছনে মাথা তুলেছে সারি সারি উইন্ডমিলের পাখা, স্থির বাতাসহীন, দূরে সূর্যমুখীর খেত চোখধাঁধানো হলুদ হয়ে আছে। ভ্যানরিক্সায় ওদিকের গ্রামে যাবার সময় ওই দৃশ্য দেখেছি, কিন্তু জলের ওপর থেকে যেন মনে হয় সুদূর সাগরপারের কোনো দেশের পিকচার পোস্টকার্ড। কে বলবে নোনা জল আর আঁশটে হাওয়ার বাদাবনের দেশ! এই ছবিটাই ফ্রেমবন্দি করে পর্যটক টানার জন্য বিজ্ঞাপন হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এই প্রোজেক্টটা কাদের টাকায় চলে জানো তো? অয়ন জিজ্ঞেস করে অমিতাভকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানি, জিও অ্যাগ্রো। অমিতাভ বলে।

হ্যাঁ, ওদের বড়ো কর্পোরেট ফান্ডিং করে ম্যাসেরিও নামে একটা ইটালিয়ান কোম্পানি। নানা ধরনের ব্যবসা আছে ওদের, তার মধ্যে একটি হল কৃষিজ পণ্য। ওরাই কিনে নিচ্ছে সূর্যমুখীর বীজ— অয়ন জানায়, তারপর আমার দিকে ফিরে বলে—

এখানে ফাইভস্টার লাক্সারি রিসর্ট খোলার ব্যাপারে এরাই সাহারা গ্রুপের ইকুইটি পার্টনার ছিল।

সুন্দরবনে সাহারা ইন্ডিয়া গ্রুপের কয়েকশো কোটি টাকার একটি পর্যটন প্রকল্পের কথা শোনা গিয়েছিল বেশ কিছুকাল আগে। ভাসমান পাঁচতারা হোটেল থেকে শুরু করে গলফ কোর্স, স্কুবা ডাইভিং, হেলিপ্যাড, ক্যাটামারান সার্ভিস... সব মিলিয়ে বাদাবনের দেশে একটুকরো মরিশাস কিংবা পাটায়া। ঝাউবন উইন্ডমিল আর সূর্যমুখী ফুলের পিকচার পোস্টকার্ডে দিব্যি মানিয়ে যেত।

এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সঙ্গে সাহারার একটি চুক্তিও সই হয়েছিল, অমিতাভ জানায়।

ভাগ্যিস সাহারা ডুবল, নাহলে কী যে হতো! আমি বলে উঠি।

সাহারা ডুবলেও কালাহারি আসত, অয়ন হেসে বলে। আসল স্পয়েলস্পোর্ট হল কিন্তু আয়লা। সুন্দরবনের মতো সাইক্লোন-প্রবণ অঞ্চলে ওই মাপের একটা মেগা প্রজেক্ট যে আদৌ যুক্তিযুক্ত নয় এই কথাটা পরিবেশবিদেরা আগেই বলেছিল। আয়লার ঝড় সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

'তথাকথিত' পরিবেশবিদেরা, অমিতাভ মন্তব্য করে।

তার মানে? অয়ন ভুরু কুঁচকে তাকায়।

অমিতাভ অর্থপূর্ণ হেসে তাকায় আমার দিকে। পরিবেশবিদের আগে তথাকথিত শব্দটা যোগ করে দেগে দেওয়া আমাদের রাজনীতিকদের দস্তুর হয়ে গিয়েছে ততদিনে। সেটা অবশ্য অয়নের স্মৃতিতে থাকার কথা নয়।

তবে জল কিন্তু অনেকটা গড়িয়েছিল, অমিতাভ বলে। সাহারার সঙ্গে চুক্তি সই হবার কিছুদিন আগে জম্বুদ্বীপে জেলেদের কাজকর্ম স্থগিত রাখার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। আর তারপরেই তড়িঘড়ি সেখানে পুলিশ পিকেট বসানো হয়, সমুদ্রের মাছমারাদের অস্থায়ী ছাউনিগুলো ভেঙে দেওয়া হয়। ব্যাপারটা কাকতালীয় হয়তো নয়।

ঘন বাদাবনে ঢাকা জম্বুদ্বীপে মানুষ বাস করে না। সমুদ্রের দিক থেকে একটি গভীর খাঁড়ি ভেতরে ঢুকে প্রাকৃতিক হারবার তৈরি করেছে। বহুকাল ধরে চট্টগ্রাম নোয়াখালির সমুদ্র ধীবরেরা এই দ্বীপের একটি অংশে শীতকালে মাস দুয়েকের জন্য ঘাঁটি গাড়ত মাছ শুকোবার জন্য। দ্বীপে রয়েছে মিঠে জল, অঢেল সূর্যের আলো আর খাঁড়ির দুধারে বালি আর মাটি সঠিক পরিমাণে মিশে মাছ শুকোবার আদর্শ জায়গা তৈরি করেছে। তিনদিকে ঘন বাদাবন সাগরের ঝড়ো হাওয়ার দাপট আটকাত, জোয়ারের সময় নৌকাগুলো খাঁড়ির ভেতর ঢুকিয়ে রাখা যেত নিরাপদে। এমনটাই চলে আসছিল। দেশভাগের পর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের অনেকে পূর্ব মেদিনীপুর আর উত্তর চব্বিশ পরগনায় এসে বসবাস করতে শুরু করে, শীতকালে জম্বুদ্বীপে মাছ শুকোবার ধারা অব্যাহত থাকে। দুটো মাস প্রায় হাজার দশেক মানুষ যুক্ত হতো এই কাজে।

একটি আঠেরো গর্তের গলফ কোর্সের জন্য লাগে একশো পঞ্চাশ একর সবুজ তৃণাচ্ছাদিত জমি। বাদাবনের জমির রাক্ষুসে উর্বরতাকে বশে এনে চাষযোগ্য করে তুলতে সেই উনিশ শতকের গোড়ায় সময় লাগত একটা গোটা প্রজন্ম। এজন্য সেই ছোটোনাগপুর থেকে মুণ্ডা ওরাওঁ শবরদের এনে বসানো হয়েছিল। অবশ্য সেইকালে হার্বিসাইড বা আগাছাধ্বংসকারী বিষ ছিল না। জম্বুদ্বীপে জমি আছে দুহাজার দুশো পঞ্চাশ হেক্টর। অর্থাৎ সেখানে তিরিশটা গলফ কোর্স হতে পারে, সেইসঙ্গে হেলিপ্যাড। এখানে জলে নদীতে ভেসে আসা পলির পরিমাণ এত বেশি যে স্কুবা ডাইভিং কিন্তু সম্ভব নয়। কলকাতা থেকে কাটামারান সার্ভিস অবশ্য হতে পারে। তবে এসবের জন্য দশ হাজার মানুষের কয়েক প্রজন্মের অনুপ্রবেশ বন্ধ করা প্রয়োজন। দশ হাজার মানুষ মানে বিশ হাজার হাত, তাদের পরিবার ধরলে প্রায় পঞ্চাশ হাজার পেট।

ওপরে নীল আকাশ, নীচে সবজেটে ধূসর জলের বল্লরী— যেন দিগন্ত ব্যেপে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে এক নারী, জম্বুদ্বীপ তার জেগে থাকা ঘন যৌনকেশ। বাদাবন চিরে গভীর খাঁড়ির পথ দুভাগ করেছে। কাছাকাছি আসতে ঢেউয়ের ধাক্কায় বোট দোলে, বাতাসে আঁশটে গন্ধ পাওয়া যায়। সূর্যের আলোয় পাড় বরাবর ঝুলছে অজস্র রুপোলি রাংতার বেড়ার মতো মাছ, হাওয়ায় দুলে চিকচিক করছে। পাড়ে পরপর ডাঁই-করা নানা আকারের রুপোলি মাছের পিরামিড। একদল রোদপোড়া মানুষ বেলচা দিয়ে উলটেপালটে দিচ্ছে, কাঠের ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে উঁচু ডাঙায়। পাড়ে সারি দিয়ে গোলপাতার ছাউনি ঘর। যেন মরীচিকার গ্রাম, আর এক পক্ষকাল পরেই মিলিয়ে যাবে, শূন্য ঝুপড়িগুলো পড়ে থাকবে।

বছরের অন্য সময়, যখন দ্বীপে জনমনিষ্যি থাকে না, তখন ওই লোকটা কি এখানে এসে থাকে? ফ্রেজারগঞ্জ থেকে দক্ষিণমুখী ভাঁটার টানে ভেলায় চেপে চলে আসাটা কিছু কঠিন ব্যাপার হয়তো নয়। বাদাবনের ভেতর মিঠে জলের পুকুর আছে, হয়তো ছোটোখাটো জীবজন্তুও আছে। এত পরিমাণ মাছ শুকনো হয়, তার দেহাংশ পড়ে থাকে, নানান পাখি আসে নিশ্চয়ই। এছাড়া বালির পাড়ে লাল কাঁকড়া আছে অঢেল।

বোটের ইঞ্জিনের একটানা ধ্বনির ভেতর অমিতাভর কথাগুলো যেন ভেসে আসে দূর সময়কাল থেকে—

জম্বুদ্বীপে মাছ শুকোনোর ব্যাপারটা নিয়ে একটা টানাপোড়েন ছিল বন আর মৎস্য দপ্তরের মধ্যে। এতগুলো মানুষের জীবন-জীবিকার প্রশ্নটা ছিল। কিন্তু সাহারার প্রোজেক্টটা সামনে আসতেই ছবিটা বদলে যায়। পুলিশ পিকেট বসে, খাঁড়ির মুখে কংক্রিটের খুঁটি পুঁতে দেওয়া হয়। এইসময় একদিন হঠাৎ সাইক্লোন হল, আগাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সতর্কবার্তা ছিল না। যে সব জেলেরা ট্রলার নিয়ে বেরিয়েছিল, তারা আশ্রয়ের জন্য খাঁড়ির মুখে এলে পুলিশ আর আর্মড ফরেস্ট গার্ডরা বাধা দেয়, ঠেলে দেয় ঝোড়ো সমুদ্রের দিকে। চল্লিশজন মৎস্যজীবী মারা গিয়েছিল সেদিন, সাতটা ট্রলারডুবি হয়েছিল। এরপর সাহারা গ্রুপের সঙ্গে পাঁচশো কোটি টাকার মৌ সই হল। তার ঠিক বারো দিন আগে জম্বুদ্বীপে মাছমারাদের ওপর পুলিশের লাঠি চলে, গোলপাতার ছাউনিগুলো ভেঙে দেওয়া হয়, খাবারের ভাঁড়ার মাছ ধরার সরঞ্জাম সব নষ্ট করে দেওয়া হয়। তারিখটা স্পষ্ট মনে আছে আমার, আঠাশে নভেম্বর ২০০৩। সেদিন ছিল বিশ্ব খাদ্য দিবস।

কিছুক্ষণ আমরা কেউ কোনো কথা বলি না। উপকূল ছেড়ে বোটটা মোহনার মাঝে চলে আসার পর ইঞ্জিনের শব্দ কেমন হালকা আর মগ্ন হয়ে এসেছে, চলছে কী না বোঝা যায় না, জলোচ্ছ্বাস শোনা যায়। হঠাৎ অয়ন বলে ওঠে—

আমি তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি।

অমিতাভর দিকে সরাসরি চেয়ে থাকে সে, ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত হাসির আভাস।

অমিতাভ মুখটা ঘুরিয়ে নেয়, কেবিনের জানলা দিয়ে চেয়ে থাকে দূরে, যেখানে আকাশ আর জলের মিলনরেখায় হেমসেলাইয়ের ফোঁড় তোলার মতো পাক খেতে খেতে উড়ছে একসারি সীগাল...

স্বপ্নে দেখেছিলাম, লোকটার ডানাদুটো পুঁতে রাখা আছে কোথাও, আর সে কাটা ডানার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে দ্বীপ থেকে দ্বীপে।

ভোররাতে জোয়ার পড়েছে। ঢেউয়ের দুলুনি আর জলের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। সরু কেবিনের বিছানায় আমার পাশে চিৎ হয়ে ঘুমোচ্ছে অমিতাভ, একটি হাত আড়াআড়ি চোখের ওপর ফেলা, অন্য হাতটি ছড়িয়ে ওপাশে ঘুমন্ত অয়নের কাঁধ ছুঁয়ে আছে। মাথার কাছে জানলার ফোকর খুলে উঁকি দিয়ে দেখি ডান দিকের পাড়টা সরে গিয়েছে অনেকটা দূরে। কনকনে ঠান্ডা বাতাস, এদিকে দিনভর রোদের তাপ শুষে উষ্ণ হয়ে আছে মুড়িগঙ্গার জল। ভাপ উঠছে। বাষ্পকণা জল থেকে উঠে তৎক্ষণাৎ জমে কুয়াশা হয়ে যাচ্ছে, ঠিক যেন ধুনুরির হাতে পেঁজা তুলোর মতো, ভেসে পড়ছে স্থির স্বচ্ছ জলের ওপর।

এক বিশাল ধুনখারার মতো নদীটার বুকে কুয়াশা জমে ওঠার এই অপরূপ দৃশ্য দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল ভোর হবার কিছু পরে। চারিদিকে ঘন কুয়াশা, দুহাত দূরেও কিছু দেখা যায় না। এরই মধ্যে বোটটা খুব ধীর গতিতে চলেছে।

ডেকে উঠে আসতে মনে হল যেন তুলোর পাহাড়ের ভেতর ডুবে গিয়েছে আমাদের ভুটভুটি। ক্ষীণ একটি আলো চুঁইয়ে আসছে কোথা থেকে, তার উৎস বোঝা যায় না। সারেঙের কেবিনের মাথায় জোরালো সার্চলাইট জ্বলে উঠছে মাঝে মাঝে, কিন্তু আলোর রশ্মি সামনে মাত্র কয়েক ফুট গিয়ে মরে যাচ্ছে ঘন কুয়াশায়। ইঞ্জিনের শব্দ দমচাপা ফোঁপানির মতো শোনায়। মনে হয় যেন কয়েকজন মানুষ আর একটি বোট, পৃথিবীতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ কোথাও নেই আর। চারদিক নিশ্ছিদ্র ঘোলাটে সাদা, চলছি না থেমে আছি বোঝা যায় না। কেবিনের ভেতর তারকের ঠোঁটে বিড়ির আগুন ঝাপসা ফানুসের মতো জ্বলে, আর কিছু দেখা যায় না।

বোটের আগায় যেখানে পুজোর ধুপ আর সিঁদুর লেপা, পাটাতনের ওপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে আছে অয়ন, গায়ে একটা র‍্যাপার তাঁবুর মতো মাথার ওপর দিয়ে ফেলা।

কাছে গিয়ে দেখি ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ কোলের ওপর রাখা জিপিএস মনিটরে। বোটের ছুঁচলো মুখে পাক খেয়ে গুলিয়ে উঠছে থকথকে কুয়াশা ; নীলাভ পর্দায় একরাশ সংখ্যা আর রেখার জালে একটি লাল রেখা জীবন্ত ক্রিমির মতো তিরতির করে কাঁপছে।

আমার মাথা ভারী হয়ে আসে, চুল ভিজে উঠেছে। নীচে নেমে গিয়ে অপরিসর বিছানায় শরীর এলিয়ে দিই। পাশে চিৎ হয়ে ঘুমোয় অমিতাভ, হাত দুটো বুকের ওপর জড়ো করা, মৃদু নাক ডাকছে।

পরশু সকাল থেকে জলে ভেসে আছি, মাঝে মাঝে ডাঙায় নামছি, দেহটা মনে হয় যেন এই বোটের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে, কিংবা বোটটা দেহের। দ্বীপহারা মানুষের কথাগুলো জুড়ে জুড়ে চারদিক ঘিরে ঘন কুয়াশার পর্দা হয়ে গিয়েছে বুঝি। দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে ছড়িয়ে যাচ্ছে মানুষ, অনেকেই ছেড়ে চলে যাচ্ছে চিরকালের মতো। লোহাচরার কিছু মানুষের পুনর্বাসন হয়েছে সাগরদ্বীপে। ঘোড়ামারা দ্বীপটা ডুবতে ডুবতে ছোটো হয়ে এসেছে। কিছুকাল আগেও সাতটা গ্রাম ছিল। নামগুলো শুধু রয়ে গিয়েছে স্মৃতিতে— মন্দিরতলা চুনপুড়ি বাথানপাড়া... খাসিমারার সামান্য একটুখানি টিকে আছে: একসারি খেজুর গাছ আর কয়েকটা হোগলার ঘর। চারিদিকে জল। তারই মাঝে এক টুকরো ঘাসজমিতে ছাগল চরাতে চরাতে পঁচাশি বছরের এক বৃদ্ধ বলেছিলেন, পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে নাকি ঘোড়ামারার সঙ্গে সাগরদ্বীপের যোগ ছিল, তাঁর ছেলেবেলায় গ্রামের মানুষ গরুর গাড়িতে চেপে গঙ্গাসাগরের মেলায় যেত। ওঁর এই কথার সমর্থন পাওয়া যায়নি আশেপাশে ভিটে আঁকড়ে টিকে থাকা কোনো মানুষের কাছে। অত পুরোনো স্মৃতি কারোর নেই। যাদের ছিল তারা মরে হেজে কিংবা হারিয়ে গিয়েছে, বাকিদের অতীত স্মৃতি ধুয়ে গিয়েছে কঠিন বর্তমানের নোনা জলে। সর্বত্র ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই রব, জমি জীবিকায় চাপ পড়ছে। কলোনিগুলোর আশেপাশে বিদ্বেষ দানা বাঁধছে, জাল বুনছে বিপর্যয়জীবীরা...

তন্দ্রা এসেছিল, ওপরে সারেঙের খুপরি থেকে উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে টুটে গেল। বোটটা খুব ধীরে ধীরে চলছে, মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে। ওপরে উঠে এসে দেখি কুয়াশা অনেকটা সরে গিয়েছে, পুবের থেকে লালচে সূর্যের আলো এসে পড়েছে জলে। বোটের তিন সহকারী আর ফরেস্টগার্ড চলে এসেছে ডেকে, চোখের ওপর আঙুল জড়ো করে সামনের দিকে চেয়ে আছে সকলে। অয়ন ঢুকে গিয়েছে সারেঙের কেবিনে, গলায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝুলছে দূরবীন, মুখটা জিপিএস মনিটরের আলোয় দীপ্ত হয়ে আছে। পাশেই সুকান আঁকড়ে তারক, মুখে স্পষ্ট উত্তেজনা। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে ইশারায় সামনের দিকে ইঙ্গিত করে।

সামনে তাকিয়ে প্রথমে কিছুই দেখতে পাই না, শুধু জল আর জল। তারপরে দেখি সম্ভবত হুইস্কার্ড টার্নের একটা বড়ো ঝাঁক জলের কয়েক ইঞ্চি ওপর দিয়ে নদীর বুকে আড়াআড়িভাবে উড়ে যেতে যেতে ঠিক যেন নাগরদোলার মতো উঠে যাচ্ছে, পাখিগুলোর সাদা পেটের নীচের দিকটা লালচে হয়ে উঠছে, আবার নেমে যাচ্ছে। তারপরেই দেখতে পেলাম: প্রায় তিনশো মিটার দূরে জেগে উঠেছে একটি চর, সূর্যের আলোয় তামার পাতের মতো উজ্জ্বল হয়ে আছে। আমাদের বোট থেমে যায়।

বোট ছাড়ার আগের দিন রাতে এই অদ্ভুত রহস্যের কথা বলেছিল অয়ন। লোহাচরা দ্বীপটা ডুবতে শুরু করেছিল নয়ের দশকে। ২০০৬ সালে উপগ্রহের ছবিতে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় লোহাচরা। বিশ্বের প্রথম মনুষ্যবসতিপূর্ণ দ্বীপের এই সলিল সমাধি আন্তর্জাতিক খবরের শিরোনামে উঠে আসে। আশ্চর্যের বিষয়, গত প্রায় এক বছর লোহাচরা দ্বীপটা যেখানে ছিল ঠিক সেইখানে একটি চর জেগে ওঠার ছবি আবার ধরা পড়ছে উপগ্রহের চোখে। এদিককার জেলে-মাঝিরাও লক্ষ করেছে সেটা, বিশেষত শীতকালে ভাঁটার সময় জলের ওপর নতুন একটা চর জেগে উঠতে দেখা যায়। এই ঘটনার গুরুত্ব যে কত অপরিসীম, সত্যি প্রমাণিত হলে সেটা কীভাবে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রে বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবের তত্ত্বকে জটিল করে তুলবে, সেটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছিল অয়ন। সবটা বুঝিনি, কিন্তু নাসার সাম্প্রতিক ছবিতে এক নতুন দ্বীপের জন্মের ছবি দেখে এক বিচিত্র উত্তেজনা হয়েছিল। মনে হচ্ছিল ঠিক যেন জলের বুকে ডানা মেলে ভেসে আছে একটি স্টিং রে।

বোটের থেকে দেখে অবশ্য আকারটা ঠিক বোঝা যায় না। ইতিমধ্যে জলে নেমে গিয়েছে লম্বা পাটা, তার গায়ে এক হাত অন্তর কাঠের টুকরো আঁটা। নীচে কোমর জল, জেগে-থাকা জমিটা শুরু হচ্ছে অন্তত একশো মিটার দূর থেকে। প্রথমে নেমেছে তারক, তারপরে অয়ন। দুদিক থেকে দুজন একটা লম্বা বাঁশ রেলিঙের মতো করে ধরে, আমি পাজামা হাঁটুর ওপর গুটিয়ে সেটি ধরে ধরে নেমে আসি। কোমরজলে শক্ত ডাঙায় পা রাখতে সর্বাঙ্গে এক বিচিত্র শিহরন খেলে গেল টিফিনবেলার সেই কারেন্ট নুনের স্বাদের মতো।

জোয়ার নামছে, বালির ওপর ঢেউয়ের দাগগুলো যেন গিলে-করা নকশা। সূর্যের তেরছা সোনালি আলোয় তার প্রতিটি ভাঁজ স্পষ্ট চিকচিক করছে। পাখির পায়ের দাগ, মাঝে মাঝে গোষ্পদের মতো জল, তাতে হলদে সবুজ একধরনের কাঁকড়া যার পাগুলো চ্যাপ্টা।

ছপাৎ ছপাৎ করে জল ভেঙে চরের বুকে উঠে হাঁটতে থাকে একলা তারক, সোজা হেঁটে যেতে থাকে, হালকা পায়ের ছন্দে যেন লাফিয়ে চলে, ছোট্ট কুমারী গ্রহের লঘু মাধ্যাকর্ষণে বুঝি নেমে এসেছে সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিমধ্যে ডেকে এসে দাঁড়িয়েছে অমিতাভ। ঘুমের ঘোর কাটেনি, কিন্তু চোখে বিস্ময়। ওকে দেখে অয়ন চিৎকার করে ওঠে—

বাবা! নেমে এস!

পাটার নীচে এসে দাঁড়িয়ে হাতটা বাড়িয়ে দেয় সে। অমিতাভ সন্তর্পণে পা ফেলে নেমে খামচে ধরে ওর হাত।

এই প্রথম অয়নের গলায় বাবা ডাক শুনলাম...

মামার বাড়ি থেকে অপুকে চিঠি লিখত কাজল, অপটু হস্তাক্ষরে বানান ভুলে ভরা চিঠি। হুগলির মোহনায় জেগে ওঠা এই চর যেন সেই চিঠি— হারিয়ে গিয়েছিল, আবার ফিরে এসেছে। এখন শীতকাল, কিন্তু জোয়ার এখনও পুরোপুরি নেমে যায়নি। তা সত্ত্বেও জেগে উঠেছে চর, থাকবে বলেই এসেছে। বালির ওপর ঢেউয়ের প্রতিটি দাগ কি নিখুঁত, ঠিক যেন নবজাত শিশুর আঙুলের মুঠি। ক্রমে ক্রমে এই আঙুলের খাঁজে সূক্ষ্ম তালুরেখায় জমবে পলিকণা, ধানি ঘাস জন্মাবে তার ওপর, জলচর পাখিরা আসবে। ধারের দিকে, যেখানে ভাঁটায় জল নেমে যায়, ভেসে থাকবে বাদার গাছের বীজ। ভাঁটা আর জোয়ারের মধ্যবর্তী কয়েকঘণ্টা সময়ে সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে মাটিতে গেঁথে দেবে শিকড়। কয়েকদিন পরে সেখানে দেখা দেবে শুধু একটি শলা, তার গায়ে ছোট্ট দুটি পাতা। তারপর শুরু হবে একটি আশ্চর্য উপন্যাস...

একটি নতুন দ্বীপ বাদাবনে ভরে উঠতে সময় লাগে দশ-বারো বছর, সেখানে মানুষের বসতি গড়ে উঠতে সময় লাগে একটি প্রজন্ম। সেই মানুষগুলোকে এক কাপড়ে উচ্ছেদ করতে কত সময় লাগে?

কে জানে। তবে বাদাবনের সন্ন্যাসী কাঁকড়ারা এক জীবনে তিন থেকে চারবার খোল বদল করে। দেহের আকার বেড়ে ওঠার সঙ্গে উপযুক্ত মাপের শাঁখ কিংবা ঝিনুকের খোল খুঁজে নেয়...

একটি আশ্চর্য উপন্যাস, যা লেখা হয়নি... একটি ছেলে... সেই কতকাল আগে বাবা-মায়ের হাত ধরে এসেছিল উষর দেশ থেকে, নতুন এক দেশের খোঁজে... তাদের দেশটা হারিয়ে গিয়েছিল, সেই দেশ সে দেখেনি... অনেক দূরের অরণ্যসংকুল দেশে নির্বাসন হয়েছিল তাদের... সেখানে পাথুরে মাটি, চারিদিকে ঘন জঙ্গল, সামান্য যা শস্য ফলত তাতে পেট চলত না, বছরে কয়েকমাস চিনা ঘাসের দানা সেদ্ধ করে খাওয়া হতো... গরমকালে কুয়োর জল নেমে যেত, তার মা গ্রামের বউঝিদের সঙ্গে দল বেঁধে দূরে শুকনো নদীর বুক খুঁড়ে নিয়ে আসত ঘোলা জল... জঙ্গলের মধ্যে যে বনচর মানুষেরা থাকত, তারা ভিন্ন ভাষায় কথা বলত... ছেলেটির বাবা দূরে শহরে যেত কাজ করতে, ফিরে এসে তাদের ছেড়ে-আসা দেশটার গল্প বলত... এক আশ্চর্য সবুজ দেশ, সেখানে সবাই বাংলায় কথা বলে, চারিদিকে কেবল জল আর জল, নদী... চান করতে নেমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গামছা ভর্তি করে মাছ ধরে আনা যায়... আর ভাত, ধবধবে জুঁইফুলের মতো ভাত, গরম ভাতের সুগন্ধ...

সেইরকম একটি নতুন দেশের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিল তারা... পায়ে হেঁটে, তারপর ট্রেনে চেপে... অনেকখানি পথ... রুক্ষ লাল মাটি আর শালসেগুনের দেশ থেকে সবুজ কলার বন ধানের খেত পুকুর সুপুরির সারি, ভোরের প্রথম আলোয় দেখা... তার মায়ের মুখে ফুটে উঠেছিল কি এক বিচিত্র উদ্ভাস? নেপথ্যে বেজেছিল কি বাঁশির চেনা সুর?... তারপরেও অনেক পথ পেরিয়ে, আবার ট্রেন, বাস, পায়ে হাঁটা, তারপর নৌকোয় চেপে এক নতুন দ্বীপে, নতুন দেশে... এক নতুনের স্বপ্ন...

সেই স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন হয়ে গেল একদিন, রাতের অন্ধকারে...

কী ঘটছে তুমি তার কিছু বুঝতে পারনি... মিশকালো অন্ধকার... ঘর থেকে টেনে টেনে বের করে বোটে তোলা হচ্ছে... টর্চের আলো, খাকি উর্দি, বাঁশি... ছায়াছায়া মানুষের ছুটোছুটি, হুড়োহুড়ি, আর্ত চীৎকার... দলাপাকানো অন্ধকার টর্চের আলো আর বাঁশির শব্দে ফালাফালা... হাতের মুঠি থেকে পিছলে যাওয়া হাত... কে কোথায় ছিটকে গেল, হারিয়ে গেল... তারপর গুলির শব্দ, কালো জলে সপাং সপাং ছুটছে যেন ছপটির মতো... নৌকোর গলুই খামচে ধরা হাতে, দুই কাঁধে পড়ছে কাটারির কোপ, দরজার বাতা আঁকড়ে-ধরা হাতের কব্জিতে... কাটা পাঞ্জা আঁকড়ে আছে দরজার ফ্রেম, আঁকড়ে আছে হাত, শাঁখানোয়া পরা, থরথর করে কাঁপছে আর রিনঠিন রিনঠিন করে বেজে চলেছে দমকলের ঘন্টির মতো... নিজের পোড়া চামড়ার গন্ধে তুমি জ্ঞান হারাচ্ছ আর ফিরে পাচ্ছ, চারিদিকে অচৈতন্যের নোনা কালো জল... ভেসে যাচ্ছ তুমি, ভাসতে ভাসতে জলের ওপর নুয়ে আসা বায়েনের ডাল ধরে ঝুলে পড়ছ, ঘুমিয়ে পড়ছ গড়জঙ্গলের ছায়ায়... মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ছে, খিদেতেষ্টা নেই, গাছের পাতায় বৃষ্টিফোঁটার শব্দ বাজছে ঘুমের ভেতর... তারপর ভোরের আলো ফুটল, চারদিক নিজ্ঝুম, তুমি জেগে উঠলে বিজন চরে, একটি সূচের চোখের ভেতর দিয়ে দেখলে এই বিশ্বজগৎ...

ফিরে এলাম যখন ততক্ষণে সূর্য ডুবে গিয়েছে, কিন্তু আলোর রেশ রয়েছে। আবার একটা শনিবার, বিচে জনসমাগম দূর থেকে দেখা যায়। আমাদের নামিয়ে দিয়ে বোটটা চলে যায় হারবারের দিকে, অয়ন আর অমিতাভ চায়ের টানে এগিয়ে যায় তপনের দোকানে। আমি একা বালির ওপর দিয়ে হাঁটা দিই। তিনটে দিন জলে কাটানোর পর পায়ের নীচে অদ্ভুত দুলুনির অনুভূতিটা জিইয়ে রাখতে বেশ লাগে। কত লক্ষ কোটি বছর আগে জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে এসেছিল পূর্বজরা, রক্তের মধ্যে যেন টের পাওয়া যায়। ভারি পারদের মতো জল, কালচে ধূসর, পাড়ের কাছে রুপোলি ফেনায় ভেঙে পড়ছে। দূরে ঝাউগাছের মাথাগুলো দুলছে।

তিনটি ছোটো মেয়ে জোয়ারে নাইলনের জাল পেতে চিংড়ির মীন ধরেছে। এখন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বালিতে অগভীর গর্ত করে প্লাস্টিক বিছিয়ে চৌবাচ্চা তৈরি করেছে, তার মধ্যে জোয়ারে ভেসে আসা গুল্ম শিকড়ে জড়ানো অজস্র খুদে লার্ভা আর ডিমপোনা থেকে ঝিনুক দিয়ে বেছে বেছে তুলছে অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে। আলো এত কম যে কিছুই দেখতে পাই না।

তিনটি মেয়ে প্রায় সমবয়সি, বয়স দশ কি বারো, তার বেশি নয়। ওদের পরনে একইরকম আকাশী-নীল ফ্রক, রংজ্বলা, বুকে সেলাই করা নকল নেকটাই। ফ্রকগুলোয় পিঠের বোতাম নেই, সেফটিপিনও নেই, থেকে-থেকেই কাঁধ থেকে খসে নেমে যাচ্ছে। একজনের নাকে রুপোর নাকছাবি, আরেকজনের সদ্য কান বিঁধনো হয়েছে, ছোটো নিমের কাঠি গোঁজা। খুব তন্ময় হয়ে অনেকটা যেন খেলার মতো ছন্দে কাজ করছিল ওরা, আগন্তুক দেখে আত্মসচেতন হয়ে পড়ে।

বাড়ি কোথায়? জানতে চাইলে আঙুল উঁচিয়ে দূরে ঝাউবনের ওপারে দেখায়। ইস্কুলে যাস? জিজ্ঞেস করলে একজন আরেকজনের পিঠে তর্জনী ফুটিয়ে বলে—

ও যায়...

দ্বিতীয় মেয়েটি কুপিত হবার ভান করে বলে—

না গো! মিছিমিছি করে বলছে... ও যায়!

এই বলে সে তৃতীয়জনের কাঁধে আলতো চাঁটি মারে। এরপর তিনজনেই একে অপরকে দেখিয়ে পরস্পরে ঠেলাঠেলি করে হেসে কুটিপাটি যায়। যেন এটাও একটা খেলারই অংশ, মীন বেছে তোলার মতোই।

আমিই ওদের সঙ্গে অকারণে হাসি, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রঙ্গ দেখি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা আমার উপস্থিতি ভুলে কাজে মন দেয়। যেন আমিও এই বেলাভূমিরই অংশ, একটি কাক কুকুর কিংবা দূরে ভেসে চলা একটি ট্রলার, ঢেউয়ের মাথায় একটি আলোর বিন্দু। যেন এই বেলাভূমি এই সমুদ্র এসবই ওদের সাম্রাজ্য।

মিহি জালে চিংড়ির মীন ছাড়াও ধরা পড়েছে অসংখ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জলজ প্রাণী, সেগুলো ওরা ছড়িয়ে দিচ্ছে বালিতে। সেই উচ্ছিষ্টে কাকেদের ভোজ চলেছে। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে যদিও, তবু চলেছে, চলবে, যতক্ষণ না গুল্মজড়ানো প্রতিটি প্রাণের কণা খুঁটে তোলা হয়।

বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে আরও কিছুটা হেঁটে গিয়ে যেদিকটায় সাগরের করাল দাপট, সেখানে দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে হাওয়া এসে হামলে পড়ে হার্মাদের মতো। বালি ওড়ে, দূরে বিচের দোকানপাট ঝাপসা হয়ে আসে। এখানে শালবল্লার খুঁটি পুঁতে বাঁধ দেবার নিষ্ফল চেষ্টা হয়েছিল, কাদার ওপর ভাঙা খুঁটিগুলো জেগে আছে। কংক্রিটের একসারি সরকারি শৈলীর আবাসন, একতলা, বালি জমে জমে প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোয় বোঝা যায় না ভাঙনের গ্রাসে পরিত্যক্ত বসতি নাকি মাটির বুক থেকে জেগে ওঠা প্রত্নশহরের চিহ্ন। কাঠের জানলা দরোজা খুলে নেওয়া হয়েছে, ইটের কাঠামোগুলো শুধু পড়ে আছে, ফাঁপা ঘরগুলোর খোলে হাওয়া ঢুকে করোটির বিচিত্র অট্টহাসির মতো শব্দ হচ্ছে থেকে থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানেই পেয়ে গেলাম ওকে, ধ্বংসস্তূপের দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

এখানেই কি থাকে? এই ছেড়ে-যাওয়া বসতির কোনো ঘরে? ছায়ামূর্তি পিছন থেকে দেখেও চিনে নিতে ভুল হয়নি। হাওয়ায় বোতামখোলা কার্ডিগানটা উড়ছে। দুপাশ থেকে চেপে ধরে রাখছে, আবার খুলে যাচ্ছে ডানার মতো ঝাপটাচ্ছে। মাথার চুল উড়ছে, পায়ের কাছে উড়ে এসে জড়ো হচ্ছে শুকনো ডালপাতা আবর্জনা...

এই যে তুমি! তোমার বিস্ফারিত চোখ, দুটো ঠোঁট অস্ফুট খোলা, ডানা প্রসারিত। তোমার মুখ ফেরানো অতীতে, পায়ের চারপাশে ছিটকে এসে পড়েছে তার ভাঙা টুকরোগুলো। সেসব তুমি কুড়িয়ে নিচ্ছ, ভরে ফেলছ কার্ডিগানের পকেটে— দেশলাই জালের সুতো অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল নুড়িপাথর বোতলের ছিপি— কিন্তু কত আর ভরবে, কত আর ধরবে ছিন্নমূল ঘরগেরস্থালি? তোবড়ানো হাঁড়িকুড়ি ছেঁড়া দর্মা টালি ফিডিং বোতল মুণ্ডহীন পুতুল... ভেঙে চুরচুর হয়ে-যাওয়া অতীত তুমি জুড়ে দেবে, প্রাণ ফিরিয়ে দেবে? কিন্তু ঝড় উঠছে দেখ, বালিঝড়, তোমার ডানাদুটো কিছুতেই আর মুড়তে পারছ না। সমুদ্রের হাওয়া তোমায় কেবলই ঠেলে দিচ্ছে পিছন দিকে, অনাগত আগামীর দিকে। পিঠ ফিরিয়ে ধেয়ে চলেছ তুমি, তোমার পায়ের নীচে রাশিকৃত জঞ্জাল আকাশ ছুঁয়েছে...

এই যে তুমি, তোমার সঙ্গে আমি কথা বলে চলেছি অনর্গল, কিন্তু তুমি নির্বাক। এত মানুষের কথার ভেতর দিয়ে এত জীবনের গল্পের ভেতর দিয়ে তোমাকে খুঁজেছি আমি, তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে চেয়েছি। এস, মুখ ফেরাও। মানুষ বড়ো কাঁদছে, দেখ, তুমি তার পাশে এসে দাঁড়াও। তুমি দুহাত বাড়িয়ে ধর তার সন্তপ্ত মাথা, তোমার কাঁধে রাখ। তার ঠোঁটের থেকে স্বর ঝরে পড়ুক তোমার কানে, শোনো। তার চোখের থেকে জল গড়িয়ে পড়ুক তোমার ক্ষতচিহ্নের ওপর। কী আশ্চর্য, দেখ, কবেকার ক্ষতমুখে ফের অঙ্কুরিত হচ্ছে ডানা, হাড়মাসের ওপর ছেয়ে আসছে নরম পালক। তুমি ওই পালকের বিছানায় দুদণ্ড মাথা রাখতে দাও।

—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~